

বইঘর লিটেল
ওয়েস্টার্ন

নিঃসঙ্গ নেকড়ে

মাসুদ আনোয়ার



বইঘর



ওয়েস্টার্ন

নিঃসঙ্গ নেকড়ে

মাসুদ আনোয়ার

অবিশ্বাস: অ্যামবুশে পিতা মারা যাওয়ার পর র‍্যাঞ্চ রক্ষার ভার পড়ল তরুণী জেনের ওপর। দুনিয়ায় আপন বলতে একমাত্র নাবালক ভাই শহরের ব্যাংকার, শেরিফ, আশপাশের র‍্যাঞ্চমালিক... সবাই চাপ দিতে শুরু করেছে র‍্যাঞ্চ বেচে দেয়ার জন্যে। এমন সময় এল স্টিভ রাসেল পাঁচ বছর আগে মাসছ্যেক কাজ করেছিল ওদের র‍্যাঞ্চে। বাড়িয়ে দিতে চাইল সাহায্যের হাত। কিন্তু জেন কি ওকে বিশ্বাস করতে পারে?

যোদ্ধা: অ্যাপাচি সর্দার শা-তা-নে বারোজন যোদ্ধা-সহ পিছু নিয়েছে জেরেমিয়াহ্ ট্রিস্টের। পালাচ্ছে ট্রিস্ট। কিন্তু শা-তা-নে জানে, এ লোক পালাবে না। সুযোগ বুঝে ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবে। দাঁড়ালও। তারপর?

নিঃসঙ্গ নেকড়ে: লুইস ক্যানট্রেল আর লি অ্যান। লি টানে, লুইস পালায়। ওর পেছনে শত্রু। লি-কে নিজের সঙ্গে জড়ানোর ইচ্ছে নেই। কিন্তু ছাড়বে কেন লি? সে যে ভালবাসে লুইসকে...

ঝামেলা: ওয়েস্ট উডে নিজেকে সেরা হিসেবে দেখতে চেয়েছিল ব্ল্যাক হান্টার। পেতে চেয়েছিল অসামান্য এক নারী মেরি ওয়েবসনকে। কিন্তু জিম টার্নার এসেই পাল্টে দিল পুরো পরিস্থিতি।

এ ছাড়াও আছে প্রমাণ, বাকশটের বউ ও শাস্তি নামে আরও তিনটি দুর্দান্ত গল্প। আজই সংগ্রহ করুন।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

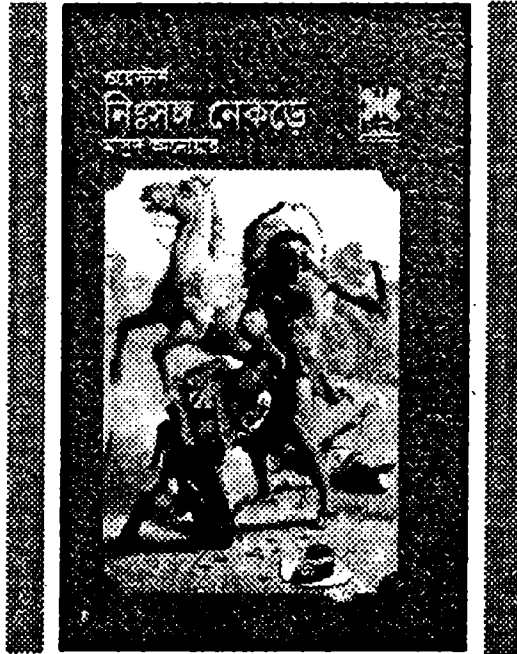
সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

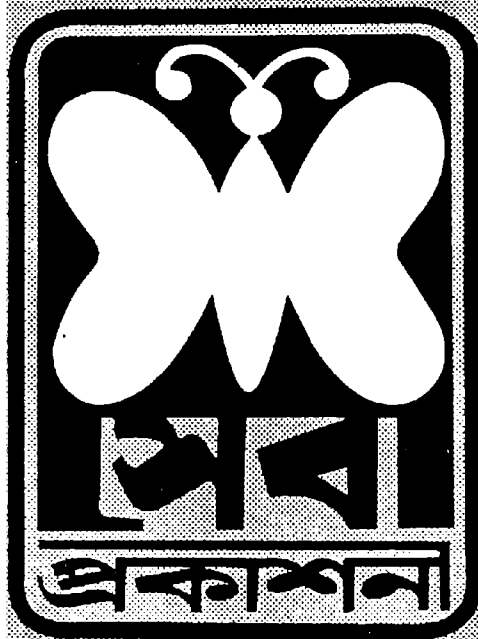
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচাপ্তি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন
নিঃসঙ্গ নেকড়ে
মাসুদ আনোয়ার



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8337-7



একশ' সাত টাকা

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে

ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরস্বাচীন: ৮৩১ ৪১৮৪

সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি. ও বক্স: ৮৫০

mail: alochonabibbhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

NISSHONGO NEKRE

A Collection of Western Stories

By: Masud Anwar

সূচি

অবিশ্বাস	৫
যোদ্ধা	১২০
প্রমাণ	১৫৬
নিঃসঙ্গ নেকড়ে	১৬৮
বাকশটের বউ	১৯৭
শাস্তি	২২০
ঝামেলা	২৩১

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলাগা কাগজ (চিল্পি) সাটানো হয় না।

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

COLLECTION

वश

Re

EDIT



शर

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!



সেবা প্রকাশনীর আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজী মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনা পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনা এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিণু ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অবেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতমা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্রোহ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দূশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঝণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তণ্ডুয়ি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাভার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনুর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মাহমুদ হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাভর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, নির্দিষ্ট স্বপ্ন, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণজিগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেদন, সীমানা, দেবী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কুটচাল, ক্যালিবার ৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আঙুল, বাকদ, তক্ষর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাহা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, হুনে অ্যালিয়ান, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুপ্তন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরকীর্তি, অধিকার, শত্রুপক্ষ, শিকড়, ত্রাণ। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দক্ষদার। **গোলাম মাকসুদ নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, যীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেটনে শত্রু, সন্ধান বিপদ, মাপ্তা, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তপ্তমুষ্টি, খুনে শহর, তাজাশ মুন্সেফ, ঢালবাজ, দস্যু, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, বেসারত, শাস্তি, আতাত, কসির দাঁড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিদ্রোহিক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াই, দানদাহ, একা, বিনাশ। **টিপু কিবরিয়া:** অস্তিত্ব চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রান্তর, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে ধুলী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘরু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিঙ্গা, অপমান, অপচেষ্টা, দাসা, চোরাবালি, ঘণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে। **আবু মাহদী:** পাঞ্চর, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইন বস। **সুন্দর আচার্য:** অপবাদ। **সায়ের সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি। **গোলাম মাকসুদ নঈম/মুনতাসির রহমান অর্পণ:** হাঙ্গামা।

অবিশ্বাস

এক

লোহার নাল লাগানো খুরের কঠিন শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। কটনউড গাছগুলোর তলায় ছড়ানো-ছিটানো সেজ ঝোপের ওপর হলুদ চাদরের মত ধুলোর যে মেঘ জমেছিল ঘোড়াগুলোর পায়ের দাপটে, আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে তাও।

ম্মান, বিপর্যস্ত চোখে সামনের ঢালটার দিকে তাকিয়ে আছে জেন। বুঝতে পারছে না কী করবে। লোকগুলো রীতিমত তাড়া দিয়ে গেছে ওকে।

র‍্যাঞ্জে এখন কেউ নেই। কাউহ্যাগুরা সকালে বেরিয়ে গেছে রাউণ্ডআপের কাজে। হেমন্তের আগে মোটামুটি একটা চালান দিতে চায় জেন একশ' মাইল দূরের ওমাহা সিটিতে। আশা করছে ভাল দাম পাওয়া যাবে গরুগুলোর।

চালান দেয়ার সিদ্ধান্তটা বাবাই নিয়েছিল। পাঁচ-সাতজন লোক নিয়ে রাউণ্ডআপের কাজও শুরু করেছিল। ব্যাংকে কিছু লোন আছে, এ-ছাড়াও কিছু ধার-কর্জ আছে এদিক-ওদিক। বাবা চেয়েছিল, গরু বেচে পুরো কর্জটা শোধ করে দিয়ে একটু থিতু হয়ে বসতে। গত বছর হুট করে মা মারা যাওয়ার পর ভীষণ একাকী হয়ে পড়েছিল। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে মায়ের শোক কাটানোর চেষ্টা করছিল। মুখে না বললেও জেনের তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

পরিবার থেকে দূরে ছিল জেন বহু বছর। পুবে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছে বাবার কাছে। বুঝতে পেরেছিল, মার অবর্তমানে বাবা আর ছোট ভাইটার দেখাশোনা করার জন্যে তার চলে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ওকে পেয়ে বাবা যে ভীষণ খুশি হয়েছে, তার মুখ দেখেই বুঝেছিল জেন। সে নিজেও অবশ্য কম খুশি হয়নি। বাবা আর ছোট ভাই টমকে নিয়ে নিজের পৃথিবী গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। টমের লেখাপড়ার ভারও নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল আরেকটু বড় হলেই ওকে পুবে পাঠিয়ে দেবে। ছেলেটা লেখাপড়া করে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হবে। বাবাও একমত হয়েছিল ওর সঙ্গে।

সব কিছু ভালই এগোচ্ছিল। মায়ের মৃত্যুতে একা হয়ে পড়লেও বাবা শোক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। গরুর চালান থেকে যে-টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে কী কী কাজ করা হবে, তার একটা তালিকাও করা হচ্ছিল জেনের সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু ঘটনাটা আচমকাই ঘটল।

ব্যাংকে জরুরি আলাপ সেরে শহর থেকে র‍্যাঞ্জে ফিরছিল বাবা। পথে অ্যামবুশে মারা গেল। খালি পিঠ নিয়ে ঘোড়াটা র‍্যাঞ্জে ফিরে এল। পরে লোকজন গিয়ে বাবার লাশ নিয়ে এসেছে। কাজটা কার জানা যায়নি।

মাস দুয়েক আগে ঘটেছিল ঘটনাটা। শেরিফ মর্ট ইন্সম্যান এসে সাক্ষ্যনাই দিয়ে গেছে শুধু। বাবার মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

সপ্তাহখানেক পরে আবার এসেছিল শেরিফ। ঘণ্টাখানেক ছিল জেনের সঙ্গে। টমের সঙ্গে কথা বলেছে বড়দের মত করে। দুই ভাই-বোনকে বেশ সাহস আর উৎসাহ দিয়েছে। জেনের তৈরি

কেক খেয়ে বিস্তর প্রশংসাও করেছে। তারপর চলে যাওয়ার সময় জানতে চেয়েছে, জেন এখন কী করবে। বলেছে, তার পরামর্শ চাইলে সে তাদের পুবেই ফিরে যেতে বলবে। কারণ পশ্চিমের এই বৈরী পরিবেশে টিকে থাকা তার মত পুবে জীবন কাটানো আনাড়ি একজন মেয়ের পক্ষে সম্ভব হবে বলে তার মনে হয় না।

প্রশ্নটা যে তার নিজের মধ্যেও আসেনি তা নয়। জেন নিজেই আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। এক-একবার পুবে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু বাবা-মার কষ্টে গড়ে তোলা র‍্যাঞ্চ ছেড়ে দিয়ে পুবের অনিশ্চিত জীবনে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পাচ্ছিল না মনের ভেতর থেকে। তা ছাড়াও, র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দিয়ে চলে যাওয়া মানে বাবা-মার স্মৃতি থেকে একদম চিরতরে দূরে সরে যাওয়া। বাবা-মা বেঁচে না থাকলেও তাদের পাশাপাশি কবর দেখে মনের ভেতর শক্তি ও সাহস অনুভব করে ও। কিশোর টমের সঙ্গেও একদিন আলাপ করেছিল। কিশোর ঠিক বড়দের মত করে জবাব দিয়েছে, ‘না, না, বাবা-মাকে ছেড়ে আমরা কোথায় যাব?’

তারপর একদিন দু’জন লোক এল র‍্যাঞ্চে। অতিথি খুব একটা আসে না। জেন তাই আপ্যায়ন করে বসিয়েছিল বাবার অফিস রুমে। অতিথিরা প্রথমে ওর সঙ্গে র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে আলাপ করে। কথা বলে পানি, ঘাস, লোকজন এসব নিয়ে। এরপর একটা প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটা ছিল, জেন যদি র‍্যাঞ্চটা বেচে দেয়, তা হলে ভালই দাম দেয়া হবে। ইঙ্গিতে জেনের মত একা মেয়েমানুষের পক্ষে যে একটা র‍্যাঞ্চ চালানো কতটা কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ, সেটাও বুঝিয়ে বলেছিল তারা।

জেন পাত্রা দেয়নি এসব উটকো হিতাকাঙ্ক্ষীদের। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, র‍্যাঞ্চ বেচার কথা সে মোটেই ভাবছে না।

এরপর চলে যায় তারা। জেন তাদের কথা ভুলে গিয়ে

কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করে। ফোরম্যান ডক ডোনাণ্ডের সঙ্গে আলাপ করে জানতে চাইল গরু চালান দেয়ার কাজটা ফের শুরু করা যায় কি না। ডোনাণ্ড চুপচাপ শুনে যায় আনাড়ি মালিকের কথা। তারপর তাতে সায় দেয়। এরপর থেকে চলছে রাউণ্ডআপের কাজ। ডোনাণ্ড হাড়ভাঙা খাটছে লোকজন নিয়ে। জেন আশা করছে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে তার গরুর পাল যাত্রা শুরু করবে একশ' মাইল দূরের ওমাহার উদ্দেশে। তবে সেজন্যে আরও কাজের লোক চাই। কম পক্ষে দু'জন।

আজ সকালে কাজের লোকেরা রাউণ্ডআপে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই লোক দু'জন এসেছিল। র‍্যাঞ্জে কেবল টম আর ও নিজে। রাঁধুনি লোকটা বুড়ো। রান্নাবান্না ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও দিকে উৎসাহ নেই তার।

দু'জন লোকই তাগড়া জোয়ান। লম্বাটে মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। একজনের কোমরে হোলস্টার। দু'জনের দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল সে-ই। এসে সরাসরি বলল, কাজ খুঁজছে। শহরে এসে সে কথা বলতে লোকজন বার-বি'র কথা বলল। সেজন্যেই তাদের আসা। লোকগুলো এমনভাবে কথা বলছিল, যেন চাকরি হয়েই গেছে তাদের।

‘কিন্তু শহরের কাউকে আমি বলিনি আমার লোক লাগবে। ভাবছি ওরা কী করে জানল?’ চিন্তিত স্বরে বলল জেন।

‘সেটা এমন অবাক করার বিষয় তো নয়।’ হাসল পিস্তলধারী। ‘তোমাদের রাউণ্ডআপের খবর তো আর গোপন কিছু নয়। এসময় বাড়তি লোক লাগতেই পারে। কাজ খুঁজছিলাম, মানুষ তাই এদিক দেখিয়ে দিল। আমরা একটা সুযোগ নিলাম আর কী।’

এটা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত। জেন স্বীকার করল মনে মনে। কিন্তু

লোকগুলোকে তারপরও পছন্দ হলো না।

‘তোমাদের নাম বলোনি কিন্তু।’

‘বলিনি? তুমিও অবশ্য জানতে চাওনি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো মানুষের ব্যাপারেই আগ্রহ দেখাবে। মানুষ পছন্দ হলে নামে আর কী আসে-যায়? যা হোক, আমি,’ পিস্তলধারী নিজের বুকের দিকে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করল, ‘প্যাট কিলগ্রাম, আর ও আমার সঙ্গী রস মাউন্ট।’

ঠাট্টা করছে লোকটা, পরিষ্কার বুঝতে পারল জেন। যেভাবে হোক, জেনকে ঠাট্টার পাত্রী হিসেবে ধরে নিয়েছে। রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। কিন্তু জবাব দিল হাসিমুখেই, ‘সুন্দর নাম। দু’জনেরই। তবে দুঃখিত, চাকরির ব্যাপারে কোনও সুসংবাদ পাচ্ছ না তোমরা। আমি এখনই লোক রাখার কথা ভাবছি না।’ কাঁধ ঝাঁকাল। ‘তোমাদের আর কোনও কথা না থাকলে...’ ওঠার ভঙ্গি করল।

‘দাঁড়াও, ম্যাম।’ হাসি উবে গেল পিস্তলধারীর মুখ থেকে। ‘তুমি সম্ভবত বুঝতে পারছ না তোমার সমস্যাটা। তোমার লোক দরকার। এই র‍্যাঙ্কটা তুমি একা চালাতে পারবে না। হয়তো তোমাকে এটা বেচে ফেলতে হবে, নইলে খোয়াতে হবে। বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে তোমাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে।’

‘ওটা যদি সত্যি হয়, তা হলে সমস্যাটা আমার। কিন্তু তোমরা তা নিয়ে এমন ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না,’ বিরক্ত হলো জেন। ‘ঠিক আছে, তোমাদের উপদেশ মনে থাকবে। তবে এখন আমার লোকের দরকার নেই।’

লোকদুটো আর কথা বাড়াল না। উঠে গেল। তবে যাবার সময় বলে গেল, ‘আমাদের কথা শেষ হয়নি, ম্যাম। আমরা আবার আসব। তবে সেটা তোমার জন্যে ভাল হবে, সে-নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।’

মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে জেনের। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দু'বার র‍্যাঞ্চ বেচার উপদেশ এবং হুমকি শুনল ও। র‍্যাঞ্চটা চালাতে পারবে কি পারবে না, সেটার সিদ্ধান্ত ও নিজেই নেবে। কিন্তু বাইরের অজানা-অচেনা লোকজন এসে মুফতে কেন উপদেশ দিচ্ছে, এটা ওর মাথায় ঢুকছে না। কেউ কি চাইছে না বার-বি র‍্যাঞ্চ বলে কিছু এখানে থাকুক? তাতে কার কী লাভ?

দুই

শহরটার নাম রিংস্টোন। শেরিফ মর্ট ইন্সম্যান অফিস থেকে বের হতেই লোকটাকে শহরে ঢুকতে দেখল। মাঝারি আকারের একটা ঘোড়ায় চড়েছে, তাকে দেখে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। সাধারণ ভবঘুরে ভেবে চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আবার তাকাল। ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে লোকটা। ঘোড়া থামিয়ে নেমে আস্তে করে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল। 'হাউডি।'

তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে সামনে এগোতে শেরিফ প্রশ্ন করল, 'অনেক দূর থেকে আসছ মনে হয়?'

থামল আগন্তুক। 'বলতে পার।'

'কাজ খুঁজছ?'

'পেলে করব। খেতে হয় যে।' সামনের দিকে হাত বাড়াল। 'সেলুন, না? ওখানে গিয়ে ঢুকব। কাজের লোক চাইছে এমন

কেউ থাকলে ওখানে পাব।’

‘এখানে বোধহয় হবে না,’ লোকটার উরুর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল শেরিফ। ‘ওটার কাজ এখানে নেই।’ হোলস্টারটার দিকে ইঙ্গিত করল।

লোকটা হাসল। ‘কীভাবে বুঝলে যে ওটাই চাইছি? এখানকার লোক গরু পালে না?’

‘পালে।’ মুখ ফিরিয়ে নিল শেরিফ। উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে আগন্তুকের ওপর থেকে। সাধারণ কাউছাণ্ডের সঙ্গে বেশি কথা বলার দরকার মনে করছে না। লোকটা ফের সামনে এগোতে বলল, ‘ওটা ইচ্ছে করলে শেরিফের অফিসে জমা রাখতে পার। গরু চরিয়ে খায়, এমন লোকের কোমরে সারাক্ষণ ওটা ঝুলে থাকার দরকার কী?’

থেমে ঘাড় ফেরাল আগন্তুক। গভীর নীল দু’চোখ মেলে দেখল শেরিফকে। মৃদু স্বরে বলল, ‘ধন্যবাদ পরামর্শটার জন্যে। তবে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। ওটার ভার বওয়ার ক্ষমতা আমার আছে।’

পাশ দিয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ আবার। তাকাল দু’জনে। ‘হাই, জেন।’ হাসল শেরিফ। মাথা থেকে টুপি নামাল।

‘ব্যাংকে যাচ্ছি, মি. ইন্সম্যান।’ মাথা দোলাল জেন ম্লান মুখে। ‘মি. রবিনসন দেখা করতে বলেছেন।’

‘দেখো। নিশ্চয় লোন নিয়ে কথা বলতে চায়। গতকাল বলেছিল, খুব নাকি টানাটানি যাচ্ছে ফ্রেডের।’

মেয়েটির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল আগন্তুক। চোখাচোখি হতেই মৃদু হেসে অভিবাদন জানাল।

চলতে শুরু করল জেন। শেরিফও ফের অফিসের দিকে পা বাড়াল। সামনের সেলুনের দিকে ঘোড়া হাঁটিয়ে চলল আগন্তুক।

হিচরেইলে ওটাকে বেঁধে ভেতরে ঢুকল। একটু পরে বেরিয়ে

এল ফের। ব্যাংকের দিকে হাঁটা শুরু করল।

ভেতরে ঢুকতে কাঁচে ঘেরা কক্ষটায় টেবিলের ওপাশে মোটা গোলগাল লোকটাকে দেখল। ওর সামনে বসে আছে জেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল আগন্তুক। নিজের নাম বলল, ‘স্টিভ রাসেল।’

হেলান দিয়ে বসে আছে ব্যাংকার ফ্রেড রবিনসন। ভুরু কুঁচকাল সে অবস্থায়। ‘কী কাজে আসতে পারি তোমার?’ কাউবয়ের পোশাক পরা ধূলিধূসর লোকটাকে তেমন পাত্তা দেয়ার দরকার মনে করছে না।

‘অনেক কাজে।’ হাসল স্টিভ। ‘ভবিষ্যতে। আপাতত কিছু টাকা জমা রাখতে চাই।’

‘কত টাকা?’ ভুরুর ভাঁজ মিলিয়ে যেতে শুরু করল ব্যাংকারের। তবে একেবারে চলে যেতে দিল না। ধরে রাখল কিছুটা।

‘আপাতত হাজার তিনেক।’

‘এক মিনিট।’ সোজা হয়ে বসল ব্যাংকার। ভুরু ফের মসৃণ। বেল চেপে কাউকে ডাকল। তারপর জেনের দিকে চেয়ে মুখ অন্ধকার বানিয়ে ফেলল। ‘দুঃখিত, মিস অস্টিন। আ-আমি আর সময় দিতে পারছি না। মাসখানেকের মধ্যে টাকাটা লাগবে আমার। পাঁচ হাজার ডলার পুরোটাই। নতুন করে আর কোনও লোন দেয়া তো সম্ভবই নয়।’ কাঁধ ঝাঁকাল। ‘সত্যিই দুঃখিত। তোমার রাউণ্ডআপ শেষ হতেই কম পক্ষে একমাস লাগবে। তারপর চালান। সে-ও কম সময়ের ধাক্কা নয়। পাওনা টাকা এতদিন ফেলে রাখলে ব্যাংকে লালবাতি জ্বালতে হবে। তোমার বাবা থাকলে অবশ্য চিন্তা ছিল না। বর যে করেই হোক ব্যাপারটা সামলে নিতে পারত। কিন্তু তুমি নেহাত বাচ্চা মেয়ে...’ আবার কাঁধ ঝাঁকাল। ‘কে জানি বলছিল, মি. হাইগুস তোমার ব্যাঙ্ক কিনে

নিতে চায়। ...ঠিক আছে, সেটা তোমার সিদ্ধান্ত। এখন তা হলে...'

অপমানে মুখ লাল হয়ে উঠল জেনের। এভাবে প্রত্যাখ্যান আশা করেনি ব্যাংকের কাছ থেকে। চট করে পাশের চেয়ারে বসা অচেনা লোকটার দিকে চাইল।

চুপচাপ নির্বিকার মুখে বসে আছে লোকটা। জেন আর ব্যাংকারের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছে, সেদিকে যেন মনই নেই।

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে চুপচাপ উঠে দাঁড়াল। আরেকবার তাকাল লোকটার দিকে। আরে! কিছুক্ষণ আগে না শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে লোকটাকে!

বাইরে থেকে একজন এসে ঢুকল। ব্যাংকার ওকে কেরানিকে ডেকে আনতে বলল।

নগদ তিন হাজার ডলার ব্যাংকে জমা করে বেরিয়ে এল সিঁভ। সেলুনে ফিরে এসে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসল।

একটু পরে একজন এসে ঢুকল। ঘাড়-গর্দানে বেশ ভর ভরন্ত অবস্থা লোকটার। মুখ দেখে মনে হয়, নিজকে ছাড়া আর কাউকে পাস্তা দেয়ার তেমন গরজ মনে করে না।

সিঁভ যে-টেবিলটায় বসেছে, সে-টেবিলে এসে বসল লোকটা। দশাসই শরীরের ভারে ক্যাচ ম্যাচ করে উঠল কাঠের চেয়ার। পাস্তা দিল না লোকটা, টেবিলে এক ঘুসি লাগাল। 'রাই।'

প্রচণ্ড ঘুসিতে কেঁপে উঠল টেবিল। সিঁভের গ্লাস থেকে ছলকে বাইরে পড়ল মদ। লোকটার দিকে এক নজর চাইল সিঁভ। তারপর চুপচাপ গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বাকি মদটুকু গিলে ফেলল এক ঢোকে। সরে গিয়ে বসল আরেক টেবিলে।

ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করল দশাসই চেহারা।

ভরা গ্লাস এনে ওর সামনে রাখল বারটেণ্ডার। মৃদু স্বরে বলল,

‘ওরকম হৈ চৈ করার দরকার কী, জেট? তুমি না চাইলেও তোমার সামনে সময়মত এসে যেত গ্লাস।’

‘গুড! নতুন মালটা কে?’

‘জানি না। তুমি জিজ্ঞেস করলেই তো পার।’

‘আমি কি যার-তার সাথে কথা বলি?’ মুখ ঝামটে উঠল জেট। তারপর বিড়বিড় করল, ‘পিস্তল বুলিয়েছে। কিন্তু এমন একটা থাবড়া খেয়েও দেখি চুপচাপ।’

‘ওটা টেবিলে মেরেছ।’

‘অ। তা হলে গালে মারা দরকার ছিল।’

আস্তে বললেও ওর কথা শুনছে সবাই। স্টিভের মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। বারটেগারকে ডেকে আরেক গ্লাস চাইল সে। তাকাল জেটের দিকে। ‘তোমার কোমরে পিস্তল নেই।’

‘ক্...কী বললে?’ বিষম খাওয়ার উপক্রম হলো জেটের। লোকটা কথা বলে উঠবে, আশা করেনি।

‘পিস্তল ঝোলায় না, এমন লোকের সঙ্গে কথা বাড়াই না আমি।’

‘হাতাহাতি লড়াইকে ভয় পাও?’

ওর চোখে চোখ রাখল স্টিভ। এক মুহূর্ত পরে বলল, ‘হ্যাঁ, পাই।’

‘কেন?’ দাঁত বের করে হাসল জেট। ‘ঠিক আছে, আস্তে মারব। লড়বে নাকি?’

‘না। কিন্তু তুমি ছুট করে লড়াই করার জন্যে উতলা হয়ে উঠলে কেন, মিস্টার?’

আবার দাঁত বের করল জেট। ‘ভয় পাওয়া মুখ দেখতে ভাল লাগে আমার।’

লোকটাকে পাত্তা দিল না স্টিভ। ‘তা হলে সারাক্ষণ আয়নার সামনে বসে থেকো।’

লোকটা ঠাটা করছে, জেটের মোটা বুদ্ধিতেও তা ধরা পড়ল। মুখ লাল হয়ে উঠল। এই বেয়াদবির জন্যে ওর উচিত ওকে পেটানো। কিন্তু সেজন্যে লড়াই দরকার। লোকটা পিস্তল ঝুলিয়েছে, খালি হাতে লড়াই বলে মনে হয় না।

হাত নিশাপিশ করছে। ছুতো খুঁজছে জেট।

একটা চোখ স্টিভের ওপর রেখে বারটেগারের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। ‘টেড, অস্টিনদের মেয়েটাকে শহরে দেখলাম।’

মাথা ঝুঁকাল বারটেগার। কিছু বলল না।

‘একা। ওর যে বয়স, এ সময়ে মেয়েদের একজন পুরুষ দরকার। আমার মত, শক্ত-সমর্থ।’

‘ওকে বলেছ?’ নিরীহ প্রশ্ন বারটেগারের।

‘বলব।’ মদের গ্লাসে শেষ চুমুক দিল জেট। ‘এখনই।’

ঠক করে টেবিলের ওপর গ্লাসটা রাখল। উঠে দাঁড়াল।

মেয়ারটাকে তার নিজের মত করে চলতে দিয়েছে জেন। র‍্যাঞ্জে ফিরে যাচ্ছে। মাথায় চিন্তার ঝড়। ব্যাংকারের কথাগুলো কানে বাজছে। ‘আর সময় দিতে পারছি না। মাসখানেকের মধ্যে টাকাটা লাগবে আমার। পাঁচ হাজার পুরোটাই।’

জেনের হাতে নগদ টাকা বলতে এক পয়সাও নেই। রসদপত্র, কর্মচারীদের বেতন—সব চলছে বাকির ওপর। ব্যাংক থেকে আরও কিছু ধার পেলে সমস্যাগুলো মেটানো যেত। কর্মচারীরা অসন্তুষ্ট। তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারে জেন। নেহাত অনেক দিনের পুরানো বলেই কিছু বলছে না হয়তো। ফোরম্যান কী করে যেন বুঝিয়ে রাখছে ওদের।

সমস্যাটা অবশ্য মিটে যেত। হাজার তিনেক গরু চালান দিলেই বিশ হাজার ডলার হাতে এসে যায়। ব্যাংকের লোনসহ সব খরচ মিটিয়েও হাতে আরও প্রচুর থাকে। সেটা ফ্রেড

রবিনসনও বোঝে। তার পরেও কেন ধার দিচ্ছে না এবং পুরানো ধার শোধ করার জন্যে সময় পর্যন্ত দিতে চাইছে না, সেটা জেনও বোঝে। এরা চায়, সে ব্যাংকটা বেচে দিয়ে চলে যাক। কেন চাইছে, সেটাই বুঝতে পারছে না।

পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে চিন্তায় বাধা পড়ল ওর। ঘাড় ফেরাল। একটা লোক আসছে খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে। কে লোকটা? জেনের কেন যেন মনে হলো লোকটা ওকে ধরার উদ্দেশ্যেই আসছে। মেয়ারের রাশে টান দিল ও। ব্যাংকার কি ওকে কিছু বলার জন্যে কাউকে পাঠিয়েছে? ঘোড়া ছোটানোর তাড়া দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। মত পাল্টেছে হয়তো লোকটা।

তিন

একটা আশা জেগে উঠল মেয়েটার মনে। ব্যাংকার যদি মত পাল্টায়, তা হলে ওর সমস্যা মিটে যাবে। আপাতত হাজার দুয়েক ডলার পেলেও কাজ চলবে।

জেনের ঘোড়ার পাশে এসে গতি কমাল ঘোড়সওয়ার। রাশ টেনে ধরে দাঁতো হাসল। ‘হাই, ম্যাম।’

‘ইয়েস।’ ঘাড় ফেরাল জেন। ‘কোনও খবর?’

‘জেট ম্যাডন তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।’

‘কে তুমি?’

‘চাইলে তোমার সবচেয়ে আপনও ভাবতে পার।’

‘কীভাবে? তোমাকে চিনি বলেই তো মনে হচ্ছে না।’

‘সেজন্যেই তো পরিচয় পর্বটা সেরে নিতে এলাম। ঘোড়া থামিয়ে কিছুক্ষণ বসলে হয় না? কিংবা সমস্যা না হলে তোমার র‍্যাঞ্জেও আমন্ত্রণ জানাতে পার।’

গা ঘিন ঘিন করে উঠল জেনের। ভয়ও পেল। বুঝে গেছে লোকটার উদ্দেশ্য খারাপ। অবাক হলো ও। পশ্চিমে আসার পর এখানকার লোকগুলোকে যতটা চিনেছে, তারা মেয়েদের সম্মানই করে থাকে।

ও শহরে খুব কম আসে। প্রয়োজন হয় না। র‍্যাঞ্জেওর জন্যে দরকারি জিনিসপত্র লোকেরা এসে কিনে নিয়ে যায়। গত দু’বছরের মধ্যে এবার নিয়ে বোধহয় বার তিনেক শহরে এসেছে সে। ঘাড়ে-গর্দানে বিশাল এ লোকটাকে কখনও চোখে দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। কিন্তু যা-ই হোক, লোকটা যে ভাল নয়, এটা বুঝে গেছে।

মেয়ারটাকে থামাচ্ছে না সে। চলার ওপর রাখছে। একা শহরে এসেছে বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে এখন। কিন্তু না এসেও তো উপায় ছিল না।

লোকটা আরও কাছে ঘেঁষে এসেছে। ‘কী হলো? চুপ হয়ে গেলে যে? প্রস্তাব পছন্দ হয়নি? দেখো, বেশি ডাঁট দেখিয়ে না। জেট ম্যাডন ডাঁট দেখানো পছন্দ করে না। অন্তত মেয়েদের কাছ থেকে তো একদম না। ঘোড়া থামাও। নইলে আমি থামাব।’

কী করবে বুঝতে পারছে না জেন। ঘোড়া থামালে লোকটা নির্ঘাত হামলা করবে। আর না থামালে জোর করে থামাতে চাইবে। ওর রোনটা জেনের মেয়ারের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। ধাক্কা দিলেই মেয়ার ছিটকে পড়বে রাস্তা থেকে। এতক্ষণ খোলা জায়গা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। সামনে একটা সরু গিরিপথ। দু’দিকে অনুচ্চ পাহাড়। ঘন জংলায় ভরা। তবে টানা পাহাড় নয়,

দু'দিকের পাহাড়েরই মাঝে মাঝে আবার পথ আছে। গিরিপথে যদি লোকটা ওকে বাগে পেয়ে যায়!

খোলা জায়গাতেই লোকটার মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ঘোড়ার রাশে টান দিল। ঝট করে ঘাড় ফেরাল লোকটার দিকে। 'কী চাও তুমি?' ফুঁসে উঠল।

ম্যাডনের মাথায়ও এমন চিন্তা ছিল বোধহয়। যদিও কাউকে আশা করছে না, তবু এরকম খোলামেলা জায়গায় ঝুঁকি নিতে চাইছিল না সে। গিরিপথে ঢুকে গেলে পাহাড়ের আড়ালে নিশ্চিন্তে নিজের বদ মতলব হাসিল করা যাবে। তাই মেয়ারটাকে থামানোর জন্যে জোর করছিল না। কিন্তু এভাবে ছট করে থেমে যাওয়ায় ওর ঘোড়া গতির বেগে কিছুদূর সামনে চলে গেল। থিঙ্গি করে উঠে রোনের লাগামে টান দিল সে। আচমকা টান খেয়ে চিঁহিঁহিঁ করে প্রতিবাদ জানাল জানোয়ারটা। নিজের বেগ সামলাতে সময় নিল কিছুটা। তাতে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ম্যাডনের। রাগের চোটে জ্বারে স্পারের খোঁচা দিল ঘোড়ার পাজরে। গতি সামলাতে ব্যস্ত ঘোড়াটা আচমকা গুঁতোয় বেদিশা হয়ে ফের ছোট্টার উদ্যোগ নিল।

ঘোড়াটার মা-বাপ তুলে গাল ঝাড়ল ম্যাডন। তবে নিজের ভুলটাও বুঝতে পারল। গলা নামিয়ে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলল। তারপর ওটাকে পেছনে ফেরাল।

পেছনে কেউ নেই। খট খট শব্দ শুনে সামনের দিকে চোখ তুলতেই দেখল মেয়েটাকে। রিংস্টোনের দিকে ফের ছুটিয়েছে মেয়ারটাকে।

আবার ঝেড়ে গাল দিল ম্যাডন। মেয়েটার চালাকি ওর মোটা মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। সে-ও ঘোড়া ছোটাল। দাঁত কিড়মিড় করছে। ধরতে পারলে মেয়েটাকে স্রেফ চিবিয়ে খাবে, এমন

প্রতিজ্ঞা করে বসল মনে মনে।

তুমুল বেগে মেয়ারটাকে রিংস্টোনের দিকে ছুটিয়েছে জেন। লোকটা ফের ধাওয়া করার আগে যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে চাইছে। ওর মনে ক্ষীণ আশা, সামনে থেকে কাউকে হয়তো এদিকে আসতে দেখবে। তা হলে পেছনের লোকটা আর বদমায়েশি করার সাহস পাবে না।

রোনটাকে তুমুল বেগে ছোটানোর চেষ্টা করছে ম্যাডন। পাঁজরে অনবরত স্পারের খোঁচা খেতে খেতে মাঝে মাঝে মুখ উঁচিয়ে ডাক ছেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ছুটছে সে। তবে আগের তুলনায় মেয়ারের গতি বেড়ে যাওয়ায় কাছাকাছি হতে সময় লাগছে।

খোলা প্রান্তরটা পেরিয়ে গেল জেন। সামনে একটা বাঁক পেরোলে আবার একদিকে পাহাড় আর একদিকে প্রান্তরঅলা পথ। পেছনের রোনটা অনেক কাছে এসে গেছে আগের চেয়ে। দূরু দূরু বুকে প্রার্থনা করছে জেন, সামনে যেন কাউকে দেখতে পায়। রিংস্টোন এখনও আধঘণ্টার পথ।

তুমুল বেগে বাঁক ফিরল মেয়ার। সামনে চোখ পড়তে স্বস্তিতে ভরে উঠল জেনের বুক। আসছে। একটা লোক আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে। মেয়ারের লাগামে টান দিল সে। গতি কমাল মেয়ার। লোকটার কাছে কীভাবে সাহায্যের কথা বলবে, ভাবতে ভাবতেই ওর সামনে এসে রাশ টানল অশ্বারোহী। মাথা থেকে হ্যাট নামাল। ঝিকিয়ে উঠল ওর চোখের তারা। ‘সমস্যা, ম্যাম?’

পেছনে বাঁকের আড়াল থেকে খটাখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখনই বাঁক পেরিয়ে এসে পড়বে ধাওয়াকারী। ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকাল জেন। তারপর আবার তাকাল লোকটার চোখে। চিনতে পারল। রিংস্টোনের ব্যাংকে ফ্রেড রবিনসনের ঘরে ঢুকে এই লোকটাই ওর পাশে বসে টাকা জমা দিয়েছে। ভয়াব্র মুখে

মাথা দোলাল জেন। পেছনে ইঙ্গিত করল। ‘ওই লোকটা...’ ফের ঘাড় ফেরাল।

‘কোন লোকটা দেখি।’ জেনের মাথার ওপর দিয়ে তাকাল লোকটাও। সবেমাত্র বাঁক পেরিয়ে আসা ম্যাডনকে দেখে নিমেষে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। শান্ত গলায় বলল, ‘হুম। ঠিক আছে। আমি দেখছি। তুমি চিন্তা কোরো না।’

রোনের গতি কমিয়ে ওদের কাছে এসে পড়ল ম্যাডন। লোকটার দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, ‘তুমি?’

‘হ্যাঁ,’ মৃদু স্বরে বলল লোকটা।

‘তুমি তোমার কাজে যাও,’ খেঁকিয়ে উঠল ম্যাডন। ‘এখানে তোমার নাক গলানোর কিছু নেই। কে তুমি?’

‘চিনবে না। তেমন বিখ্যাত কেউ নই। তবু নামটা জেনে রাখো। স্টিভ রাসেল। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেয়াদবি করতে দেখলে হাড়ে হাড়ে চিনিয়ে দেব। বাকি জীবন আর ভুলতে পারবে না।’

সেলুনে এই লোকটার সঙ্গেই কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তখন কিন্তু এভাবে কথা বলেনি। ভাবছে ম্যাডন; বরং ওর চ্যালেঞ্জের মুখে মিইয়ে গিয়েছিল।

অস্ত্রে দক্ষতা নেই ম্যাডনের। তাই অস্ত্র ঝোলায় না। তবে খালিহাতে মারপিটে রিংস্টোনে ওর সমান কেউ নেই। নিজের শক্তি-সামর্থ্য আর দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই তার। এর মত চারজনকে একাই সামলাতে পারে সে। কোমরে পিস্তল ঝোলায়, এমন কাউকে খালিহাতে মারপিট করতে দেখেনি।

‘সোজা চলে যাও, যদিকে ইচ্ছে। এই ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত কোরো না।’

‘না গেলে কী করবে?’ দাঁত বের করল ম্যাডন। ‘গুলি করবে নাকি? কোমরে তো পিস্তল দেখছি। মুরোদ থাকলে...’

‘না, তোমাকে মেরে ফেলব কেন?’ কোমরে হাত দিল সিঁভ। ‘তুমি তো আমার দিকে পিস্তল তুলছ না।’ হোলস্টার খুলে ফেলল। মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরল। ‘ওটা রাখো, ম্যাম।’ ম্যাডনের দিকে চাইল। ‘নেমে এসো। তোমার নিয়মেই তোমাকে বানাই।’

থমকে গেল ম্যাডন। এই প্রথম কেউ তাকে মারপিটের আমন্ত্রণ জানাল নিজের থেকে। এর আগে যত মারপিট করেছে, কেউ তাকে এভাবে লড়তে ডাকেনি। সে-ই বরং আগ বাড়িয়ে গিয়ে মেরেছে। রিংস্টোনের মাস্তানগুলো ওকে সমীহ করে চলে। সেই তাকেই কি না বাইরের কেউ এসে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে! অথচ সেলুনে এ লোকটাই ওর প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণে ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল।

জেনের দিকে চাইল সে। ঈশ্বর! কী দেহবল্লরী! লোকটা হঠাৎ উদয় না হলে এতক্ষণে মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তি শুরু করত সে।

রিরংসায় হিতাহিত জ্ঞান হারাল ম্যাডন। বাধা দিতে আসা লোকটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেবে সে।

এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। রাগে বিশাল মুখ বিকৃত। মুঠো পাকিয়ে ঘুসি হাঁকাল। আশা করছে, প্রথম ঘুসিতে ছিটকে পড়বে দেখতে ওর চেয়ে দুর্বল অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু দুর্বল লোকটাকে যেন বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠতে দেখল ম্যাডন। ওর ঘুসি লোকটার শরীরের নাগাল পাওয়ার আগেই লোকটার উড়ন্ত পায়ের লাথি খেল ঘুসি মারার জন্যে মুঠো পাকানো হাতে। পরমুহূর্তে ওর ডান হাতের ঘুসি খেল বাম কপালে।

প্রায় একসঙ্গেই পর পর দুটো আঘাতে টলে উঠল ম্যাডনের শরীর। ছুটে আসা ঘুসি কাটানোর চেষ্টা না করে কেউ যে লাফিয়ে উঠে লাথি মারতে পারে, এই প্রথম দেখল সে। মারামারিতে ওর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমনটা আর দেখেনি। মাটিতে নেমেই শরীর

ঘুরিয়ে ফেলল সিঁভ । মুঠো পাকিয়ে ফের মারতে এগোল ।

সাবধান হলো ম্যাডন । প্রতিপক্ষকে প্রথমে পাত্তা না দিয়ে
বিরাট গাধামি করে ফেলেছে । লোকটার ঘুসিটা কাটানোর চেষ্টা না
করে বাম হাতে নেয়ার সিঁদ্বান্ত নিল । একই সঙ্গে ডান হাতে ফের
ঘুসি হাঁকাতে গেল ।

কিন্তু মাঝপথেই নিজেকে গুটিয়ে নিল সিঁভ । পিছিয়ে চট
করে এক পাশে সরে গেল ।

খ্যাপা ষাঁড়ের মত সামনে এগোনোর গতি সামলানো দায়
হয়ে পড়ল ম্যাডনের জন্যে । পুরোপুরি স্থির হওয়ার আগে
সিঁভকে ছাড়িয়ে আরেকটু সামনে এগিয়ে গেল । কিন্তু সোজা
হওয়ার আগে ঘুরে গিয়ে পা চালাল সিঁভ । পাছায় লাথি খেয়ে
সামনের দিকে মুখ খুবড়ে পড়ল রিংস্টোনের বড় মাস্তান ।

লাফিয়ে সামনে বাড়ল সিঁভ । লোকটা উঠে দাঁড়ানোর আগে
ওর ঘাড়ের রদা বাড়ল দুটো । তারপর সোজা হয়ে ফের লাথি
মারল পিঠে ।

বেদিশা বোধ করছে ম্যাডন । সিঁভের মারামারির ধরনটা
বুঝে উঠতে পারছে না বেচারি । মারপিট বলতে ও বুঝে,
সামনাসামনি একে অন্যকে ঘুসি মারা । এভাবে মারামারি করেই
প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছে সব সময় । কিন্তু এ লোকটাকে
এখনও একটা টোকা পর্যন্ত লাগাতে পারেনি!

চার

মরিয়া হয়ে উঠল ম্যাডন। ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল বিশাল শরীর নিয়েও। তারপর অন্ধের মত ছুটল প্রতিপক্ষের দিকে। যেভাবেই হোক একটা ঘুসি লাগাতে হবে লোকটার গায়ে। ও নিশ্চিত, ওর ঘুসি সওয়ার ক্ষমতা নেই এই লোকের। এতক্ষণ স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। ওর মারটা বুঝতে না পারার কারণেই এক তরফা মার খেয়েছে ও নিজে।

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে দেখছে সিঁভ। লোকটা মারপিটে একদম আনাড়ি। গায়ের জোরে সম্ভবত তার চেয়ে আনাড়ি কাউকে মেরে-টেরে নিজেকে কেউকেটা ভেবে বসে আছে। মারপিটের আসলে কিছুই জানে না। তবে শক্তিশালী লোক হিসেবে ঘুসির জোর আছে নিশ্চয়। সুতরাং ওকে মারার সুযোগ দেয়া যাবে না। মার খাওয়ার ভয় করছেও না সে। বিশাল শরীর নিয়ে নড়াচড়ায় ওর তুলনায় রীতিমত মস্তুর লোকটা। ওর তড়িৎগতিই লোকটার ওপরে সুবিধে দিচ্ছে। রণকৌশল ঠিক করে ফেলল। লোকটার আক্রমণগুলো যথাসম্ভব ঠেকিয়ে ওকে মারবে।

মত্ত হাতির মত ঘুসি বাগিয়ে এগোল ম্যাডন। রাগে ফুঁসছে। নাকের ছেঁদা দিয়ে তুফানের মত বেরিয়ে আসছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। প্রতি নিঃশ্বাসে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ অক্সিজেন টেনে নিচ্ছে।

অবাক হয়ে চেয়ে আছে জেন। অত' বড় লোকটাকে এভাবে মারছে তার চেয়ে দেখতে-শুনতে অনেক দুর্বল একটা লোক। বিশ্বাসই হতে চাইছে না।

মাথা নিচু করে পিঠ সামান্য বাঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে স্টিভ। লোকটাকে আসার সুযোগ দিচ্ছে। নিমেষে কাছে এসে গেল ম্যাডন। মোক্ষম ঘুসিটা হাঁকাতে গেল স্টিভের মুখ সই করে। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিল স্টিভ। ওর মুখের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা। আরেকটু নিচু হয়ে সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে শত্রুর কাঙ্ক্ষিত মুখটা না পেয়ে নিজের শরীরের ঝোঁক সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়া ম্যাডনের পাঁজরায় মারল বাম হাতের ঘুসিটা। প্রচণ্ড মারে অঁক করে উঠল ম্যাডন। হালকা-পাতলা শরীর হলে ওই ঘুসিতে পাঁজরের হাড় ভেঙে যেত। কিন্তু তারপরও প্রচণ্ড ব্যথায় মোচড় খেল ওর শরীর। মুক্ত কণ্ঠে গাল দিল স্টিভের চোদ্দ গুণি ধরে।

‘সোজা নিজের ঘোড়ায় গিয়ে ওঠো!’ হিসহিসিয়ে উঠল স্টিভ। ‘তারপর দূর হও এখান থেকে নোংরা শুয়োর কোথাকার!’

‘চমৎকার!’ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ম্যাডন। ‘আমি চলে যাই, তারপর তুমি মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তি করো। সে হবে...’

মুখের ওপর আচমকা যেন বজ্রাঘাত হলো ম্যাডনের। টেরই পেল না যেন লোকটা কখন লাফিয়ে এসে ওকে মারতে শুরু করেছে। দু’হাত পিস্টনের মত চালাচ্ছে স্টিভ। প্রকাণ্ড লোকটার মুখে নোংরা ইঙ্গিতময় কথা শুনে মাথায় আগুন ধরে গেছে। পরের দু’মিনিট সামনে এগোল আর পেছাল সে। লোকটার মুখে, কপালের পাশে আর পাঁজরায় অনবরত পেটাল। ওর গতির তুলনায় শোচনীয়ভাবে ধীর লোকটা মার সামলানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না।

‘ওঠো!’ থামল স্টিভ। মারের চোটে লবেজান লোকটাকে

আঙুল উঁচিয়ে ওর ঘোড়াটা দেখিয়ে দিল। ‘ওটার পিঠে চড়ে সোজা চলতে থাক। আশপাশে থামবে না কোথাও। যেখান থেকে এসেছ, সোজা সেখানে চলে যাও। আর সামনে কোনও ভদ্রমহিলার দিকে চোখ তুলেও যেন চাইবার চেষ্টা কোরো না। দেখতে পেলো সোজা চোখ গেলে দেব। কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করবে, নিজের ভাল চাইলে।’

প্রচণ্ড মারে অবস্থা কাহিল বিশালদেহীর। ট্যা-ফোঁ করার সাহস পেল না আর। ছোটখাট এই লোকটা কীভাবে মেরেছে ওকে ঠাইর করতে পারছে না। তবে এরপর ওর সামনে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে পারল না আর। চট করে মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল।

একটু পরেই রিংস্টোনের দিকে ছোটাল ওর রোন।

জেনের দিকে তাকাল স্টিভ। হাত বাড়াল। ওর হাতে হোলস্টার তুলে দিল জেন। তারপর একটু সঙ্কুচিত মুখে বলল, ‘ধন্যবাদ। তুমি সময়মত না এলে...’

‘তোমাকে কি তোমার ব্যাঞ্চে পৌঁছে দিয়ে আসব, ম্যাম?’

‘ন্-না, না, তার আর দরকার হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।’

‘লোকটা কে বলো তো? চেনো?’

‘না।’ ঘাড় নাড়ল জেন। ‘তবে সম্ভবত রিংস্টোনের হবে। আমি শহরে খুব বেশি আসি না। উমম...মনে পড়ছে, একবার ওকে রিংস্টোনে দেখেছিলাম তখন বাবা বেঁচে ছিল। তার সঙ্গে শহরে এসেছিলাম।’

‘তা-ই? কী নাম তোমার বাবার বলো তো?’

‘তুমি কি এখানকার কেউ?’ পাল্টা প্রশ্ন করল জেন। ‘নাম বললেই আমার বাবাকে চিনবে?’

‘চিনতেও পারি। বছর পাঁচেক আগে আমি এদিকে ছিলাম

কিছুদিন। শহরে না। শহরে আমার পরিচিত কেউ নেই।’

‘বব অস্টিন আমার বাবার নাম। খুব ভাল লোক ছিল। মাস দুয়েক আগে মারা গেছে অ্যামবুশে। তারপর থেকে...’ থেমে গেল জেন। অচেনা লোকটাকে এর চেয়ে বেশি বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছে না।

‘কিছু মনে না করলে...একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।’

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছে লোকটা। বিব্রত বোধ করছে জেন। কী জানতে চায়? ব্যাংকে ওকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। নতুন করে লোন কিংবা সময় বাড়ানো কোনোটার ব্যাপারে রাজি হয়নি ফ্রেড রবিনসন। এই লোক তখন ওর পাশেই বসেছিল। সম্ভবত ওই ব্যাপারে কিছু জানতে চাইবে। কিন্তু এটা পুরোপুরি একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিজে থেকে না বললে অন্যের জানতে চাওয়ার কোনোই অধিকার নেই।

তবে লোকটাকে একদম উড়িয়েও দিতে পারছে না। একটু আগেই একটা চরম বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। ওর কৌতূহল হলে সেটাকে প্রথমেই অনধিকার চর্চা বলে ভেবে বসাটা ঠিক হবে না।

‘বেশ। কিছু মনে করব না,’ মৃদু স্বরে বলল জেন। ‘কিন্তু তার আগে বলো, তুমি কি জানতে এই লোকটা আমাকে আক্রমণ করতে আসবে? নইলে একদম ঠিক সময়ে কী করে এসে হাজির হলে?’

আগন্তকের গভীর নীল চোখদুটোয় কৌতুক ফুটে উঠতে দেখল জেন। সঙ্গে যেন প্রশংসাও।

‘চমৎকার!’ বলল লোকটা। ‘তোমার জায়গায় আমি হলেও এ প্রশ্নটা করতাম।’

‘কিন্তু জবাবটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।’

‘আমার কিছু টাকা আছে, ম্যাম,’ বলল স্টিভ। ‘তোমার সামনেই সে টাকা ব্যাংকে রেখেছি। অনেকদিন ধরে জমাচ্ছিলাম

কিছু একটা করার ইচ্ছেয়। ধরো একটা র‍্যাঞ্চ। কিন্তু এ-টাকা দিয়ে তা হবে না। আরও টাকা চাই। সেজন্যে আমাকে আরও কিছুদিন চাকরি করতে হবে।’

‘চমৎকার পরিকল্পনা। তবে জবাব হিসেবে আমার প্রশ্নের সঙ্গে মিলছে না।’

‘আমি আসলে কাজ খুঁজছি।’

সতর্কতা ফুটল জেনের চোখে।

ব্যাপারটা চোখ এড়াল না স্টিভের। ‘কী ব্যাপার? হঠাৎ?’

‘সবাই শুধু কাজ খোঁজে। আমার কাছে। লাগবে না বললেও।’

‘লাগবে না?’

‘লাগবে। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।’

‘বুঝলাম না।’

একটু ইতস্তত করল জেন। বলবে কি না ভাবছে।

‘কেউ চাইছে তুমি র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করে দাও, তাই না?’

‘আশ্চর্য তো! তুমি কী করে জানো?’

‘শুনলাম তো।’

‘শুনেছ? কোথায়? কার কাছে? আমি কি বলেছি?’ জেন হতভম্ব।

‘ব্যাংকার বলেছে। বলল কোথাকার কোন্ মি. হাইওস নাকি তোমার র‍্যাঞ্চটা কিনতে চায়। কিন্তু তুমি রাজি হচ্ছে না। তাই বোধহয় পাওনা টাকার জন্যে চাপাচাপি করছে।’

অস্বীকার করে লাভ নেই। ভাবল জেন। লোকটা যখন এটুকু জেনে গেছে, তা হলে বাকিটুকু জানলেও আর সমস্যা নেই। তা ছাড়া এই লোক তাকে সাহায্য করেছে। বাঁচিয়েছে নোংরা একটা লোকের হাত থেকে। সুতরাং ও যখন জানতে চাইছে, তখন না বলাটাও এক ধরনের অকৃতজ্ঞতা হবে।

বলল সে। বাবার মৃত্যু, শেরিফের র‍্যাঞ্চ বেচার জন্যে যেচে এসে পরামর্শ দেয়া, উটকো লোকগুলোর কাজ খুঁজতে আসা, না পেয়ে হুমকি দেয়া থেকে শুরু করে ব্যাংকারের লোন পরিশোধের জন্যে চাপাচাপি এবং হাইওসের প্রস্তাব—কিছুই বাদ দিল না। বলল, ‘ভেবেছিলাম গরু চালান দিয়ে লোনের টাকাটা শোধ করব। রাউণ্ডআপও শুরু করেছি। কিন্তু টাকা নেই। কর্মচারীদের বেতন বাকি পড়ে গেছে। নতুন লোকও নিতে হবে ট্রেইলড্রাইভের জন্যে। ভেবেছিলাম, আরও কিছু লোন চাইব ব্যাংকে। কিন্তু ব্যাংক চাপ দিচ্ছে পুরনো লোন শোধ দেয়ার জন্যে।’

একটু থামল জেন। ‘আমি পাকা র‍্যাঞ্চার নই। তবে যেটুকু বুঝি, তাতে ব্যাংক আর লোন দিতে রাজি না হওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। কারণ সামনেই তো সব লোন শোধের সুযোগ দেখতে পাচ্ছে তারা। তা হলে?’

‘হুম।’ ওপর-নীচ মাথা দোলাল স্টিভ। ‘সোজা হিসেব। লোন পরিশোধের সুযোগ রয়েছে বলেই হয়তো তাদের মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে।’

‘মানে?’

‘মানে কেউ হয়তো চায় না, তুমি এখানে থাকো। তোমার বাবাকেও চায়নি তারা। কিন্তু তাকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ভেবেছিল, বাবার মৃত্যুতে তুমি ভয় পেয়ে যাবে। র‍্যাঞ্চ-ট্যাঞ্চ ফেলে পালিয়ে যাবে। কিন্তু...’

‘কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, আমি যাচ্ছি না,’ জেদের সঙ্গে বলল জেন। ‘আমার আর যাবার জায়গাও নেই। তা ছাড়া আমার বাবার কবর এখানে। আমি এখানেই থাকছি।’

‘কীভাবে থাকবে? যারা তোমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে, তারা অনেক শক্তিশালী, অনেক কূটকৌশলী। আক্রমণটা কখন

কোথেকে আসবে, টেরও পাবে না। আজকের ব্যাপারটাই চিন্তা করে দেখো। তুমি কি এটাকে কাকতালীয় ভাবছ? এই মাথামোটা লম্পটটাকে যে কেউ উসকে দেয়নি, সেটা কীভাবে বুঝবে?’

পাঁচ

রিংস্টোন থেকে মাইল দুয়েক দূরে থাকতেই ঘোড়ার রাশ টানল জেট ম্যাডন। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল। ভালই মেরেছে ওকে অচেনা লোকটা। ব্যাপারটা এখনও যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। এ পর্যন্ত অনেক মানুষকে পিটিয়েছে সে। কেউ ওর গায়ে এভাবে হাত তুলতে পারেনি। রিংস্টোনে নিজেকে মারপিটে প্রায় অজেয় ভাবতে শুরু করেছিল। কোনোদিন দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি এমন বেমক্কা মার খাবে।

গলা ছেড়ে খিস্তি করল ম্যাডন। আশপাশে কেউ নেই জেনে মনের সুখে ইচ্ছেমত নোংরা গালাগালের ভুবড়ি ছুটিয়ে লোকটার চোদ্দ গোষ্ঠির ভূত ছাড়াল। তারপর বামদিকে ছোট একটা রাস্তা ধরে এগোল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘোড়া ছুটিয়ে এক জায়গায় থামল। ওখান থেকে সিকি মাইল দূরে কিছু ঘরবাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ডানদিকের একটা ছোট জলাশয়ে নেমে হাত-মুখ ধুতে গেল। মুখে পানির ছিটে দিতেই জ্বালা করে উঠল। ককিয়ে উঠে বিড়বিড় করে আবার গালাগাল

করল লোকটাকে ।

মারের চোটে জখমি শরীর, মনেও কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না ম্যাডন । অস্টিনদের মেয়েটার পেছনে নিজে থেকে লাগেনি সে । ওকে লাগানো হয়েছিল । কাজটা ঠিকমত করতে পারলে বেশ কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল । তবে কাজটা কিন্তু বেশ ঝুঁকিরও । জানাজানি হয়ে গেলে নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেয়ার মত অপরাধ । কারণ মেয়েদের মান-ইজ্জতের ব্যাপারে এখানকার মানুষ খুবই সংবেদনশীল । তবে সেটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা ছিল না ম্যাডনের । কাজটা যে ওকে দিয়ে করাতে চেয়েছে, সে এখানকার প্রভাবশালী লোক । ধামাচাপা দেয়ার কৌশল জানা আছে তার । তা ছাড়া ধর্ম্মণের ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার আশঙ্কাও ছিল না বলতে গেলে । মেয়েটার মুখ না খোলারই সম্ভাবনা প্রবল ছিল । যত যা-ই হোক, এ-ধরনের অবমাননার ব্যাপারে পারতে মুখ খুলতে চাইত না কোনও মেয়ে । সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটা এখানে একদম একা । ওর হয়ে কেউই আসতে চাইত না মি. হাইগুসের বিপক্ষে ।

দুপুরে মি. হাইগুস শহরে ছিল । মেয়েটাকে ব্যাংকে আসতে দেখে পরিকল্পনাটা গজিয়ে উঠেছিল ওর মাথায় । তারপর ওকে ডেকেছিল । বিশ ডলার হাতে দিয়ে বলেছিল কাজটা করে আসতে । বলেছিল, কোনও সমস্যা নেই, ঘন পাহাড়ের ওদিকে কোনও এক জায়গায় কাজটা সেরে আসবে । ঠিকমত সারতে পারলে আরও একশ' ডলার পাবে ।

গ্লাস থেকে ঢক ঢক করে ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার মত সহজ কাজ । নগদে একশ' ডলার রোজগার আর ফাউ হিসেবে অমন তরতাজা একটা মেয়ে । অবশ্য মি. হাইগুসের ইঙ্গিত না পেলে জান গেলেও অমন তরতাজা মেয়ের ধারে-কাছেও যেত না সে ।

কিন্তু এমন সহজ কাজটাও করতে পারেনি সে । মাঝখান থেকে কোথাকার কোন্ এক উটকো লোকের হাতে মার খেয়ে

নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে ম্যাডনের।
লোকটাকে আচ্ছামত পেটাতে পারলে...

কিন্তু তার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না রিংস্টোনের
মাস্তান। মারের চোটে হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছে, ওই লোক তার
চেয়ে অনেক বেশি মারপিট জানে। সুতরাং সামনাসামনি
মোকাবেলায় ওর কোনও আশা নেই। তার ওপর আবার পিস্তলও
ঝোলায়।

কিন্তু এখন তার চেয়ে কঠিন আরেকটা কাজ ওর সামনে। মি.
হাইগুসকে গিয়ে বলতে হবে, কাজটা সে পারেনি। কিন্তু কীভাবে
বলবে, সেটাই ঠিক করতে পারছে না।

সামনের অস্পষ্ট ঘর-বাড়িগুলোই জব হাইগুসের র‍্যাঞ্চ হাউস।
অফিস ঘরেই ছিল হাইগুস। জেট ম্যাডন ঢুকতেই তাকাল ওর
দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে এক মিনিট সময়ও লাগল না। হেসে
উঠল র‍্যাঞ্চার। ‘আচ্ছামত বানানি খেয়েছ দেখছি! কার কাজ?
মেয়েটার নাকি?’

এমনিতেই লজ্জায় মারা যাচ্ছিল ম্যাডন। কিন্তু এমন
টিটকিরির জন্যে তৈরি ছিল না। ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ‘মেয়েটার
কাজ মানে? কী বলতে চাইছ? ওকে আমি...’

‘হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছি। ওকে তুমি কিছুই করতে পারনি।
তোমার অবস্থা দেখে বোঝাই যাচ্ছে, এটা মেয়েলি হাতের কাজ
নয়। তা পুরুষটা কে?’

কাটা ঘায়ে এবার নুনের নয়, মরিচের ছিটে পড়ল যেন। কিন্তু
জবাব দিতে পারছে না ম্যাডন। যে লোকটা ওর এই হাল করেছে,
তাকে সে চেনেই না।

‘যে-ই মারুক,’ আবার বলল হাইগুস। ‘দেখা যাচ্ছে, ভালই
মারতে জানে। শহরে গেলে নাপিতের দোকানে ঢুকে দেখে নিয়ো
নিজের চেহারাটা। তবে তোমার সঙ্গে অন্যেরাও দেখে যাবে

তোমার এই হাল। এখন যাও, আমার সামনে থেকে দূর হও।
বিশটা ডলার গচ্ছা গেল আর কী?’ হাত তুলে মাছি তাড়ানোর মত
করে নাড়ল। ‘কই, যাওনি?’

চুপচাপ পেছনে ফিরল ম্যাডন। অপমানে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে
মুখ। পা বাড়াল।

‘শোনো,’ পেছন থেকে ডাকল হাইগুস। ম্যাডন ফিরতে বলল,
‘তোমাকে ফের সুযোগ দেয়া হবে। ভয় নেই, সে সময় বাধা
দেয়ার জন্যে ওই লোক থাকবে না।’

‘ওকে আমি হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেব কার গায়ে হাত
তুলেছে সে। নেহাত পিস্তল ছিল লোকটার কোমরে। নইলে...’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওর ব্যাপারে তোমার আর মাথা না
ঘামালেও চলবে। ওকে আমি দেখব। তুমি শুধু ওকে চিনিয়ে
দেবে আমাকে।’ ড্রয়ার খুলে হাত ঢোকাল। বিশ ডলারের
আরেকটা নোট তুলে বাড়িয়ে ধরল। ‘শেরিফকে বলবে, কাল
সকালে আমি ওর সঙ্গে দেখা করব।’

একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গিয়ে নোটটা নিল ম্যাডন। যাক,
মি. হাইগুস তা হলে এখনও ভরসা হারায়নি ওর ওপর থেকে।
সম্ভবত কাজটা তাকে আবার করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করল মনে
মনে, দ্বিতীয়বার কোনোভাবেই সুযোগটা নষ্ট হতে দেবে না।

বেরিয়ে গেল ম্যাডন। ওর পেছনে তাকিয়ে রইল হাইগুস।
তারপর মুখ বিকৃত করে চোখ নামিয়ে নিল।

সমস্যাটা ভোগাবেই মনে হচ্ছে।

ছয়

রিংস্টোন থেকে পশ্চিমে বিশাল এক সমভূমি। মাঝে মাঝে অবশ্য অনুচ্চ পাহাড়ও রয়েছে। সমভূমিটা আসলে পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীর ক্রমে নিচু হয়ে আসা বিশাল ঢাল। পর্বতের খাড়া গা থেকে নীচের দিকে পাথুরে ভূমি। আরও নীচের দিকে এসে উঁচু-নিচু টিলা-টুকর। বড় বড় গাছগাছড়ায় ছাওয়া এসব টিলার ফাঁক দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে দু'তিনটে ঝরনা। বর্ষাকালে এসব ঝরনার কূল উপচানো পানিতে ভিজে উর্বর হয়ে ওঠা বিস্তীর্ণ সমভূমি ভরে যায় ঘাসে। সে-ঘাস খেয়ে দিনে দিনে বেড়ে ওঠে অস্টিনদের গরুর পাল। কয়েক হাজার একর আয়তনের সমভূমির সব ঘাস খেয়ে শেষ করতে পারে না গরুর পাল। একদিকের ঘাস খেয়ে শেষ না করতেই আরেক দিকের ঘাস বড় হয়ে ওঠে।

সর্বোচ্চ হাজার পাঁচেক গরু পালত বব অস্টিন। বছরে দু'বার গরুর চালান দিত ওমাহায়। যে-টাকা পেত, তাতে নিজের ছোট সংসার এবং র‍্যাঞ্চটাকে চালু রাখার খরচ মিটে যেত। গরুর পাল এর চেয়ে বড় করার চেষ্টা করেনি তাই। যে-জায়গাটুকুর ওপর ক্লেইম ফাইল করেছিল, সেটুকু রক্ষা করতে পারাটাকেই বড় ধরনের সাফল্য ভাবত নির্বিরোধী লোকটা। পেছনের পাহাড়গুলোও ছিল তার ক্লেইমের আওতায়। কখনও মানুষের হাত না পড়ায় নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে উঠছিল বিভিন্ন জাতের

গাছগাছড়া। মানুষের হাত না পড়ার কারণ হলো, পুর্বের জন্যে কাঠের দরকার হলেও তা সংগ্রহ করার জন্যে এতদূর আসার দরকার হত না।

রিংস্টোন শহরটা গড়ে উঠেছিল একটা মাইনিং টাউন হিসেবে। একসময় মানুষ সোনার নেশায় পাগল হয়ে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছিল। কোথাও কোথাও পাওয়াও গিয়েছিল কিছু সোনা। কারও কারও ভাগ্য ফিরে গিয়েছিল। তবে বেশির ভাগের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্রেফ খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছিল। কখনও কখনও ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে মাইন ফেলে পালিয়েছে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে খাবলাখাবলি করে শেষ পর্যন্ত মোহমুক্ত হয়ে পেশা পাল্টে গরুর দিকে ঝুঁকেছে।

বব অস্টিন পশ্চিমে ভাগ্য পাল্টানোর জন্যে এসেছিল ঠিকই, তবে স্বর্ণতৃষা নিয়ে নয়। ওর কাছে মাইনিং-এর কাজটা বরাবরই অনির্ভরযোগ্য আর কঠিন মনে হয়েছে। গরুর মধ্যেই সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল প্রথমে যৌবনে মোষশিকারি হিসেবে পশ্চিমে চলে আসা ভবঘুরে বব। বছর কয়েক মোষশিকারে কিছু টাকা কামিয়ে পুরানো মাইনিং শহর রিংস্টোনের পাশে ক্লেইম ফাইল করে।

একই সঙ্গে ক্লেইম ফাইল করেছিল আরও কয়েকজন। মরতে মরতে বেঁচে রইল মাইনিং টাউন রিংস্টোন। এখন অবশ্য এটা পুরো দস্তুর কাউটাউন। আরও বছর তিনেক পরে এই কাউটাউন থেকে পূর্বদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছে জব হাইগুস।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ জব হাইগুস। আসার পর থেকেই পুরো এলাকাটা এসে গেছে ওর চোখের ভেতর। নিজের র‍্যাঞ্চে কী কী আছে, আর প্রতিবেশীরা আগে এসে কী কী সুবিধে পেয়েছে,

সে-ব্যাপারে একটা নাতিদীর্ঘ ধারণা গড়ে উঠেছে মনে। বার-বি
র্যাঞ্চের পশ্চিমের পাহাড়গুলোয় অফুরন্ত গাছপালা ওর নজর
কেড়েছে। পশ্চিমে রেলপথ বসানো হচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রচুর
কাঠের দরকার হবে। কাঠ জোগান দেয়ার জন্যে দরকার প্রচুর
গাছ। নিজের র্যাঞ্চের কাছে আরেকটা র্যাঞ্চের মালিকানায়
এতগুলো গাছ দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল হাইওসের। পরিকল্পনাটা
তখনই আঁটতে শুরু করে। রেল কোম্পানিকে কম খরচে আর
বেশি লাভে কাঠ সরবরাহ করতে হলে ওই গাছগুলো তার
চাই-ই।

কিন্তু কীভাবে? জায়গাটা সরকারি হলে সমস্যা ছিল না।
সরকারি গাছ কেটে চালান দিতে গেলে আইনি ঝামেলা আছে।
সে-সব ঝামেলা মেটানোর মত কলাকৌশলও জানা আছে ওর।
কিন্তু পরের র্যাঞ্চ থেকে গাছ কাটার কোনও উপায় নেই। একটাই
উপায় জায়গাটা নিজের করে নেয়া। কিন্তু আইনের এমন কোনও
ফাঁকফোকর নেই, যা দিয়ে সেটা করা সম্ভব।

প্রথম থেকেই নানা ফন্দিফিকির শুরু করে সে। বব অস্টিনকে
র্যাঞ্চ বিক্রি করার প্রস্তাব দেবে কি না সেটা নিয়েও অনেক
ভেবেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দেয়নি। সে যে সুযোগটা দেখতে
পেয়েছে, সেটা অস্টিনের পক্ষেও দেখা সম্ভব। অমন সুযোগ
অস্টিন বাদ দেবে কেন? তাই অন্য উপায় দেখেছে জব।
পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে কীভাবে র্যাঞ্চটাই নিজের দখলে
নেয়া যায়। বব অস্টিনের ভালমানুষি আচরণ তাকে সফলতার
ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত করে তুলেছে।

তবে ভাল মানুষ হলেও লোকটা যে নির্বোধ নয়, ওর সঙ্গে
মিশতে গিয়ে সেটা শীঘ্রি টের পেয়েছে হাইওস। বউ আর একমাত্র
ছেলে নিয়ে তার সংসার। ছেলেটা ছোট। তার বড় একটা মেয়ে
আছে। থাকে পুর্বের এক শহরে। পড়াশোনা করছে। মেয়েটা

লেখাপড়া করে ওখানেই থিতু হয়েছে দেখতে চায় বাবা-মা দু'জনই। ছেলে বড় হলে র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করবে।

তার মানে হলো এখানেই স্থায়ীভাবে থাকছে লোকটা। যদি কিছু না হয়ে যায়।

এই যদি কিছু হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকেই শেষ পর্যন্ত একমাত্র উপায় হিসেবে ধরে নিল হাইগুস।

জব হাইগুস কৌশলী মানুষ। একজন সাধারণ র‍্যাঞ্চার হিসেবে প্রচুর গরু পালছে। যতটুকু জায়গায় ক্রেইম ফাইল করেছে, তাতে আরও বেশি গরু পালার সুযোগ আছে। তবে এখনই গরুর পাল বাড়ানোর কথা ভাবছে না। ভাবত হয়তো, যদি না বার-বি'র হাজার হাজার গাছের জঙ্গলটা তার চোখে পড়ত। রেল কোম্পানির কাছে এ গাছগুলো সাপ্লাই দিতে পারলে এক বছরে যে-টাকা হাতে আসবে, গরুর পাল দিয়ে দশ বছরেও তা আসবে না। কিন্তু সমস্যা হলো, বব অস্টিন নামের অতি সাধারণ একটা লোক সে-জায়গাটা আগে থেকে দখল করে বসে আছে। ওকে ওখান থেকে না সরালে কখনও পাওয়া যাবে না ওসব গাছ।

পরিকল্পনাটা আস্তে আস্তে শুরু করেছে জব। এতই আস্তে যে, ও ছাড়া আর কাউকে বুঝতে দেয়নি।

একটা র‍্যাঞ্চ চালানোর মত কাউহ্যাণ্ড ওর ছিলই। তারপরও প্যাট কিলগ্রাম আর রস মাউন্ট নামের বাড়তি দু'জন লোক নেয়া হয়েছে। এদের কাজ হলো, মাঝে মধ্যে গরুর দেখাশোনা করা। বেশির ভাগ সময় র‍্যাঞ্চে শুয়ে-বসেই কাটায় তারা। ফোরম্যান স্যাম হার্ডি কখনও ঘঁ টায় না তাদের। জেনে গেছে বসের নিজস্ব পরিকল্পনা আছে এদের নিয়ে। তবে পরিকল্পনাটা কী, সেটা জানে না। জানার চেষ্টাও করে না। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ।

এই এলাকায় রাসলিং নেই, ইণ্ডিয়ানদের উপদ্রব নেই। এমন আরামের চাকরিতে অহেতুক ঝামেলায় মাথা ঘামানোর দরকার কী?

সাত

আজ সকাল থেকে একটু ব্যস্ত রিংস্টোনের শেরিফ মর্ট ইন্সম্যান। জব হাইগুস শহরে আসছে। খুব বেশি শহরে আসে না বার-এইচ-এর মালিক। আর যখন আসে, তখন নিরেট কোনও পরিকল্পনা থাকে তার। কিন্তু মাত্র গতকালই তো শহর থেকে গেছে লোকটা। হঠাৎ কী এমন কাজ পড়ে গেল যে, তার পরদিনই আবার আসতে হচ্ছে?

জব হাইগুসের মূল পরিকল্পনা কী, সেটা ইন্সম্যানের অজানা নয়। তারই পরামর্শে বব অস্টিনের মেয়ের কাছে বার-বি র‍্যাঞ্চ বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল সে। বব অস্টিন লোকটাকে পছন্দ করত ইন্সম্যান। লোকটার অপঘাতে মৃত্যুটা ওর পছন্দ হয়নি। ওকে কেউ মেরে ফেলতে পারে, এমনটা ওর মাথায় কখনও আসত না। কিন্তু সত্যিই যখন সেটা ঘটে গেল, তখন অবাক হলো বৈকি? ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছিল। একদিন জব হাইগুস শহরে এসে দেখা করে ওর সঙ্গে। তারপর র‍্যাঞ্চ বেচার প্রস্তাব দিয়ে পাঠায় অস্টিনের মেয়ের কাছে।

অস্টিনের মৃত্যু নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি ইন্সম্যান। কারণ

কেবল র‍্যাঞ্চ বিক্রির প্রস্তাবটা জেনের কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের এক বছরের বেতনের সমান টাকা পেয়েছিল। রুটির মাখনঅলা পিঠ চিনতে ভুল হয়নি তার। রিংস্টোনে জব হাইওসের সিন্দুকেই নিজের ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করে ফেলল শেরিফ।

তবে একটা জিনিস তার মাথায় ঢোকেনি। সেটা হলো বব অস্টিনকে সরিয়ে দেয়ার কারণটা। হাইওসের কোনও ক্ষতি করেনি লোকটা। স্রেফ নির্বিরোধী ভাল মানুষ টাইপের লোক ছিল বব। কিন্তু অতিরিক্ত কৌতূহল দেখায়নি সে। কী দরকার?

জব আজ ঠিক কী উদ্দেশ্যে শহরে আসছে বুঝতে পারছে না ও। নিশ্চয় জরুরি কোনও ব্যাপার। কিন্তু সেটা কী হতে পারে? রিংস্টোনে নতুন করে এমন কিছু ঘটেনি, যেজন্যে তাকে একদম শেরিফের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতে হবে।

কাল বিকেলে জেট ম্যাডনের মুখ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করতে চেয়েও পারেনি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে। তবে ম্যাডনের অবস্থা দেখে অবাক হয়েছে। শক্ত বানানি খেয়েছে লোকটা। কিন্তু রিংস্টোনে এমন কে আছে যে ওর এই হাল করে ছাড়বে? জিজ্ঞেস করতে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেছে।

একটু পরে ঘোড়ার খুরের শব্দে বাইরে তাকাল। জব হাইওস এসে গেছে। ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। বেরিয়ে র‍্যাঞ্চমালিককে অভ্যর্থনা জানাল। অন্যান্য বারের মত হাসি হাসি মুখ নয় হাইওসের। শেরিফের শুভেচ্ছার জবাবে মাথা নেড়ে দায় সারল।

ভেতরে ঢুকে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল র‍্যাঞ্চগার।
'ম্যাডনের এ অবস্থা কে করেছে?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। গালের ব্যথায় কথা বলতে পারেনি।' শেরিফ হাসল।

'তার মানে কোনও কাজই করছ না তুমি।' রসিকতার ধারে-

কাছে দিয়েও গেল না হাইগুস। ‘রিংস্টোনে তোমার অগোচরে লোকজন আসছে-যাচ্ছে, আর তুমি অফিসে বসে তারাটি ঘষে ঘষে চকচকে রাখার কাজে ব্যস্ত। ম্যাডনকে আমি একটা কাজ দিয়েছিলাম। কাজটা করতে পারেনি ও। উল্টো মার খেয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে। লোকটা কে, জানতে চাই আমি।’

‘কোন লোকের কথা বল...আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও। কাল একটা লোক এসে কাজ খুঁজছিল। লম্বা, শক্ত-সমর্থ। পিস্তলও ঝুলিয়েছিল।’

‘ফ্রেডের ব্যাংকে তিন হাজার ডলার ডিপোজিটও করেছে,’ গম্ভীর মুখে তথ্য জোগাল জব।

এরপর আরও আধঘণ্টা কথা বলল র‍্যাঙ্গার। তারপর বলল, ‘চলো, গলা ভেজাই।’

অল্প কিছু লোক বসা সেলুনে। মদ খাচ্ছে। শেরিফ, তার পেছনে মি. জব হাইগুসকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে দেখল সবাই। এরা সবাই অলস, বসে বসে গুলতানি মারা লোক। ওদের ওপর থেকে সরে বারের কাছাকাছি বসা লোকটার ওপর চোখ পড়ল হাইগুসের। আটকে গেল যেন লোকটার মুখের ওপর। লোকটাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে না সে, তবে ওর জাতটাকে ভাল করেই চেনে। কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে। এর মানে হলো প্রয়োজনে খুনখারাবিতেও আপত্তি নেই। এ-ই যদি ফ্রেডকে পেটানো সে-লোক হয়, তা হলে ব্যাংকে জমা দেয়া তিন হাজার ডলারের মাজেজা বোঝা গেল। সাধারণ কাউন্সিলের কাজ করে অত টাকা জমানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

বিয়ারভর্তি দুটো গ্লাস এনে দিল বারটেণ্ডার। ছোট করে চুমুক দিয়ে বিড়বিড় করল শেরিফ, ‘এই লোক।’

পলক তুলে এক নজর তাকাল হাইগুস। নিরাসক্ত চোখদুটো নামিয়ে নিল।

‘মিস্টার,’ গলা উঁচাল শেরিফ স্টিভের দিকে চেয়ে।

‘রাসেল । বলো, শেরিফ । শুনছি । নিশ্চয় চাকরির খবর দেবে?’

‘করতে চাইলে চেয়ার টেনে এনে আমাদের সঙ্গে বসে যাও ।
আগে দু’টোক টেনে গলা ভিজিয়ে নাও ।’

উঠে এল সিঁভ । শেরিফ আর জব হাইগুসের টেবিলের সামনে
দাঁড়াল । পাশের টেবিল থেকে একটা চেয়ার টেনে আনল পা
দিয়ে । বসে পড়ল । ওর চোখ র‍্যাঞ্চারের ওপর ।

বারটেগার একটা গ্লাস এনে রাখল ওর সামনে । বোতল থেকে
ধীরে সুস্থে মদ ঢালতে লাগল সিঁভ গ্লাসে । তারপর নিঃশব্দে চুমুক
দিল ।

ওর দিকে চোখ তুলল হাইগুস । ‘হাউডি । জব হাইগুস বলছি ।
কাজ করার ইচ্ছে থাকলে এইচ-বারের পে-রোলে নাম ওঠাতে
পার ।’

নিজের নাম বলল সিঁভ আবার । তারপর বলল, ‘ধন্যবাদ ।
আমি কাজ করি । তবে আগে একটু দেখে-শুনে নিই আর কী?’

‘কোনও কাউবয়ের মুখে এরকম আর শুনিনি ।’

‘সব জানাশোনার মধ্যেই প্রথম বলে একটা ব্যাপার আছে ।
কোনও মানুষই সব কিছু জেনে-শুনে বসে থাকে না,’ উদাস স্বরে
বলল সিঁভ । মদ শেষ করে সিগার বানাতে শুরু করল । ‘যেমন
কাল এখানে এসে একটা নতুন ব্যাপার দেখলাম । একটা র‍্যাঞ্চ
তার ব্যাংকের কাছ থেকে বিপদের সময় ধার চেয়েও পাচ্ছে না ।
অথচ ব্যাংক জানে, সাময়িক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারলে র‍্যাঞ্চটা
তার ধার পরিশোধের ক্ষমতা রাখে । তবে সঙ্কটটা কাটিয়ে উঠতে
তার কিছু টাকা চাই । কিন্তু ব্যাংক তাকে সাহায্য না করে উল্টো
র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছে । এরকম আর কখনও
দেখিনি । তুমি দেখেছ?’

অপলক তাকিয়ে রইল হাইগুস । কোনও জবাব দিচ্ছে না ।

‘দেখো মি. ...কী নাম বললে? রাসেল না? ওটা ওই ব্যাংক

আর ওই লোকের সমস্যা। আমাদের আলাপের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে তোমাকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে...’ শেরিফ কথা শেষ করার আগেই চেয়ার ছাড়ল সিঁড়ি।

‘ড্রিংকের জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমি দেখে-শুনে কাজ করি। যার-তার ডাকে সাড়া দিই না। চলি।’ ঘুরে দাঁড়াল।

‘দাঁড়াও!’ খেপে উঠল শেরিফ। ‘তুমি কোথাকার কে এসেছ যে, একজন আইনের লোককে পর্যন্ত অপমান করছ? জানো, আমি তোমাকে চাইলে গ্রেফতার করতে পারি?’

হাসিমুখে শেরিফের দিকে চাইল সিঁড়ি। ‘না। চাইলেই পারো না। আইনি এবং বেআইনি কোনোভাবেই না। আইনে করতে গেলে উপযুক্ত কারণ লাগবে আর বেআইনে করতে গেলে গায়ের জোর। আপাতত এর কোনোটাই তোমার কাছে নেই। আছে নাকি?’ চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ি।

জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল শেরিফ। তারপর কাঁধ ঝুঁকাল। ‘নেই। তবে শীঘ্রি খুঁজে নেব। যে-তিন হাজার ডলার...’ থেমে গেল।

শেরিফকে থামিয়ে দেয়ার মূলে জব হাইওসের জুকুটি সিঁড়ির চোখ এড়াল না।

আট

পরদিন সকাল বেলা। ডিম, রুটি আর বেকন-তার সঙ্গে পর পর

দু'কাপ কফি খেয়ে ব্রেকফাস্ট সারল সিঁভ রাসেল। এই কয়দিনে বারটেঙার রিপ ওয়াকারের সঙ্গে বেশ খাতির জমে উঠেছে ওর। বিশেষ করে জেট ম্যাডনকে ধোলাই দেয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর রীতিমত ভক্ত বনে গেছে মাঝবয়সী বারটেঙার। গতকাল শেরিফ মর্ট ইন্সম্যান আর জব হাইগুসকে সামলানোর ব্যাপারটাও ওর নজর কেড়েছে। ঠাণ্ডা মাথার লোকটা। বুঝে গেছে ওয়াকার। তবে এইটুকুই শুধু বুঝতে পেরেছে। এছাড়া সিঁভ রাসেলের আচার-আচরণে এমন কিছু দেখতে পায়নি, যা থেকে আরও বেশি কিছু বোঝা যায়।

জেট ম্যাডনের মার খাওয়ার ব্যাপারটা শহরে কেউ জানে না। জেটও গত দু'দিন ধরে দোকানে তার নিয়মিত হাজিরা দেয়া থেকে বিরত রয়েছে। গতকাল একটা কাজে ওর বাসার কাছে গিয়েছিল রিপ। ওখানে দেখা হয়েছিল ম্যাডনের সঙ্গে। কুশল জিজ্ঞেস করতেই গোমড়া মুখে জবাব দিয়েছিল ম্যাডন, 'শরীর ভাল নেই।' বলে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছিল। তবে ক্ষতবিক্ষত ফোলা মুখ দেখে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে বেগ পেতে হয়নি ওয়াকারকে। আগের দিন জেন অস্টিনের পেছনে পেছনে ম্যাডনের শহর ছাড়া এবং তার কিছুক্ষণ পরে নবাগত কাউবয়ের তার পিছু নেয়া থেকে ঘটনা বুঝে নেয়াটা এমন কঠিন বিষয় কিছু নয়।

'দূরে যাচ্ছ মনে হয়?' নাস্তা খেয়ে বেরোতে যাচ্ছে সিঁভ, পেছন থেকে প্রশ্ন করল বারটেঙার।

পাঁই করে বুটের গোড়ালির ওপর ঘুরল সিঁভ। বারটেঙারের মুখে স্বাভাবিক কৌতূহল দেখে মৃদু হাসল। 'হয়তো। হয়তো না।'

'শুভ কামনা।'

'ধন্যবাদ। কেউ শুভ কামনা করছে, জানলে ভাল লাগে।'

ব্যাটউয়িং ডোর খুলে বেরিয়ে পড়ল। সেলুনের পেছনের আস্তাবল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে এল রাস্তায়।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে একটা জলাভূমির কাছে এসে রাশ টানল স্টিভ। জলাভূমির এক পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে আরও সামনে। ডান পাশে অসংখ্য পাহাড়-টিলা। ছোট-বড় গাছে ভরা। কিছুদূর যেতে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একটা ট্রেইল চলে গেছে পশ্চিমে। জলাভূমি থেকে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে নিয়ে সে পথ ধরে সামনে চলল। জানে, আরও ঘণ্টাখানেক সামনে গেলে বার-বি র‍্যাঞ্চার সীমানা শুরু হবে।

এ জায়গাটা চেনে স্টিভ। বছর পাঁচেক আগে এখানে ছিল। বব অস্টিনের র‍্যাঞ্চে মাস ছয়েক কাউবয়ের কাজ করেছে। তারপর একদিন একমাত্র মামার অসুস্থতার খবর পেয়ে পুবে চলে গেছে। এরপর আর এদিকে আসেনি।

ভাল লোক ছিল বব অস্টিন। সৎ, নির্বিরোধী ও পরোপকারী। মাস ছয়েক আগে একটা চিঠি দিয়েছিল তার কাছে। বিপদের আশঙ্কা করেছিল অস্টিন। জানতে চেয়েছিল বার-বি র‍্যাঞ্চে আসতে পারবে কি না।

লোকটার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল ওমাহা সিটিতে। স্টিভ তখন ভবঘুরে। বেকার দিন কাটাচ্ছিল শহরে। সে সময় গরুর চালান নিয়ে গিয়েছিল বব অস্টিন। বেচা-কেনা শেষ করে টাকা-পয়সা নিয়ে ফিরে আসার সময় দেখতে পায় স্টিভকে। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত স্টিভ শহরের একটা পরিত্যক্ত স্টোরে গোঙাচ্ছিল।

পরের কথাগুলো এভাবে মনে পড়ে স্টিভের। বব অস্টিন নিজের লোকদের সাহায্যে ওখান থেকে তুলে ওকে শহরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার দেখে-শুনে ওষুধপত্র দেয়ার পর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে একেবারে নিজের র‍্যাঞ্চেই নিয়ে আসে। স্টিভের বয়স তখন সতেরো।

দুই সপ্তাহ পরে সেরে ওঠে স্টিভ। অস্টিনের বউ জুলিয়া নিজের ছেলের মত সেবা করে ওকে সুস্থ করে তোলে। বব তাকে

বলেছিল, চলে যেতে চাইলে একটা ঘোড়া আর কিছু টাকা-পয়সা দেবে সে। স্টিভ রাজি হয়নি। বলেছে, সে বার-বি র‍্যাঞ্জে থেকে ঘোড়া আর গরু সামলানোর কাজ শিখতে চায়। ওর প্রস্তাবে খুশি হয়েছিল র‍্যাঞ্জার। তখন অস্টিনের ছেলে টম ছোট। বছর চার-পাঁচেক বয়স। আর মেয়ে জেন পূবে থেকে লেখাপড়া করছিল। স্টিভ তাকে কখনও দেখেনি।

নিজেকে অপরাধী মনে হয় স্টিভের। অস্টিনের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে পারলে তাকে হয়তো সাহায্য করা যেত। অকালে মারা পড়ত না অমন ভাল লোকটা।

রিংস্টোনে এসে সরাসরি বার-বি র‍্যাঞ্জে যায়নি স্টিভ। উদ্দেশ্য ছিল, দিন দুয়েক শহরে থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারপর বার-বি র‍্যাঞ্জে যাবে। কিন্তু ওদিনই শহরে আসে অস্টিনের মেয়ে। স্টিভ নিজের টাকাটা ব্যাংকে রাখতে গিয়ে ব্যাংকার আর তার কথাবার্তা শুনে পরিস্থিতি আঁচ করে নেয়। তারপর লম্পটটার হাত থেকে জেনকে উদ্ধারের পর ওর মুখে অস্টিনের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারে। একই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারে, হাজার হুমকির মুখেও জেন র‍্যাঞ্জে ছেড়ে যাবে না—এবং নতুন লোকের প্রয়োজন সত্ত্বেও এ-মুহূর্তে লোক রাখবে না।

একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে স্টিভের কাছে। সে জেনের কাছে স্রেফ একজন অপরিচিত মানুষ। নানামুখী চাপে মেয়েটার এখন মাথা ঠিক নেই। তার ওপর একটা র‍্যাঞ্জে চালানোর ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা ও সাহসের প্রয়োজন, সেটাও ওর নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সবার কাছ থেকে অসহযোগিতা আর শত্রুতার ভাব দেখে দেখে কাউকে বিশ্বাস করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। অল্পবয়সী একটা মেয়ের কাছে একজন গরু-ব্যবসায়ীর পাকা বুদ্ধি আশাও করা যায় না। কিন্তু এটাই হলো ওর জন্যে সবচেয়ে বড় বিপদ। ওর শত্রু আছে, শত্রু চায় ওর র‍্যাঞ্জেটা দখল

করতে । সেভাবেই এগোচ্ছে । নানারকম চাল চালছে । জেনের মত আনাড়ি একজন মেয়ে এক সময় সে চালে ধরা খাবেই । তখনই হামলে পড়বে তারা ।

ওকে র্যাঞ্চছাড়া করতে ওরা যে কতটা মরিয়া হয়ে পড়েছে, সেটা ওদের আক্রমণের ধারা থেকেই আঁচ করতে পারছে স্টিভ । সবচেয়ে বড় আক্রমণটা এসেছে ব্যাংকের কাছ থেকে । ব্যাংক থেকে যৌক্তিকভাবেই আরও ঋণ পাওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও সেটা পাচ্ছে না বার-বি র্যাঞ্চ । এটা আর কিছু নয় । চাপ দিয়ে র্যাঞ্চটা বিক্রি করতে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র । আর ব্যাংককে এটা করানোর উৎসাহ জোগাচ্ছে আড়াল থেকে কেউ একজন ।

তার সঙ্গে জেনকে চরম অপমানিত করার পদক্ষেপও নিয়েছে । জেট ম্যাডনের মত লম্পটকে লেলিয়ে দিয়েছে । ওইদিন স্টিভ সময়মত যেতে না পারলে চরম সর্বনাশ হত মেয়েটার । অবশ্য ব্যাপারটার পেছনে কারও হাত না-ও থাকতে পারে । অভিভাবকহীন কোনও মেয়েকে একা পেলে ম্যাডনের মত নারীলোলুপ লম্পটরা একটা সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করতেও পারে । তবে ম্যাডন রিংস্টোনের সেলুনে মেয়েটার পিছু নেয়ার কথা যেভাবে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছে, তাতে প্রথমটাই সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । কেউ একজন টাকার বিনিময়ে ম্যাডনের লাম্পট্যাকে উসকে দিতে পারে ।

রিংস্টোনের ব্যাংক, শেরিফ, জেট ম্যাডন, র্যাঞ্চের জব হাইওস, জেনের কাছে শোনা অচেনা লোকগুলোর হুমকি সব মিলিয়ে একটা পরিকল্পনা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে স্টিভ । তবে এত কাঠখড় পোড়ানোর পেছনের মূল কারণটা বোঝা যাচ্ছে না । বিশাল কোনও স্বার্থপূরণের পরিকল্পিত ছক । কিন্তু ছকটা কেন, সেটা বুঝতে না পারলে এসবের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র পাওয়া যাবে না ।

নয়

ঘণ্টাখানেক পর। বার-বি র‍্যাঞ্গের সীমানায় পা রেখেছে সিঁভের ঘোড়া। ছোটখাট পাহাড়-টিলা আর তার ফাঁকে ফাঁকে উপত্যকা পেরিয়ে বিশাল এক চারণভূমি। সবুজ ঘাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে বাতাসে। এরকম আরও কয়েকটি ঘেসো প্রান্তর রয়েছে বার-বি'র। খুব কম গরু পালত অস্টিন। ওর গরুর পাল একদিকের ঘাস খেয়ে শেষ না করতেই আরেক দিকের ঘাস বড় হয়ে উঠত। পাঁচ বছর আগে সেরকমটাই দেখে গেছে সিঁভ। পাঁচ বছর পরে এসেও ঠিক সে একই রকম দেখছে। তার মানে ব্যবসা বড় করেনি একাকী র‍্যাঞ্গের বব অস্টিন।

সিঁভ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওখান থেকে ডানদিকে আরও আধঘণ্টা এগোলে বার-বি র‍্যাঞ্গহাউস। পথে আরও কিছু ভাঙাচোরা টিলা-টুকুর আর ছোটখাট সমতল ভূমি। পশ্চিম দিকের পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা আধামরা ক্রিক। এই ক্রিকটাই বাঁচিয়ে রেখেছে পেছনে ফেলে আসা জলাশয়টাকে। রিংস্টোন শহর আর তার চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় পানির অসংখ্য ছোট-বড় উৎস রয়েছে। বিশাল এই এলাকা গবাদিপশু পালনের আদর্শ স্থান। ক্রেইম ফাইল করার জন্যে জায়গা চিনতে ভুল করেনি অস্টিন। তবে এ-ধরনের জায়গার আরও বেশি উন্নতি করার কথা ছিল। রিংস্টোন শহরটারও আরও বড় শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ

করা উচিত ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই সোনার খোঁজে মানুষ হামলে পড়ার কারণে র‍্যাঞ্চ করার কথা কারও মাথায় আসেনি। তবে সোনার মোহ শেষ পর্যন্ত যারা কাটাতে পেরেছে, তারাই এখানে ক্লেইম ফাইল করে গরু পালার কাজ শুরু করেছে।

জেনের কথা ভাবল সিঁভ। বোঝাই যাচ্ছে, বাবা মারা যাওয়ার পর রীতিমত অকূল সাগরে পড়েছে মেয়েটা। ছোটবেলা থেকে পুবে বড় হয়েছে, ওখানে লেখাপড়া করেছে। পশ্চিমের এই রুক্ষ কঠিন জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। বাবা বেঁচে থাকতে সম্পত্তি রক্ষা এবং ব্যবসায়িক ঝামেলা নিয়েও মাথা ঘামাতে হয়নি। বাবার কাছে থাকলে ওর কাজ দেখে দেখে আস্তে আস্তে শিখে নিতে পারত। কিন্তু সে-সুযোগ পায়নি মেয়েটি। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় র‍্যাঞ্চের ভার কাঁধে এসে পড়েছে। আর তার সঙ্গে পেয়েছে কিছু মানুষের শত্রুতা। যে-কোনও কারণে হোক, তারা তাকে চায় না। এখান থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে চালবাজি শুরু করেছে। কিন্তু তাদের চালে পাল্টা চাল দেয়ার মত বুদ্ধি কিংবা অভিজ্ঞতা কোনোটাই নেই মেয়েটার। তবে একটা জিনিস বোধহয় আছে। সেটা হলো দৃঢ়তা আর সাহসিকতা। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে কেবল এ দুটো জিনিস নিয়ে বেশিদিন লড়াই করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। এ অবস্থায় ওর একজন বন্ধু দরকার। বন্ধু এবং অভিভাবক। কিন্তু ওই রকম কাউকে পাওয়াটাই এই মুহূর্তে তার জন্যে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার।

মেয়েটা বলেছে, সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা একটা ভাল দিক। যার বাবাকে অ্যামবুশে মরতে হয় এবং বাবার মৃত্যুর পর পরই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব পেতে হয়, তার মাথায় যদি কাউকেই বিশ্বাস না করার কথা জাগে, তা হলে তাকে বুদ্ধিমতীই ভাবা যায়।

কিন্তু এটাও ঠিক, জেনকে এখন কাউকে না কাউকে বিশ্বাস

করতে হবে। জোর করে হলেও। আর মেয়েটার জন্যে বিশ্বস্ত লোক এ মুহূর্তে স্টিভ নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। বুড়ো বব সম্ভবত এমন কিছু ভেবেই পাঁচ বছর পরে যেভাবে হোক, তার হৃদিস বের করে তাকে আসতে লিখেছিল। স্টিভ দেরি করে ফেললেও ববের ডাকে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু বব এখন আর বেঁচে নেই এবং তার মেয়ে কাউকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল স্টিভ। বার-বি র‍্যাঞ্জে যাবে সে। জেনকে সব কথা খুলে বলতে হবে। জেন তাকে চেনে না। ও যখন বার-বি র‍্যাঞ্জে ছিল, মেয়েটা তখন ছিল পুবে। আর টমের বয়স তখন পাঁচ কি ছয় স্টিভ আশা করছে, ছেলেটা হয়তো চিনতেও পারে তাকে।

অফিস, বান্ধহাউস ও কোরালসহ খান চার-পাঁচেক ঘর নিয়ে বার-বি র‍্যাঞ্জে হাউস। বান্ধহাউসের সামনে ঘোড়া থামাল স্টিভ। বছর বারো-তেরো বয়সের এক কিশোর বেরিয়ে এল থাকার ঘরের দরজা খুলে। একটা খুঁটির সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে সোজা হতেই স্টিভ দেখল ওকে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসিতে মুখ ভারিয়ে তুলে বলল, ‘হাউডি! আমি কি মিস্টার টম অস্টিনের সঙ্গে কথা বলছি?’

ছেলেটি অবাক হয়ে চেয়ে আছে। তারপর মাথা দোলাল আশ্তে করে। ‘হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু তোমাকে ঠিক...’

‘স্বাভাবিক।’ গম্ভীর হলো স্টিভ, তারপর হেসে ফেলল। ‘আমি হলেও পাঁচ বছর পরে কাউকে দেখে ভুট করে চিনতাম না। বিশেষ করে পাঁচ বছর আগে আমার বয়স যদি হত সাত।’

‘তুমি...তুমি স্টিভ, না?’ এবার পরিচিতির হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। ‘আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি আমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখতে সাহায্য করেছিলে। জানো, আমি এখন দারুণ

ঘোড়ায় চড়তে পারি।’

জেন বেরিয়ে এল। চমকে উঠল সিঁভকে দেখে। ‘মিস্টার...’

‘সিঁভ রাসেল। ভুলে যাওনি নিশ্চয়?’

‘না ভুলিনি। কিন্তু তোমাকে আশা করিনি।’

জেনের ভুরু কুঁচকানো।

‘এটা কোনও ব্যাপার না।’ হাসল সিঁভ। ‘মানুষ তো কত কিছুই আশা করে না, তাই না? তারপরও ঘটে যায়। এই যেমন আমি যখন ববের চিঠি পেলাম, তখন আশা করিনি, এখানে এসে তাকে দেখতে পাব না। তার বদলে পুবে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকা তার মেয়েকে র‍্যাঞ্চ সামলানোর ঝামেলায় হিমশিম খেতে দেখব।’

‘চিঠি? বাবার?’ দুই দিকের ভুরু কুঁচকে গিয়ে জোড়া লাগার অবস্থা হলো জেনের। ‘বাবা আমাকে কাউকে চিঠি লেখার কথা কিছু বলেনি কখনও।’

‘হয়তো বলেনি। হয় বলতে ভুলে গেছে, নয়তো দরকার মনে করেনি। কিন্তু তুমি, ম্যাম, অত অবাক হচ্ছ কেন? মানুষ কি মানুষের কাছে চিঠি লেখে না? মানুষ মানুষের সাহায্য চায় না?’

‘কিন্তু তুমি তো আমাদের কেউ নও। বাবা তোমাকে চিঠি লিখবে কেন?’ একগুঁয়ে সুরে বলল জেন। ‘বাবা তোমাকে কী করে চিনত?’

‘চিনত,’ এবার আলোচনায় অংশ নিল টম। ‘সিঁভ আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করেছিল। আমি তখন ছোট। তবে মনে আছে। সিঁভকে বাবা কোথেকে নিয়ে এসেছিল। খুব অসুস্থ ছিল ও। মা তাকে খুব যত্ন করেছিল। তাই না, সিঁভ? মা তোমাকে খুব ভালবাসত। আমার মনে আছে।’

‘হ্যাঁ। তোমার ঠিক মনে আছে,’ সায় দিল সিঁভ। ‘মা আমাকে অনেক আদর করত। অসুখ থেকে সারিয়ে তুলেছিল। কোনোদিন ডাকিনি। তবে তোমার সঙ্গে আমারও খুব ইচ্ছে হত

মা ডাকি।' হাসল সিঁভ। মায়ের কথা বলতে মেয়েটির মুখে কোমল ছায়া লক্ষ করল।

'কিন্তু বাবার চিঠি পেয়েও তুমি সময়মত আসোনি,' ফ্লোভের আভাস প্রকাশ পেল জেনের গলায়। 'অথচ সেটাই তোমার উচিত ছিল, মিস্টার সিঁভ রাসেল।'

'এর কারণ হলো, আমি চিঠিটা পেয়েছি পাঠানোর অনেক পরে। তোমার বাবা জানত না সে সময় আমি ঠিক কোথায় আছি। তবে এখানে থাকার সময় ক্যালিফোর্নিয়ার একটি শহরের কথা বলেছিলাম। সেখানকার দু'একজন লোকের গল্পও করেছিলাম। বব আমার উদ্দেশে সে-শহরেই একজনের ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল। আশা করেছিল চিঠিটা আমি পাব হয়তো।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'পেয়েছিলামও। তবে আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজ ছিল, তাই সময়মত আসতে পারিনি। তা ছাড়া ববও লেখেনি যে, সে এতটা খারাপ অবস্থায় ছিল।'

চুপ করে রইল জেন।

'আচ্ছা, আমাদের তো লোক লাগবে। তুমি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আপত্তি করবে না?' আচমকা বলে উঠল টম।

হাসিমুখে ছেলেটার দিকে চাইল সিঁভ। 'অবশ্যই না। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে। বব আমাকে বিপদের সময় সাহায্য করেছিল। আমারও উচিত তার প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করা।' জেনের দিকে চাইল। 'তুমি নিশ্চয় আমাকে সে সুযোগ দেবে, তাই না?'

জবাব দিচ্ছে না জেন। চিন্তা করছে। ওর লোক দরকার। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বাবার মৃত্যুর পর থেকে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে কাউকে বিশ্বাস করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই লোকের ব্যাপারটা আলাদা। জেনের চরম বিপদের সময় এই লোক উদ্ধারকর্তা হয়ে এসেছিল। জেট

ম্যাডনকে সেদিন এভাবে শায়েস্তা না করলে...ব্যাপারটা ভাবতে ঘৃণায় গা রি রি করে উঠছে ওর।

‘প্রতিদান দেয়ার ইচ্ছে থাকলে তুমি প্রথমেই আমাদের র‍্যাঞ্জে চলে আসতে,’ গোমড়া মুখে বলল জেন। ‘তুমি শহরে উঠেছিলে।’

‘হুম। ভেবেছিলাম, দু’একদিন শহরে থেকে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করব। তারপর শহরে তোমাকে দেখে সে ইচ্ছেটা আরও বাড়ল। এরপর ব্যাংকে তোমার ঋণ নিয়ে ঝামেলা দেখে পুরো ঘটনা বাইরে থেকে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।’

যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে, এভাবে কথাগুলো বলে গেল স্টিভ।

‘তারপর তো ওই ঘটনাটা ঘটল। ম্যাডনকে পিটিয়ে তোমাকে র‍্যাঞ্জের দিকে পাঠিয়ে দিলাম। তোমার লোক লাগবে, ভেবেছিলাম আমাকে হয়তো কাজ করার প্রস্তাব দেবে। কিন্তু তুমি তা দিলে না।’ থামল স্টিভ। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে।

তাকিয়ে আছে জেন নিজেও। ‘তো এখন তোমার মত পাল্টাল কীসে? জানতে পারি?’

‘পার। আমি ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার সময় তুমি ছাড়া বাইরের আর কেউ ছিল না। ছিল কি?’

‘বলে যাও।’ কৌতূহলের আভাস ফুটল জেনের চোখে।

‘কিন্তু সেটা জেনে বসে আছে জব হাইওস। জেনে গেছে শেরিফ নিজেও। কিন্তু কীভাবে?’

পকেট থেকে তামাকের সরঞ্জাম বের করে সিগার বানাতে লাগল স্টিভ। মেয়েটাকে চিন্তার সুযোগ দিচ্ছে। ‘ব্যাংকে তোমার কত টাকা ঋণ, তুমি কি চাইবে ব্যাংক ছাড়া বাইরের লোকেরা জানুক? আর তুমি না চাইলে ব্যাংক কখনও সেটা বাইরের লোককে জানাবে না। এটাই নিয়ম।’

‘তার মানে...তার মানে তুমি বলতে চাইছ...’

‘হ্যাঁ। ব্যাংক নিজেই কথাটা ছড়িয়েছে। আর ব্যাংক ছড়িয়েছে বলেই জব হাইগুস এটা জেনেছে। ব্যাংক জব হাইগুসের হয়ে তোমাকেও তোমার র‍্যাঞ্চ বিক্রি করার জন্যে চাপ দিচ্ছে পরোক্ষভাবে। এখন আমি যদি এভাবে চিন্তা করি, জব হাইগুস তোমার কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেয়ার জন্যে শেরিফ ইন্সম্যানকে পাঠিয়েছে, তা কি অতিকল্পনা হয়ে যাবে?’

‘হুম।’

‘এভাবে তুমি যোগসূত্র খুঁজতে পার ম্যাডনের কুকর্মের চেষ্টা এবং তোমার র‍্যাঞ্চে কাজ খুঁজতে এসে পাত্তা না পাওয়া দুই কাউবয়ের হুমকি দিয়ে যাওয়ার মধ্যেও। এভাবে হয়তো দেখতে পাবে দড়ির শেষ প্রান্ত হাতে নিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে, যে তোমার বাবাকে অ্যামবুশে খুন করিয়েছে।’

‘ওফ!’ গুণ্ডিয়ে উঠল জেন। ‘আমি...আমি...’

‘তবে এসবই অনুমান। কোনও প্রমাণ নেই। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না কারও বিরুদ্ধে। কিন্তু এভাবে ছাড়া আর কীভাবে চিন্তা করলে তুমি এমন একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবে?’

দশ

মালিক যতই আনাড়ি হোক, আপাতত তার হুকুমমত রাউণ্ডআপ ছাড়া করার মত আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না বার-বি ফোরম্যান ডক ভোনাল্ড। র‍্যাঞ্চে লোন আছে ব্যাংকের কাছে।

লোন পরিশোধের জন্যে চাপাচাপি শুরু হয়েছে। ব্যাংক হঠাৎ এমন মরিয়া হয়ে উঠল কেন বুঝতে পারছে না ডক। আগামী চালানে গরু বেচার টাকায় এই লোন এমনিতে শোধ করে দিতে পারবে বার-বি। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়। ব্যাংক অসময়ে চাপ দিচ্ছে। ফ্রেড রবিনসন হয়তো ভাবছে, বব অস্টিন মারা যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে পারবে না বার-বি। তার আনাড়ি মেয়ের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না।

কিন্তু এ মুহূর্তে গরু চালান দেয়া ছাড়া ধার পরিশোধের আর কোনও উপায় নেই বার-বি'র। আর নয়তো র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করে দিতে হবে। অবাক ব্যাপার হলো, সামনে টাকাটা উসুল করে নেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক যেন তা-ই চাইছে।

র‍্যাঞ্চের ওপর কিছু কিছু মানুষের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে, এটা সে-ও বুঝতে পেরেছে। ব্যাপারটাকে অবশ্য অস্বাভাবিক ভাবছে না ডক। র‍্যাঞ্চিং আসলে পুরুষের কাজ। এ পর্যন্ত এমন কোনও র‍্যাঞ্চের নাম শোনেনি সে, যার মালিক বা পরিচালক একজন মহিলা।

জেন অস্টিন একে মহিলা, তায় সুন্দরী যুবতী। লেখাপড়াও জানে। যে-কোনও পুরুষেরই চোখ পড়ার কথা ওর ওপর। আর কেউ যদি একটা র‍্যাঞ্চ আর তার সুন্দরী বসকে নিজের করে পেতে চায়, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

খুব আক্ষেপ হচ্ছে ফোরম্যান ডক ডোনাল্ডের। ওর কাছে যদি টাকা থাকত, তা হলে সে নিজেই শোধ করে দিত ব্যাংকের ঋণটা। কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে ফেলত সুন্দরী মালিককে। ও যুবক, দেখতে সুদর্শন। তবে টাকা নেই। মাসে তিরিশ ডলারের এই চাকরিটাই কেবল তার সম্বল। অবশ্য আশাবাদী লোক সে। জানে, চেষ্টা করলে আশা বিফল হয় না সাধারণত।

ওমাহায় গরু চালান দেয়ার ব্যাপারটাকে একটা ভাল সিদ্ধান্ত

হিসেবে নিয়েছে সে। গরু চালানের জন্যে সময়টা সঠিক না হলেও অন্য কোনও উপায় না থাকায় কাজটা করতেই হচ্ছে। অসময়ে ট্রেল ড্রাইভে নানা ধরনের ঝুঁকি থাকে। তবে হেমন্তের শেষ দিকে ট্রেল ড্রাইভে বেরোলে সে-ঝুঁকি সামলে নেয়াটা অসম্ভব নয়। কিছু দক্ষ লোক আছে বার-বি'তে। দক্ষ এবং অনুগত। ডক ডোনাণ্ডের অনুগত। ঠিকমত বেতন দিতে কষ্ট হচ্ছে বার-বি'র। তবু লোকগুলো লেগে আছে। জেন নিজে এদের সামলাতে পারত না। কিন্তু ডোনাণ্ড তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সামলে রেখেছে। ওর ধারণা, জেন অস্টিনকে ওর ওপর নির্ভর করতে পারার মত ভালই কাজ দেখাচ্ছে সে। তরুণী মালিকের মনে যদি এই নির্ভরতা জাগিয়ে তোলা যায়, তা হলে তার মন জয় করা অসম্ভব নয়।

আসলে সব কিছু পরিকল্পনা। তাই পরিকল্পনা করে কাজ করে যাচ্ছে সে।

এ পর্যন্ত হাজার দুয়েক গরু জড়ো করা হয়েছে। পশ্চিমের পাহাড়ের লাগোয়া ঘেসো প্রান্তরের তরতাজা ঘাসে চরছে। আরও হাজার খানেক গরু জড়ো করে ড্রাইভে বেরোবে, এমনই পরিকল্পনা করেছে সে। কিন্তু সমস্যা হলো, লোক লাগবে আরও। বাড়তি আরও দু'জন লোক থাকলে রাউণ্ডআপের কাজটা শেষ হয়ে আসত প্রায়। কিন্তু যা বোঝা যাচ্ছে, টাকার জোগাড় এখনও হয়ে ওঠেনি।

এ ব্যাপারটা একদম ভাল লাগছে না ডকের। ব্যাংক এমন উঠে পড়ে লাগল কেন ঋণ আদায়ের জন্যে? বার-বি. র‍্যাঞ্চ রাতারাতি উঠে চলে যাচ্ছে নাকি কোথাও? আবার কিছু লোক চাইছে র‍্যাঞ্চটা যাতে বিক্রি করে ফেলা হয়। প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করছে ডক। যার র‍্যাঞ্চ সে দেখবে বিক্রি করবে না কী করবে। বাইরের মানুষ এসে এভাবে চাপাচাপি করার দরকারটা কী?

ডক ডোনাণ্ড কাজের মানুষ। কাজই তার একমাত্র পছন্দের।

মনের মত পরিবেশ পেলে কাজ করাটা তার কাছে অনেকটা বিনোদনেরই মত। বার-বি'তে কাজ শুরু করার পর থেকে একে ভালই উপভোগ করছিল। বুড়ো বব ছিল মাটির মানুষ। তার বউকে দেখেনি। তবে মেয়েটা শিক্ষিত ও সুন্দরী। পুরো পরিবারটাকে পছন্দ করে ফেলে সে। একটা স্বপ্নের রূপরেখা ফুটে উঠতে শুরু করে মনের চোখে। আর বব অস্টিন মারা যাওয়ার পর এখন সেটা ডালপালা মেলে আরও বড় আর ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। এখন তার মাঝে মাঝে মনে হয়, জেন অস্টিনও যেন তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে।

হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে ডক। ছড়ানো-ছিটানো গরুগুলো আগে এক জায়গায় জড়ো করে সেখান থেকে তরতাজাগুলো বেছে নিয়ে একপাশ করা, বাকিগুলোকে আরেক দিকে সরিয়ে দেয়া, মার্কাবিহীনগুলোকে মার্কা দেয়াসহ হাজার রকমের কাজ রাউণ্ডআপে। পনেরো দিনের মধ্যে তিন হাজার গরুর একটা পালকে ট্রেইল ড্রাইভের জন্যে তৈরি করা এত কম লোক দিয়ে সম্ভব নয়। তবু হাল ছাড়ছে না ডক। গাধার খাটুনি নিজেও খাটছে, অন্যদের দিয়েও খাটিয়ে নিচ্ছে। এই কাজটায় তাকে সফল হতেই হবে। র‍্যাঞ্চটাকে বাঁচাতে হবে ব্যাংকের কজা থেকে। তারপর এটার আরও উন্নতি করতে হবে। তরুণী মালিকের সঙ্গে কথা বলে গরুর সংখ্যাও বাড়াতে হবে। বিশাল র‍্যাঞ্চার তুলনায় হাজার পাঁচেক গরু তেমন কিছুই না। কম পক্ষে দ্বিগুণ গরু পালা যাবে এখানে।

কাজের মানুষগুলো পুরানো। র‍্যাঞ্চার সমস্যা বুঝতে পারছে। ডক ওদের বলেছে, চালানটা ঠিকঠাকমত ওমাহায় পৌঁছাতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সবার হাতে নগদ টাকা এসে যাবে।

আসলে একটা স্বপ্ন দেখছে ডক। আর সে স্বপ্নে বার-বি

র‍্যাঞ্জে‍র মালিক জেন অস্টিনেরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এখন শুধু সে স্বপ্নটা নিয়ে পরিকল্পনা মারফিক এগিয়ে যেতে পারলেই হয়।

ডকের ধারণা, সে তা পারবে। সেজন্যে কেবল জেনের চোখে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে। ডক সেভাবেই এগোচ্ছে।

এগারো

মেজাজ খারাপ ডক ডোনাভের। বার-বি র‍্যাঞ্জে‍র জন্যে নতুন কাজের লোক রাখা হয়েছে, তার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি। অথচ উচিত ছিল সেটাই। ফোরম্যানরা র‍্যাঞ্জে‍র দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। কাজের লোক তার অধীনে কাজ করবে। সুতরাং ফোরম্যান নিজেই দেখে-শুনে লোক নেবে, এটাই নিয়ম। তা ছাড়া জেন অস্টিন যেখানে র‍্যাঞ্চিং-এর ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝেই না, সেখানে তাকে না জানিয়ে কেন লোক রাখতে যাবে?

দিনের কাজ শেষ করে র‍্যাঞ্জে পৌঁছতে খবরটা তাকে দিয়েছিল টম। শুনে প্রথমে মুখ কালো হয়ে উঠল ডকের। অবাক হয়ে বলে উঠল, ‘আমাকে না জানিয়ে লোক রাখা হলো?’

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হলো টমও। ‘কেন, তোমাকে না জানিয়ে লোক রাখা যাবে না? এই ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না, ডক?’

‘তোমাকে বুঝতে হবে না,’ রুক্ষ স্বরে বলল ফোরম্যান।

‘আমি জেনের সঙ্গে কথা বলব।’

‘যাও!’ টম ভেঙুচি কাটল। ফোরম্যানকে একবিন্দুও পছন্দ করে না সে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ওর আচরণ অনেক পাল্টে গেছে। ব্যাপারটা ওর চোখ এড়ায়নি। বোনকেও জানিয়েছে সেটা। তবে পাত্তা দেয়নি জেন। ‘অফিসেই তো আছে।’

‘তাই যাচ্ছি।’ পাল্টা ভেঙুচি কাটল ডক নিজেও। মুচকি হেসে সরে গেল টম। ডকের আচরণে অবাক হয়েছে সে। লোক রাখার সংবাদে ডকের এভাবে খেপে ওঠার কারণ কী? কর্মচারী নিয়োগ করার আগে ফোরম্যানের অনুমতি নিতে হবে নাকি! বাহ!

অফিসেই ছিল জেন। ডক ডোনাল্ড এসে ঢুকল।

‘হাউডি, ডক,’ ফোরম্যানকে অভ্যর্থনা জানাল জেন। ‘রাউণ্ডআপ কেমন চলছে?’

‘ভাল,’ গোমড়ামুখে জানাল ডক। ‘শুনলাম, নতুন লোক রেখেছ?’

‘হুম। কেন, তুমি খুশি হওনি? আমাদের তো লোক লাগবে।’

একটা চেয়ার টেনে বসল ফোরম্যান। ‘লোক লাগবে না তা তো বলছি না। কিন্তু আমি একদমই কিছু জানলাম না। কোথাকার লোক, কেমন লোক—ফোরম্যান হিসেবে এসব আমার জানার দরকার আছে, ম্যাম। তুমি বুঝতে পারছ না, কারণ তোমার এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই।’

‘এর আগেও তুমি দেখেছ, মানুষ কাজ করার জন্যে এসেছে। কিন্তু ওদের ভাবগতিক ভাল লাগেনি বলে ওদের বিদেয় করে দিয়েছ। কাজটা ভাল করেছ বলে আমি কিছু বলিনি। কারণ আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কোনোরকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। কী বলো?’

‘হুম।’ ওপর-নীচ মাথা দোলাল জেন। ‘সেটা যেমন না বুঝে করিনি, ধরে নাও না, এটাও সেরকম বুঝেগুনেই করেছি। তোমার

ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।’ ফোরম্যানকে একটা মধুর হাসি উপহার দিল জেন। ‘না, ডক। তোমার দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।’

ধক করে উঠল ফোরম্যানের বুকের ভেতর। ‘মানে? আমি র‍্যাঞ্গের ফোরম্যান। লোকজন নিয়ে আমাকেই কাজ করতে হবে। আর তুমি বলছ, আমাকে চিন্তা করতে হবে না?’

‘তুমি তোমার কাজগুলো কীভাবে সারবে, সেসব নিয়ে চিন্তা করো।’

‘আগে কখনও এভাবে কথা বলোনি তুমি আমার সঙ্গে,’ অভিযোগের সুরে বলল ফোরম্যান।

‘মানে? বুঝলাম না।’

‘গতকালও তুমি আমাকে বলোনি লোক রাখতে যাচ্ছ।’

‘কী হলো, ডক? তুমি হঠাৎ এভাবে কথা বলছ কেন? তুমি কি ভেবেছ, র‍্যাঞ্গের যে-কোনও কাজই করতে হলে আগে তোমার সঙ্গে আলাপ করে নিতে হবে? কেন?’

চুপ করে রইল ফোরম্যান। রেগে গেছে।

‘বেশ। উঠেছেই যখন কথাটা, তখন একটা কথা স্পষ্ট করে জেনে নাও, আমি আমার বিবেচনায় কাজ করব। কর্মচারীদের কাছে পরামর্শ চাইব, অনুমোদন নয়। আমি র‍্যাঞ্গের বিষয়ে আনাড়ি হতে পারি, কিন্তু এতটা আনাড়িও নই, একজন বেতনভুক কর্মচারী কখন বেয়াদবি করে সেটা বুঝতে পারব না। তুমি যাও এখন। আরেকটা কথা জেনে নাও, আমি কাউকে কাজে নিইনি। মি. রাসেল এসেছে আমাদের সহায়তা করার জন্যে। তাকে যেন কাজের লোক ভাবতে যেয়ো না। রাতে খাওয়ার টেবিলে আলাপ করে নেবে তোমাদের সঙ্গে।’

‘তার মানে তুমি আমাকে স্রেফ কর্মচারীই ভাবছ, আর কিছু না?’ আচমকা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ডকের। বলেই বুঝতে পারল

ভুল করেছে সে।

‘তো? আর কী ভাবব?’

‘না মানে, আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী তো,’ পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করল ডক। ‘মানে...তোমার বাবা বলত, “কর্মচারীরা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রাণ।” তুমিও নিশ্চয় সেরকমই ভাবো। ভাবো না?’

‘ভাবি। অবশ্যই ভাবি।’ মুচকি হাসল জেন। ‘আমি আমার সব কর্মচারীকেই আমার র‍্যাঞ্জের প্রাণ ভেবে থাকি। কিন্তু র‍্যাঞ্জের কাজকর্ম কীভাবে চলবে, সেটার সিদ্ধান্ত তো একজনকেই নিতে হবে। মালিক হিসেবে ওটা আমারই নেয়ার কথা।’ কাঁধ ঝাঁকাল জেন। ‘তোমার কথা শেষ হয়ে থাকলে...’ চেয়ার ছাড়ল।

প্রচণ্ড রাগে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ডকের। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল। কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলাল অতি কষ্টে। পরক্ষণে হেসে উঠল অস্পষ্ট স্বরে। ‘না, না, ঠিক আছে ম্যাম, অবশ্যই।’

বেরিয়ে গেল ফোরম্যান। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল জেন। অবাক হয়েছে। লোকটার এমন প্রতিক্রিয়ার মানে বুঝতে পারছে না।

রাতের খাবারটা জেন সব সময় কর্মচারীদের সঙ্গেই খায়। ওখানে সারা দিনের কাজকর্ম নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হয়। বাবুর্চির ডাক পড়তে সবাই রান্নাঘরের বড় টেবিলটায় গিয়ে বসল। কম পক্ষে বিশজন লোক একত্রে বসে খেতে পারার মত বিশাল টেবিল। তবে অর্ধেক চেয়ারই খালি পড়ে থাকে। অত লোক রাখার দরকার হয় না।

টমের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকল স্টিভ। তাকাল সবার দিকে। এক-এক করে সবার মুখের ওপর ঘুরে এল ওর চোখ। তারাও দেখছে তাকে। তিনজনের চোখে পরিচয়ের আভাস দেখে ভাল

লাগল। মুচকি হাসল ওদের দিকে তাকিয়ে, নাম ধরে ডাকল ওদের, ‘জেরি...লুম...জ্যাব! চিনতে পার? পাঁচ বছর কম সময় নয়, কী বলো?’

তিনজনের মধ্যে সবার আগে সাড়া দিল লুম। একগাল হেসে বলল, ‘সিঁভ, বসে পড়ো। আগের চেয়ে অনেক সুন্দর আর মোটাসোটা হয়েছ দেখছি।’

চেয়ার টেনে বসল সিঁভ। তিনজনের মধ্যে জেরি সবার বড়। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। ওর দিকে চেয়ে হাসল। ‘জেরি, তুমি আগের চেয়ে শক্তপোক্ত হয়েছ।’

বাকিরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। কয়েকজনের চোখে বন্ধুত্বসূলভ ভাব দেখল সিঁভ। বাকিরা নির্বিকার আর ফোরম্যান ডক ডোনাল্ডের মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

জেন ঢুকে নিজের চেয়ারে বসা মাত্র বাবুর্চি পরিবেশন শুরু করল। যে যার প্লেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

খেতে খেতে র‍্যাঞ্ঝের সঙ্কট নিয়ে আলাপ করল। জেন বলল, ‘আমরা একটা সঙ্কট কাটাবার চেষ্টা করছি। তোমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে জানি। কারও কারও বেতনও বাকি পড়ে গেছে। তবু তোমরা র‍্যাঞ্ঝের স্বার্থে নিজেদের কষ্টকে বড় করে দেখছ না।’

চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে সবাই। এক টুকরো মাংস মুখে পুরল জেন। তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে চিবোতে বলল, ‘চমৎকার। গিনি, যতই বয়স বাড়ছে, তোমার হাত খুলছে।’

মনিবের প্রশংসার জবাবে কৃতার্থের হাসি হাসল রাঁধুনি।

‘আর তিনদিনের মধ্যে আমাদের রাউণ্ডআপ শেষ হয়ে যাবে,’ বলে উঠল ফোরম্যান। পলক তুলল সিঁভের দিকে। চোখে চোখ পড়তেই চট করে মাথা নিচু করে নিজের পাতের দিকে তাকাল। ‘ট্রেইল ড্রাইভের জন্যে আরও লোক দরকার। কী করবে ভেবেছ?’ মনিবের দিকে মুখ তুলল।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জেন। ওর মুখে চিন্তার ছায়া চোখ এড়াল না স্টিভের।

‘নতুন লোক নেয়া বোধহয় সম্ভব হবে না। মি. রাসেলসহ এখন আমাদের লোক হয়েছে দশজন। চারজন লোক র‍্যাঞ্চে থাকবে, বাকি ছয়জন যাবে ড্রাইভে...’

‘সম্ভব নয়।’ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ফোরম্যান। ‘ছয়জন কাউন্সিলের পক্ষে অতদূরের পথে তিন হাজার গরু নিয়ে যাওয়া অনেক বড় ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে। কম পক্ষে আরও দু’জন লোক লাগবে। এর চেয়ে বেশি হলে আরও ভাল হয়।’

‘বিশ্বস্ত লোক পাওয়াটা সহজ হবে না, ডক। তুমি নিশ্চয় জান, আমাদের সমস্যাটা কোথায়। কী করে বুঝব, যাকে কাজে নিচ্ছি, তাকে কেউ পাঠায়নি? আমাদের এখান থেকে তুলে দেয়ার পায়তারা চলছে। তোমরা আমার বিশ্বস্ত লোক বলে তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠার সাহস পাচ্ছে না। নইলে...’

খুশি হলো ডক। মালিক এই বিশ্বাস সব সময় রাখলেই ভাল। র‍্যাঞ্চেটাকে ধীরে ধীরে নিজের ইচ্ছেমত চালাতে শুরু করবে ও। তবে সেটা করতে হবে খুব ধীরে সুস্থে। আপাতত কাজ হলো, গরু চালান দিয়ে ব্যাংকের টাকা শোধ করে দেয়াটাই। ওই ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর ফোরম্যানের নির্দেশেই র‍্যাঞ্চে চলবে। ডকের দৃঢ় বিশ্বাস, র‍্যাঞ্চেটা ভালই চালাতে পারবে। র‍্যাঞ্চেটাকে নিজের ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখছে সে। এই ভবিষ্যৎটা নষ্ট করতে চায় না। জেন অস্টিনকে বিয়ে করে এখানে থিতু হওয়ার ইচ্ছেটা পূরণ করতে হলে একটু-একটু করে এগোতে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

‘বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যাবে, ম্যাম।’ বড় এক টুকরো মাংস চামচে গেঁথে নিল ফোরম্যান। ‘ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি...’

‘কিন্তু আমার পরামর্শ চাইলে আমি গরু চালানটা আপাতত স্থগিত করে দেয়ার কথা বলব,’ আচমকা বলে উঠল সিঁভ।

বারো

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই কথাটা কানে অত্যন্ত জোরালো ভাবে আঘাত করল ডকের। চামচে গাঁথা মাংসটা হাঁ করে মুখে ঢোকাতে যাচ্ছিল। থেমে গেল সে অবস্থায়। এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। তারপর বিদ্রূপের হাসি হাসল। ‘মিস্টার, তুমি মাত্র আজই এসেছ। র‍্যাঞ্চার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কতটুকু জানো জানি না। তবে কথাটা নেহাত আনাড়ির মতই বললে। গরু চালান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বুড়ো ববের সময়ে। সে মারা না গেলে অনেক আগেই চালান চলে যেত।’ সম্মতির আশায় মালিকের দিকে তাকাল। ‘তাই না, ম্যাম?’

জেনের চোখ সিঁভের ওপর। দেখে মনে হচ্ছে, সিঁভ আসলে কী বলতে চাইছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে।

ফোরম্যানকে পাত্তা দেয়ার দরকার মনে করছে না সিঁভ। ট্রেইল ড্রাইভ স্থগিত রাখার ব্যাপারটা এতটা সহজবোধ্য এবং যুক্তিযুক্ত যে, কেউ না বোঝার কোনও কারণ নেই। সিঁভের মনে হলো ফোরম্যান হয়তো কারণটা বুঝতে পারছে না, কিংবা বুঝতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ খাওয়ায় ব্যস্ত রইল সে। মিনিটখানেক পরে

মুখ তুলল। ‘তুমি নিশ্চয় অবাক হচ্ছে না, ম্যাম। একটু মাথা খেলালেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ব্যাংক তোমাকে সহযোগিতা করেছে না সম্পূর্ণই অযৌক্তিকভাবে। নতুন করে ঋণ না দিক, পুরনো ঋণ শোধ করতে সময় দিতে সে বাধ্য। দ্বিতীয়ত সে তোমাকে র‍্যাঞ্চ বেচার জন্যে চাপ কিংবা পরামর্শ কোনোটাই দিতে পারে না। এখানে সে পরামর্শ বা চাপ তো দিচ্ছে, এমনকী ক্রেতা পর্যন্ত ঠিক করে দিচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? কেন বার-বি র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে ব্যাংকের এই অস্বাভাবিক আগ্রহ?’

চুপচাপ খাচ্ছে জেন। স্টিভের কথাগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছে মনে মনে।

‘সুতরাং এটা সহজে বলে দেয়া যায়, এতে ব্যাংকের কোনও মতলব আছে এবং সে-মতলব হলো বার-বি’র ক্ষতি করা। আমার ধারণা, ঋণ পরিশোধের জন্যে চাপাচাপিটা ব্যাংক নিজের উৎসাহে করেছে না। এর পেছনে আছে এখানকার কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি, যে ব্যাংককে বড় কোনও দাঁও মারার প্রলোভন দেখিয়েছে।’

‘দেখো, মিস্টার, তুমি যা বলছ, এসবই তোমার অনুমান,’ আপত্তি জানাল ডক।

‘তাই? কীভাবে বুঝলে?’ সরাসরি ফোরম্যানের দিকে তাকাল স্টিভ। ‘এ ব্যাপারে তা হলে তোমার ব্যাখ্যাটা শুনি?’

‘আমার কোনও ব্যাখ্যা নেই। ব্যাংক তাদের টাকা চাইতেই পারে। জানা থাকলে খদ্দেরের খোঁজও দিতে পারে।’ জেনের দিকে চাইল। ‘তুমি কী বলো, ম্যাম? পারে না?’

পলক তুলে ফোরম্যানের দিকে চাইল জেন। চোখ নামিয়ে ফের খাওয়ায় মন দিল।

‘কিন্তু বব অস্টিনের অ্যামবুশে মারা যাওয়া এবং তারপর

থেকে রিংস্টোনের শেরিফ, ব্যাংকার এবং কাজ খুঁজতে আসা বিভিন্ন মানুষের র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ কিংবা হুমকি দেয়া-এসব ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে, মিস্টার ডক ডোনাল্ড?' পরক্ষণেই লোকটাকে মনে মনে বাতিল করে দিয়ে জেনের দিকে চাইল। 'আমার কাছে এসবের কোনোটাকেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না, ম্যাম। তুমি যদি এসব কিছুকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত ট্রেইল ড্রাইভে যাও, একটা গরুও ওমাহায় যাবে না, পথেই লুট হয়ে যাবে।'

লোকটার ভাবগতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না ফোরম্যানের। ট্রেইল ড্রাইভে গেলে পথে কোনও সমস্যা হবে বলে মনে করে না সে। গরু বেচার নগদ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরবে ওরা। নগদ টাকা সঙ্গে করে বয়ে আনারও দরকার হবে না। টাকাটা ওমাহার ব্যাংকে জমা করে-দিলেও রিংস্টোনের ব্যাংক মারফত বার-বি র‍্যাঞ্চার নামে জমা হয়ে যাবে। আগেও এভাবে টাকা স্থানান্তর করেছে বব অস্টিন। ডকের আশঙ্কা হচ্ছে, গরু চালানে বাগড়া দেয়ার পেছনে নতুন লোকটার খারাপ কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে।

কিন্তু জেনের মনোভাবও বুঝতে পারছে না। জেন বলেছে, লোকটা আগেও এখানে কাজ করে গেছে। সেটা হতে পারে। কিন্তু সে তো একজন কাজের লোকই ছিল। এর বেশি কিছু নয়। আর সেটা আরও বছর পাঁচেক আগের কথা। যতদূর মনে হয়, সামান্য একজন কাউবয়ই ছিল তখন। কিন্তু এখানে যেভাবে কথা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে, মালিক তাকে আলাদা দাম দিচ্ছে। এ জিনিসটা ভাল লাগছে না ওর। সে র‍্যাঞ্চার ফোরম্যান, তা হলে ওর কথাই মন দিয়ে শুনতে হবে মালিককে, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার ব্যাপারে। কিন্তু মালিক মনে হচ্ছে লোকটার কথা শুনছে এবং গুরুত্বও দিচ্ছে।

খাওয়া শেষ করে কাউবয়রা বসে আছে। ডক অস্বস্তি বোধ

করছে। নতুন লোকটার কথার জবাবে মালিক এখনও কিছুই বলছে না। মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছে না কী বলতে পারে।

‘আমাদের নগদ টাকা দরকার,’ অবশেষে মুখ খুলল জেন। ‘কর্মচারীদের বেতন বাকি পড়ে গেছে, শহরে দোকানদারের পাওনা, ব্যাংকের তাগিদের পরে তাগিদ—এসব সামলাতে হলে টাকা চাই-ই। গরু না বেচলে এসব খরচ সামলাব কী করে বুঝতে পারছি না।’ স্টিভের দিকে তাকাল। ‘তোমার কথায় যুক্তি আছে। আশঙ্কা সত্যি হতে পারে। ব্যাংক টাকার জন্যে বাবার সঙ্গে চাপাচাপি শুরু করলে বাবা বিরক্ত হয়ে অসময়ে গরুর চালান দিতে রাজি হয়েছিল। গরুর চালানটা দিতে পারলে বাবা সব কর্জ শোধ করে ফেলত।’

‘সব কর্জ শোধ করে ফেলতে পারলে ববকে কেউ র‍্যাঞ্চ বেচার জন্যে চাপ দিতে পারত না। কিন্তু বব যাতে সেটা করতে না পারে, তাই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে,’ স্টিভ মন্তব্য করল।

‘তোমার অনুমান হয়তো সঠিক, স্টিভ।’ খাওয়া শেষ করল জেন। ‘বাবাকে হত্যার পেছনে কার হাত ছিল, সেটা আমরা জানি না। শেরিফ তার নিজের মত করে চেষ্টা করেছে। ক’দিন পরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এরপর সে আমাকে র‍্যাঞ্চ বেচে দেয়ার মতলব দিতে শুরু করে।’

‘এটা কিন্তু অস্বাভাবিক।’ মৃদু হাঁসল স্টিভ। ‘তোমাকে সবাই র‍্যাঞ্চ বেচে ফেলার পরামর্শ দেয়। শহরের শেরিফ, ব্যাংকের মালিক—এমনকী চাকরি খুঁজতে আসা একজন ভবঘুরে পর্যন্ত। না, ম্যাম,’ মাথা নাড়ল স্টিভ। ‘ডালমে কুচ শুধু কালাই নয়, হলুদ-বেগুনি-লাল-নীল রঙেরও আছে।’

ওর বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল জেরি, লুম ও জ্যাব সহ আরও কয়েকজন। স্টিভের চোখ চট করে ঘুরে এল গোমড়ামুখো

ফোরম্যান সহ কয়েকজনের ওপর। একটি জিনিস বুঝতে পারছে না। ফোরম্যানকে প্রথম থেকে এ আলোচনায় অনিচ্ছুক আর অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, র‍্যাঞ্চ চালানোর ব্যাপারে তারও নিজস্ব কোনও মতলব আছে।

‘কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো নগদ টাকা। ব্যাংকের চাপ সামলানো ছাড়াও কর্মচারীদের বেতন দেয়া, দোকানের বাকি পরিশোধ...’ জেন বলল।

‘হাহ!’ হেসে উঠল ডক। ‘ট্রেইল ড্রাইভে আমাদের যেতেই হবে, ম্যাম। আনাড়ি কোনও লোকের কথা শোনার সুযোগ নেই।’

‘ঠিক আছে, ডক। গরু চালান দেয়া বন্ধ করার কথা এখনও ভাবছি না। তবে আমাদের বোধহয় মি. স্টিভের বক্তব্যটাও ভেবে দেখা দরকার। কী বলো?’

তেরো

বার-বি’র পুরো এলাকাটা চোখের সামনে ভাসছে স্টিভের। সে যখন ছিল, তখনকার সব লোক এখন আর নেই। জেরি, লুম ও জ্যাব ছাড়া বাকিরা চলে গেছে। জেরি ছাড়া বাকি দু’জনই ওর সমবয়সী প্রায়। এরা তিনজনই ভাল লোক। ওদের সঙ্গেই একটা ভাল জানাশোনা গড়ে উঠেছিল স্টিভের। তিনজনই দক্ষ কর্মী। র‍্যাঞ্চের জন্যে যে-কোনও ত্যাগ স্বীকারে তৈরি। কাল রাতে খাওয়ার টেবিলে এদের দেখে ভরসা পেয়েছে ও। র‍্যাঞ্চকে ঘিরে

একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছে প্রথম দিন রিংস্টোনে জেন অস্টিনের অবস্থান দেখতে পেয়ে। একটা প্রতিষ্ঠিত র‍্যাঞ্চার মালিক হয়েও ব্যাংকের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পাচ্ছে মেয়েটা। একই দিনে একটা তৃতীয় শ্রেণীর ফালতু লোক নোংরা উদ্দেশ্যে হামলে পড়তে গেছে ওর ওপর। এর কোনোটাই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এর পেছনে কোনও একটা কারণ না থেকে পারে না। মুশকিল হলো কারণটা বুঝতে পারছে না স্টিভ। তবে কারণটা বুঝতে পারলে সে আশা করছে, বব অস্টিনকে কারা অ্যামবুশ করে মেরেছে, তারও আভাস পাওয়া যেতে পারে।

ফোরম্যান হিসেবে ডক ডোনাল্ড যে কোনও কাজের নয়, সেটা লোকটার আচরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখামাত্র লোকটার বিষ নজরে পড়ে গেছে সে। এর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। লোকটা যেন ওকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে বসেছে। গরু চালান না দেয়ার ব্যাপারে ওর পরামর্শকে পাত্তাই দিতে চাইছে না। লোকটার মধ্যে একটা সমস্যা আছে। স্টিভকে দেখামাত্র ওর ভেতরে আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে। কিছু একটা হারাবার ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সেটা কী হতে পারে? বোঝার জন্যে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হলো না। আনাড়ি র‍্যাঞ্চ মালিককে তার র‍্যাঞ্চ সহ কুক্ষিগত করার মতলব এঁটেছে সম্ভবত লোকটা। তবে জেনের তরফ থেকে তাকে প্রশ্ন দেয়ার লক্ষণ নেই বলেই মনে হচ্ছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর জেনের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলেছে স্টিভ। মেয়েটাকে ওর পরিকল্পনার ফাঁকগুলো চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। স্বস্তির ব্যাপার হলো, জেন তার কথা বুঝতে পেরেছে এবং সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে ফোরম্যানকে ডেকে গরু চালানোর পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত ঘোষণা করা হলো বলে জানিয়ে দিয়েছে। জেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ

তর্ক করেছে ডক। তবে সুবিধে করে উঠতে পারেনি। মেয়েটার মধ্যে দৃঢ়তা আছে। একটু বুদ্ধি-পরামর্শ পেলে ব্যবসায় উন্নতি করতে পারবে।

বার বার একটা বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়। বব অস্টিনের মত সজ্জন একজন মানুষকে কী জন্যে গুপ্তঘাতকের হাতে খুন হতে হলো? স্টিভ তাকে যতটা দেখেছে, তাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করে, বব অস্টিনের মত মানুষ কারও ক্ষতি করতে পারে না। এদের কোনও শত্রু হয় না। কিন্তু এরপরও যদি এদের মত মানুষকে গুপ্তহত্যার শিকার হতে হয়, তা হলে বুঝতে হবে, সেখানে গভীর কোনও স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার আছে। কেবল স্বার্থ উদ্ধারের জন্যেই কেউ কাউকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার কথা ভাবতে পারে।

এখানে কেউ একজন ববকে মেরে স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছে। স্বার্থটা কী, সেটা পরিষ্কার। কেউ একজন ওর র‍্যাঞ্চটা নিজের দখলে নিতে চায়। কিন্তু জোর করে দখল করা সম্ভব নয় বলে বিক্রির প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে।

বিক্রির প্রস্তাব যে-ই পাঠাক, লোকটা এখানকারই। বাইরের লোক হলে সে জায়গা বেছে নিয়ে ক্রেইম ফাইল করবে। এভাবে কারও কাছ থেকে র‍্যাঞ্চ কেনার জন্যে খুনখারাবি কিংবা ভয় দেখানোর পথে যাবে না। লোকটা এখানকার বলে জায়গাটা ভাল করেই চেনে। কোথায় কী আছে জানে। লোকটা বুঝতে পেরেছে বার-বিত্তে এমন কিছু আছে, যা দখল করতে পারলে প্রচুর টাকার মালিক হতে পারবে।

সেটা কী? সোনা? রিংস্টোন তো প্রথমে মাইনিং টাউন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এভাবে চিন্তা করলে অবশ্য একটা উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু একই সঙ্গে ওই প্রশ্নটাও ওঠে। সোনার খবরটা বব অস্টিন জানত কি না।

‘উঁহু, জানত না,’ সরবে চিন্তা করতে লাগল সিঁভ। ‘জানলে নিজেই তা পাওয়ার চেষ্টা শুরু করত। তা ছাড়া সেটা মেয়ের সঙ্গেও আলোচনা করত। কিন্তু জেনের ভাব-ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে এমন কোনও তথ্য তার জানা নেই। জানা থাকলে তার আচার-আচরণ পাল্টে যেত।’

কাউবয়রা সবাই বেরিয়ে গেছে। শুধু লুম রয়ে গেছে। বার্ন আর করালে কিছু কাজ করছে। হাতুড়ি পেটার ঠুক ঠুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে সিঁভ।

শেভ আর গোসল সেরে ওর কাছে গেল সে। করাত দিয়ে একটা কাঠ কেটে সাইজ করছে লুম। সম্ভবত স্টল মেরামতের কাজে লাগবে। সিঁভকে দেখে হাসল। ‘ডকের মন জয় করতে পারনি তুমি।’

‘দুর্ভাগ্য। আমি অবশ্য তার দরকারও মনে করছি না।’

‘তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। মালিককে সুপরামর্শ দিতে পারবে। বেচারি হিমশিম খাচ্ছিল। সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হলে কী করতে হবে, ডক সেটা বলতে পারছিল না।’

‘ওর দোষ দেয়া যাবে না। যারা র‍্যাঞ্চ বেচার জন্যে চাপ দিচ্ছে, তারা যে কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে না হয়তো।’

‘কিন্তু পারাটাই উচিত ছিল। নইলে ফোরম্যান কেন?’ গোমড়া মুখে ঘোঁৎ করে উঠল তরুণ কাউহ্যাণ্ড।

হাসল সিঁভ। ‘যেটা করছ সেটা কাল করলেও চুলবে। এখন চলো এক জায়গায় যাব।’

‘কোথায়?’

‘একটা আবিষ্কারে বেরোব। এই র‍্যাঞ্চটায় এমন কিছু আছে, যা কারও চোখে পড়েছে এবং তা পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। দেখতে চাই, সেটা আমাদেরও চোখে পড়ে কি না।’

পায়ের তালু থেকে মাথার তালু পুরোটাই জ্বলছে ডক ডোনাল্ডের। প্রায় তিন বছর ধরে বার-বি'র ফোরম্যান সে। এতটা অপমানিত নিজেকে আর কখনও মনে হয়নি। বুড়ো বব অস্টিন তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কখনও কোনও কাজ করত না। আর তারই মেয়ে, যে কি না র‍্যাঞ্চিং-এর আগা-মাথা বোঝে না, সে তার সঙ্গে কথাবার্তা না বলে লোক রাখে! সে-ও না হয় মানা যেত, কিন্তু তার কথা ধরে রাউণ্ডআপ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দিয়েছে তাকে। ব্যাপারটা অসহ্য ঠেকছে ডকের। কাজের লোকদের সামনে তার আর দুটি পয়সারও দাম রইল না। তার চেয়ে বড় কথা, বার-বি র‍্যাঞ্চিং মনে হয় তার চাকরির দিন ফুরিয়েছে।

সিঁভ রাসেল লোকটাকে বুঝতে পারছে না সে। লোকটা হুট করে কোথেকে এসে হাজির হলো? জেনের কথায় বোঝা গেছে, লোকটা আগেও এখানে কাজ করেছে। তা হলে এতদিন কোথায় ছিল? লোকটা বোধহয় পিস্তলবাজ। কোমরে পিস্তল ঝোলানোর কায়দা দেখে সেটা আঁচ করা যায়। কিন্তু কাজের লোককে এত বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণ কী? লোকটা অবশ্য সুদর্শনও। আচমকা বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল তার। জেন কি ওকে পছন্দ করে? সেজন্যেই ওর মতামতকে এমন গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে?

এই চিন্তাটা অস্থির করে তুলছে ডককে। বার-বি থেকে চাকরি চলে যাওয়া মানে তার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়া।

কিন্তু সেটা হতে দেয়া যায় না। ডক ডোনাল্ড তার স্বপ্ন সত্যি করার জন্যে যা-যা দরকার, সব করবে।

কিন্তু কী করবে সে? লোকটাকে মেরে ফেলবে? সেটাই করা উচিত। তা হলে ঝামেলা একেবারেই শেষ। কিন্তু ও বন্দুকবাজ নয়, আর নতুন লোকটা কোমরে পিস্তল ঝোলায়। নিশ্চয় সেটার

ব্যবহারও ভাল করেই জানে ব্যাটা। সে-লাইনে চিন্তা করে লাভ নেই।

কিন্তু যদি অন্য ভাবে? মানে অ্যামবুশে...বব অস্টিনের মত?

লোকজনকে কাজ বুঝিয়ে দিল ডক। তারপর ঘোড়া ছোটাল রিংস্টোনের উদ্দেশে। রাউণ্ডআপের চাপে বেশ ক’দিন ধরে শহরে যাওয়া হচ্ছে না। আচমকা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপাতত অবসর মিলেছে। শহরে গিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে আসা দরকার।

সেলুনের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল ডক। হিচরেইলে বেঁধে ভেতরে ঢুকল। দরজার কাছে একটা টেবিলে বসে আছে শেরিফ। হাতে বিয়ারের গ্লাস। একটু-একটু করে চুমুক দিচ্ছে। ডককে দেখে একগাল হাসল। ‘হাউডি, এসো গলা ভেজাবে।’

একই টেবিলে গিয়ে বসল ডক। শেরিফের আপ্যায়নটা ভাল লেগেছে। তা ছাড়া শেরিফকে বোধহয় দরকার হবে এখন। তাই তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেয়ার জন্যে বার-বি মালিককে যারা চাপ দিচ্ছে, তাদের মধ্যে শেরিফও একজন। তবে আর সবার মত শেরিফও পাত্তা পায়নি। সুতরাং বার-বি’তে একজন বন্দুকবাজ রাখা হয়েছে, এটা কান পেতে শোনার মত একটা খবর হয়ে দাঁড়াতে পারে ওর কাছে।

‘তারপর বলো বার-বি’র কী অবস্থা? টাকা-পয়সা পাচ্ছ তো? নাকি বেগার খাটছ? ট্রেইল ড্রাইভে কখন বেরোচ্ছ?’ এক নাগাড়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলল শেরিফ। থেমে গ্লাসে চুমুক দিল ফের।

বারটেগারের দেয়া নতুন বোতলটার মুখ খুলল বার-বি ফোরম্যান। গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল, ‘চালান দেয়া হবে না। রাউণ্ডআপ বন্ধ।’

‘ক্...কেন?’ বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো শেরিফের। দারুণ একটা তথ্য। হজম করতে একটু সময় লাগল। ‘তা হলে ব্যাংকের

ঋণ কী করে শুধবে তোমরা?’

‘সেটা জেন অস্টিনই ভাল বুঝবে। ও আর ওই নতুন লোকটা। ওর পরামর্শেই রাউণ্ডআপের সিদ্ধান্ত পাল্টেছে বার-বি। আমাকে বোধহয় নতুন কাজের খোঁজে নামতে হবে, মর্ট।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও। কোন্ নতুন লোকের কথা বলছ? বার-বি নয়া লোক নিয়েছে নাকি? কী নাম লোকটার?’

‘স্টিভ রাসেল।’

‘স্টি-ভ রা-সে-ল!’ প্রতিধ্বনির মত উচ্চারিত হলো নামটা শেরিফের মুখে। ‘লোকটা তা হলে বার-বি’তে গিয়ে ভিড়ল?’

‘চেনো নাকি?’

‘দিন দুয়েক শহরে ছিল। গতকাল শহর ছেড়ে গেছে। কোথায় গেছে জানতাম না। এখন জানলাম। ভাল কথা,’ টেবিলের ওপর রাখা টুপিটা তুলে নিল শেরিফ। ‘আমি একটু কাজে যাচ্ছি। তুমি শহরে থাকলে আজ আবার দেখা হতে পারে। নতুন চাকরির কথা সত্যি সত্যিই ভাবছ নাকি?’

‘না ভেবে উপায় কী? বার-বি চলছে নতুন লোকের কথায়। ওকেই হয়তো ফোরম্যান করা হবে...এরপর হয়তো বিয়েও...’ আচমকা থেমে গেল ডক। মুখে কুলুপ আঁটল।

এক মুহূর্ত ফোরম্যানের চোখে চোখ রাখল শেরিফ। মুচকি হাসল। ‘অধৈর্য হয়ো না, বাছা।’ তারপর টুপি নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল ব্যাটউয়িং ডোর ঠেলে। সেদিকে তাকিয়ে আরেক গ্লাস মদ দিতে বলল ডক বারটেণ্ডারকে।

চোদ্দ

লুমকে নিয়ে বেরোল সিঁভ। পাঁচ বছর আগে দেখা পুরো র‍্যাঞ্চটা আবার ঘুরেফিরে দেখার ইচ্ছে।

পাশাপাশি হন্টন গতিতে চলেছে দুটো ঘোড়া। টুকটাক কথা বলছে সিঁভ। জেনে নিচ্ছে র‍্যাঞ্চের খবরাখবর। কথা বলতে বলতে সিঁভকে দেখছে লুম। পাঁচ বছর আগের সে লিকলিকে কাউবয় নয় এখন ও, রীতিমত সুপুরুষ এক যুবক। কোমরে পিস্তল ঝোলানো, ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার হাঁটার তালে তালে দুলছে ওর মাথা, কাঁধ আর কোমর।

‘তখন তোমার কোমরে পিস্তল ছিল না,’ আচমকা মন্তব্য করল লুম। ‘পাঁচ বছর আগের কথা বলছি।’

চট করে ওর দিকে তাকাল সিঁভ। মৃদু হাসল। ‘অবাক হয়েছ?’

‘কিছুটা তো বটে। নিশ্চয় ভাড়া খাটাও না তোমার অস্ত্র।’

‘খাটাই তো।’ আবার হাসল সিঁভ। ‘ব্র্যাণ্ডের জন্যে খাটাই।’

‘থাকছ?’

‘আপাতত। কতদিন থাকব সেটা নির্ভর করছে তোমাদের মনিবের ওপর।’

‘বেচারি হিমশিম খাচ্ছে, সিঁভ। র‍্যাঞ্চিং বিষয়টা ভাল বোঝে না। তার ওপর নগদ টাকা-পয়সা নেই হাতে। ঋণের জালে

জড়িয়ে গেছে। এদিকে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেয়ার জন্যে নানামুখী চাপ।’

‘ব্যাংকে এত টাকা কী করে ঋণ হলো ববের? জানো কিছু?’

‘জানি না। তবে বউয়ের অসুখে অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। জেনের পুবে পড়ার খরচও চালাতে হত।’ একটু থামল লুম। ‘তা ছাড়া জানোই তো কেমন হাত-উপুড় ছিল বুড়োর। খরচের পথ বের করে নিত নিজেই।’

‘হুম,’ সায় দিল সিঁভ। ‘ওই হাত-উপুড়ে বুড়োর কারণেই আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। এখন তার ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। আমি জানতে চাই, বব কেন মারা গেল? কার কী সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তাকে একেবারে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল কার?’

পশ্চিমে এগোচ্ছে ওরা। ওদিকে পাহাড়। পায়ের নীচে তৃণভূমি ক্রমে উঁচু হচ্ছে। এদিকটায় ঘাস অনেক বড় হয়ে উঠেছে। অনেকদিন এদিকে গরু চরানো হয়নি মনে হয়। বিশাল বার-বি র‍্যাঞ্য়ের হাজার পাঁচেক গরু কখনও ঘাসের অভাবে ভোগে না। ঘাসের জঙ্গল হয়ে ওঠার আগে এদিকে গরু নিয়ে আসতে হবে, লুমকে পরামর্শ দিল সিঁভ।

‘ব্যাপারটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। কেউ একজন এই র‍্যাঞ্চটা গ্রাস করতে চায়। জোর করে সেটা সম্ভব হলে এতদিনে করেই ফেলত। কিন্তু বব অস্টিন ক্লেইমটা ফাইল করে সে পথ বন্ধ করে দিয়ে গেছে।’ থামল সিঁভ।

‘এখানে সবারই নিজ নিজ র‍্যাঞ্চ আছে। এ মুহূর্তে সবচাইতে প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চটা হচ্ছে জব হাইওসের,’ লুম বলল। ‘দশ থেকে পনেরো হাজার গরু চরে ওর। প্রতি বছরই ওর গরু চালান যায় ওমাহায়। ভালই ব্যবসা করছে জব। অন্যের র‍্যাঞ্চ দখল করার চেষ্টা করবে কেন সে?’

‘কিন্তু ব্যাংকার যে বলল, ও নাকি কিনতে চায়? কিনতেই বা চাইবে কেন? আচ্ছা, সে প্রশ্ন থাক। তুমি তো বহু বছর ধরে আছ বার-বি’তে। ববের কোনও শত্রু ছিল কি না বলতে পারো?’

‘মনে হয় না। বব ছিল নির্বিরোধী। কাউকে শত্রু বানানোর কাজ সে কখনও করতে পারে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। অন্তত ওকে তা করতে দেখিনি।’

‘তা হলে ওকে মরতে হলো কেন?’ প্রশ্ন তুলল স্টিভ। ‘ওর হত্যাকাণ্ড তো পুরোটাই পরিকল্পিত। ওকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপরই তার ব্যাঙ্ক কেনার জন্যে কেউ একজন হন্যে হয়ে উঠেছে। একে-ওকে-তাকে, এমনকী শেরিফকে পর্যন্ত সুপারিশ ধরেছে। বুঝতেই পার, লোকটা বাইরের কেউ নয়, এখানকারই।’

‘তুমি কী ভাবছ? জেনের জন্যেও কি একই পরিণতির আশঙ্কা করছ?’ উদ্বিগ্ন স্বরে বলল লুম।

‘সেটাই স্বাভাবিক। বাপ গোয়ার্তুমি করে জীবন দিয়েছে। মেয়েও তা-ই করছে। কী মনে করো তুমি? ছেড়ে দেবে?’

‘সেরকম কিছু হলে, যিশুর কসম, হারামিগুলোকে নরক থেকে টেনে বের করে আনব আমরা। অন্তত আমি, জেরি আর জ্যাব তা করবই।’

‘ব্যস, মাত্র তিনজন!’ অবাক হয়ে চাইল স্টিভ সঙ্গীর দিকে। ‘বাকিরা? ফোরম্যান?’

‘জানি না, স্টিভ। তবে ফোরম্যানকে বিশ্বাস করি না। বুঝতেও পারি না। আমার ব্যাঙ্ক হলে ওকে অনেক আগেই বিদায় করে দিতাম। বুড়ো মালিক একটা ভুল করে গেছে ওকে ফোরম্যান বানিয়ে।’

‘জেন বিদায় করছে না কেন ওকে?’

‘কী জানি! হয়তো বুঝতে পারছে না কাজটা ঠিক হবে কি না।’

এরপর চুপচাপ ঘোড়া চালাতে লাগল ওরা। চিন্তা করছে সিঁভ। ফোরম্যানকে জেন পছন্দ করে না, এটা কাল রাতে খাওয়ার টেবিলেই বুঝতে পেরেছে। মালিকের আস্থাভাজনও নয়। ওর নিজের কাছেও একটা র‍্যাঞ্জের ফোরম্যান হওয়ার মত ধীর-স্থির এবং চৌকস মনে হয়নি লোকটাকে। ওর প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারেনি পরিষ্কার ভাবে। রাউণ্ডআপ এবং গরু চালান বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি লোকটার। কিন্তু আপত্তির কারণটাও বুঝিয়ে বলতে পারেনি।

সামনে টিলার মত ছোট ছোট পাহাড়। ঘেসো ভূমি। মাঝে মধ্যে পানির উৎস। দলছুট দু'একটা গরু দেখা যাচ্ছে, চরছে এদিকে-ওদিকে। দু'তিনটা ম্যাভরিককে পাশ কাটাল তাদের ঘোড়া। মানুষ কিংবা ঘোড়ার আভাস পেয়ে ঘাস থেকে মুখ তুলল ব্র্যাণ্ডবিহীন নাবালক গরুগুলো। ফের খেতে শুরু করল মুখ নামিয়ে।

‘রাউণ্ডআপের সময় ভয় পেয়ে দল ছেড়ে ভেগে এসেছে।’ হাসল লুম।

সামনে, দিগন্তের দিকে হাত উঁচাল সিঁভ। ‘ওই পাহাড়গুলো পর্যন্ত বার-বি’র সীমানা, তাই না?’

‘হুঁ, পাহাড়গুলোও। বিশাল বিশাল সব গাছ পাহাড়ে। বেচতে পারলে প্রচুর টাকা। গুণে শেষ করা যাবে না। কিন্তু ক্রেতা কোথায়? অত গাছ দিয়ে কে কী করবে?’

শুনছে সিঁভ।

‘বব অবশ্য বলত, রেললাইন চালু হলে গাছ লাগবে; প্রচুর কাঠ লাগবে লাইন বসানোর জন্যে।’

‘রেললাইন আসবে নাকি এদিকে?’

‘সেরকম কিছু শুনিনি এখনও। যদি আসে, তা হলে আমরা অবশ্যই বড়লোক হয়ে যাব।’ দাঁত বের করল লুম।

‘আমরা?’

‘হ্যাঁ, আমরাই তো। আমাদের বার-বি।’

‘ভাল লোক ছিল বব।’ সামনের দিকে তাকাল সিড।
‘সবাইকে ভালবাসত। অবশ্য তার মেয়েটা কীরকম জানি না।
হয়তো বাপের মতই একটা সুন্দর মন আছে ওরও।’

‘জানতে চাও নাকি?’ সিডের দিকে চেয়ে পিচ্ছিল হাসি হাসল লুম। ‘আমি বাবা অতদূর ভাবিনি।’ আড়চোখে সহযাত্রীর দিকে চাইল লুম। ‘মানে সাহস করিনি আর কী? এই চেহারা নিয়ে অমন শিক্ষিত সুন্দরী মহিলার দিকে চোখ তোলা ঠিক নয়। তোমার অবশ্য সে সমস্যা নেই। আর তোমাকে নতুন বস হিসেবে মেনে নিতে আমাদেরও আপত্তি হবে না।’

চুপ করে রইল সিড। ভাবার মত একটা বিষয় খুলে দিয়েছে লুম ওর সামনে। এখন আর তার মনে সামান্যতম সন্দেহও নেই যে, র‍্যাঞ্চ বিক্রির ব্যাপারে রাজি করাতে না পেরেই খুন করা হয়েছে বব অস্টিনকে। সেটা কারা করিয়েছে, তাদের চেনাটাও কঠিন নয়। চলমান সূত্রগুলো একটার পর একটা জোড়া লাগালেই গোড়ায় গিয়ে পৌঁছানো যাবে।

লুমের কথায় মনে হচ্ছে পাহাড়ের গাছগুলোর গুরুত্ব বুঝত বব। জানত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাঠের স্লিপার। এই স্লিপারের ওপরই লোহার পাত আটকে লাইন বসানো হয়।

ববের মত এই গাছগুলোর গুরুত্ব বোঝার মত লোক নিশ্চয় এখানে আরও কেউ কেউ আছে। কিন্তু এত বেশি গাছপালাঅলা জায়গা নেই অন্য কোনও র‍্যাঞ্চে। ববকে এই ব্যাপারে ভাগ্যবানই বলতে হবে।

সহজ-সরল মানুষ ছিল বব। তার এই গুণটাকে দুর্বলতা বলে ভাবার মত প্রভাবশালী মানুষ এখানে কে-কে আছে? তাদের পুরো

পরিচয়টা পেলে সন্দেহভাজনদের একটা তালিকা করে ফেলা যায়। তবে সে তালিকা খুব বেশি বড় হবে বলেও মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত হয়তো তা একজনে গিয়েও ঠেকতে পারে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা প্রমাণ করা কঠিন নয়, রীতিমত অসম্ভবই হয়ে পড়বে।

‘নতুন বস?’ হেসে উঠল সিঁভ। ‘শুনতে খারাপ না। তবে আমি দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখি না, ম্যান। ...চলো, সামনের ওই পাহাড়ের গাছগুলো দেখে আসি কত বড় হলো। পুরো র‍্যাঞ্চটাও চক্কর দেয়া দরকার। পাঁচ বছরে নিশ্চয় অনেক কিছু পাল্টে গেছে। সব দেখে-শুনে না নিলে কাজ করব কীভাবে?’

‘এটা ভাল বুদ্ধি।’ হাসল লুম। ‘তবে, সিঁভ, পাহাড়ে তোমাকে একাই যেতে হবে। র‍্যাঞ্চে আরও কিছু কাজ পড়ে আছে আমার। ডক ডোনাল্ডের দাঁত খিঁচুনি খাওয়ার আগে ওগুলো সেরে ফেলাই বোধহয় ভাল হবে। কী বলো?’

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসিমুখে সায় দিল সিঁভ। ‘ঠিক আছে, ম্যান। খাবার হিসেবে দাঁত খিঁচুনি তেমন উপাদেয় কিছু না। কখনও কখনও বদহজমও হয়ে যায়।’

পনেরো

ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে ভাল লাগে টমের। ছোট্ট একটা গ্রুনার পিঠে চড়ে মাঝে মধ্যে র‍্যাঞ্চার এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। নীল আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের প্রান্তর, আবছা নীল

পাহাড়-টিলা। পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট ঝরনা বয়ে যাচ্ছে তির তির করে। টিলার ভেতর গাছগাছড়ার ফাঁকে বুনো মোরগের ডাক, ঝোপে-ঝাড়ে খরগোসের ছুটোছুটি, বুনো ফুলে ভোমরার গুঞ্জন, আকাশে চিল আর শকুনের ওড়াওড়ি—এসব দেখতে দেখতে চমৎকার সময় কাটে তার।

বাবা থাকতে বাবার সঙ্গে বেরোত। বাবা তাকে শেখাত বিভিন্ন পাখি, পোকামাকড়, গাছপালা আর ফুল-ফলের নাম। র্যাঞ্চ, গরু-ঘোড়া, ঘাস-পানি—এসব নিয়ে কথা বলত। খুব ভালবাসত টম বাবাকে। মাকেও। কিন্তু মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, তারপর একদিন মারা গেল। মার জন্যে খুব কষ্ট হয়েছিল টমের। মনে হয়েছিল, কী যেন হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। তারপর তো সিস এল। খুব ভাল মেয়ে সিস। পূর্বে থেকে অনেক পড়েছে। মা বেঁচে থাকলে আরও পড়ত। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর সে যে এল, আর গেল না। বাবা অবশ্য বলেছিল লেখাপড়া শেষ করার জন্যে, কিন্তু রাজি হয়নি। তাতে অবশ্য লাভ হয়েছে টমেরই। সিসকে সারাক্ষণই কাছে পাচ্ছে। মায়ের মতই ওর দেখাশোনা করছে। ওকে পড়াচ্ছেও। বলেছে, আরেকটু বড় হলে তাকেই পাঠিয়ে দেবে পূর্বে পড়াশোনার জন্যে। তবে টম ঠিক করেছে, বোনকে একা রেখে কোথাও যাবে না সে। ওকে ছেড়ে থাকতেই পারবে না।

বাবা মারা যাওয়ার পর খুব খারাপ সময় যাচ্ছে ওদের। কিছু মানুষ ওদের পেছনে লেগেছে। কেন যে ওরা তাদের র্যাঞ্চটা বিক্রি করে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে বুঝতে পারছে না। তাদের র্যাঞ্চ থাকলে ওদের সমস্যা কোথায়? আরও তো অনেক র্যাঞ্চ রয়েছে, তাদের তো কেউ এভাবে বিক্রি করে দেয়ার জন্যে বলছে না। ওদিকে ব্যাংকও তাদের টাকা শোধ দেয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করেছে।

চারদিক থেকে যেন ওদের জন্যে বিপদ ঘনিযে আসছে । জেন একা একজন মেয়ে, কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না । দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে । কারও সঙ্গে পরামর্শ করবে, এমন একজন মানুষও নেই তাদের ।

ওর ইচ্ছে হয় জেনকে সাহায্য করতে । কিন্তু কীভাবে করবে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না । তবে জেন বলেছে, ঠিকঠাক মত লেখাপড়া করলেই নাকি ওকে সাহায্য করা হবে । টম তা-ই করে । বোনের নির্দেশ মত পড়াশোনাটা সে মন দিয়ে করার চেষ্টা করে । তবু সারাক্ষণ একটা ভয় কাজ করে ওর মনে । ওর বয়স এখন মাত্র বারো । বড় হতে এখনও অনেক বাকি । ওদিকে জেন একজন মেয়ে মাত্র । একজন ছোট মানুষ আর একজন, মাত্র একটু-একটু বড় হয়ে ওঠা মেয়ের পক্ষে এত বড়-বড় শত্রুর মোকাবেলা করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব কি না ওরা বুঝতে পারছে না । তারা যদি র্যাঞ্চটা ওদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, কিছুই করতে পারবে না । ওদের হয়ে কেউ লড়তে চাইবে না । কেন লড়বে? তাদের কি টাকা-পয়সা আছে যে, লড়াই করার জন্যে মানুষ ভাড়া করবে? যারা এখনও কাজ করছে, তারাই হয়তো ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ।

ফোরম্যান ডককে ওর ভাল লাগে না । টমের মনে হয়, কিছু একটা ফন্দি আঁটছে সে-ও । আর র্যাঞ্চে যারা কাজ করছে, তাদের বেশিরভাগই ওর কথা শোনে । কেবল লুম, জেরি আর জ্যাব ছাড়া । এসব তাকে কেউ বলেনি । তবে লোকগুলোর ভাবভঙ্গি দেখে সেরকমই মনে হয় ওর । কথাটা জেনকে বলেনি সে । এমনিতে দুশ্চিন্তায় আছে, আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে বেচারি ।

তবে স্টিভ আসার পর থেকে কেন যেন অনেকটা কেটে গেছে ওর ভয় । স্টিভকে ওর অনেক আপন মনে হচ্ছে । আগে যখন ছিল বার-বিত্তে, তখনও ভাল লাগত । ওকে আদর করত স্টিভ ।

ওর সাহায্যেই প্রথম ঘোড়ায় চেপেছিল সে। শিথিয়ে দিয়েছিল কীভাবে কী করলে ঘোড়া কী করবে। সে সময়, টমের মনে আছে, জেন র‍্যাঞ্জে ছিল না। পুবে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিল। ওর সঙ্গে তাই জেনের পরিচয় হয়ে ওঠেনি।

সিটভ আসায় ভারী খুশি হয়েছে টম। ওর বিশ্বাস, বার-বি'র সমস্যাগুলো সে দূর করতে পারবে। কী করে পারবে জানে না। তবে ঠিকই পারবে। সিটভকে ফোরম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথা জেনকে বলবে বলে ঠিক করেছে সে। ডককে ওর একদম ভাল লাগে না। ওদের সমস্যায় কোনও কাজে আসছে না লোকটা। সিটভ নিঃসন্দেহে ওদের ভালবাসে। নইলে বাবার চিঠি পেয়ে পাঁচ বছর পরে এভাবে ছুটে আসত না।

র‍্যাঞ্জ হাউস থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে টম। বিকেল এখন। সূর্য ডোবার অবশ্য অনেক বাকি। 'গ্র'র পিঠ থেকে নামল। ঘোড়াটাকে চরতে দিল ঘেসো জমিতে। এ জায়গাটায় প্রায় সময় আসে ও।

একটা কটনউডের তলায় দাঁড়াল। বিকেলে চমৎকার বাতাস দিচ্ছে। জুড়িয়ে যাচ্ছে গা। কটনউডের একটা মোটা শেকড়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল। এখানে বসে বাবা-মার কথা ভাবতে ওর ভাল লাগে। আন্তে আন্তে তন্দ্রা নামল ওর চোখে।

আচমকা ঘোড়ার খুরের শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল ওর। চোখ খুলে সোজা বসতে গেল। তার আগেই দু'জন ঘোড়সওয়ার ওর সামনে চলে এল। দু'জনেরই মুখ ঢাকা ব্যাণ্ডানা দিয়ে। কিছু একটা বলতে গেল সে। তার আগে একজন লাফিয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। হাতের পিস্তল দিয়ে বাড়ি মারল ওর মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল টম। অজ্ঞান শরীরটা পাঁজাকোলা করে সঙ্গে নিয়ে আসা একটা খালি ঘোড়ার পিঠে তুলে বেঁধে ফেলল। গ্রালাটা তখনও চরছে মনের আনন্দে।

নতুন বস!

হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছে স্টিভ মনে মনে। ভালই মজা করেছে লুম। নতুন বস কথাটা শুনতে ভাল লাগছে। কিন্তু কথাটার প্রকৃত অর্থ ভাবতে গিয়ে দু'একটা হার্টবিটও যে মিস করেছে না, তা নয়। নতুন বস হওয়ার মানে হলো জেন অস্টিনকে বিয়ে করা। দিবাস্বপ্ন মাঝে মাঝে স্টিভ দেখে। তবে এটা একেবারে দুপুরের স্বপ্ন, যখন কড়া রোদে গা জ্বলে যায় আর দরদর করে ঘাম ঝরে মাথার তালু থেকে পায়ের পাতায়। এ সময়টা কোনোভাবেই স্বপ্ন-টপ্প দেখার নয়।

লুমকে বিদেয় করে দিয়ে পাহাড়ের দিকে গেছে ও। সারাটা দুপুর কাটিয়েছে গাছপালা দেখে দেখে। পাঁচ বছর আগে এত ঘন ছিল না গাছগুলো। ছিল আরও ছোট। এখন অনেক মোটা আর লম্বা হয়েছে। এসব গাছ কেটে বিক্রি করতে পারলে অনেক টাকা আয় করা যাবে। একজন র‍্যাঞ্চার গরু বেচে যত টাকা পেতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা। বব অস্টিন নির্বোধ ছিল না। স্টিভ যা ভাবছে, সে-ও ঠিক তা-ই ভেবেছিল। আর যারা তাকে হত্যা করেছে, তারাও ঠিক এমনটাই হিসেব কষেছে। কিন্তু ববকে বাগে আনতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

ওকে সাহায্য করতে এসেছিল স্টিভ। পাঁচ বছর আগে সে যখন ওমাহায় অসহায় অবস্থায় মরতে বসেছিল, তখন বব অস্টিন নামের এই মহৎহৃদয় লোকটা তাকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় জেনেও চিকিৎসা করিয়ে সারিয়ে তুলেছিল। নিজের ছেলের মত করে আদর দিয়েছে ওর স্ত্রী। নানা কারণে স্টিভ তখন থাকতে পারেনি। চলে যেতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু এবার সে থাকবে। অন্তত টমকে এখানে প্রতিষ্ঠিত না করে যাচ্ছে না সে। যারা এ

র্যাঞ্চটা গ্রাস করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, তাদের বুঝিয়ে দেবে, বার-বি বেওয়ারিশ সম্পত্তি নয়। ইচ্ছে হলেই লুটেপুটে খাওয়া যাবে না।

সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক আগে র্যাঞ্চের উদ্দেশে যাত্রা করল স্টিভ।

হালকা চালে ছুটছে স্ট্যালিয়ন। সকালে যে-পথে গিয়েছিল সে-পথ ধরে আসছে। র্যাঞ্চের পথ চেনা হয়ে গেছে ওর। মনিবের নির্দেশের দরকার হচ্ছে না।

জেনের কথা ভাবছে স্টিভ। মেয়েটা কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্টিভ তাকে ম্যাডনের হাত থেকে বাঁচানোর পর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। কিন্তু র্যাঞ্চে কাজের লোক লাগবে জেনেও তাকে কাজ করতে বলেনি। স্টিভ শেষ পর্যন্ত বার-বি'তে না গেলে এবং টম তাকে চিনতে না পারলে ওকে রাখা হত না। দোষটা অবশ্য ওর নয়। একের পর এক ধাক্কা খেতে খেতে মেয়েটা এখন নিজের ছায়াকেও অবিশ্বাস করছে। ফোরম্যান ডক ডোনাল্ডকেও বিশ্বাস করে না, সেটা তার হাবভাবেই বোঝা গেছে। ডক ডোনাল্ডও যে তা বোঝে না এমন নয়। লোকটা অসম্ভব তার মালিকের ওপর। এই জিনিসটা ঠিক নয়। বিপদের কারণ হতে পারে জেনের জন্যে। যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মচারী অসম্ভব, সে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয় না। পরিণামে বিপদ হয়।

সূর্য পাহাড়ের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। একটু পরেই আড়ালে চলে যাবে। তৃণভূমির ওপর দিয়ে বাতাস বইছে। ঘোড়ার দুলকি চালে দুলতে দুলতে জুড়িয়ে যাচ্ছে গা। পাঁচ বছর আগে সে এখানে ছিল। পাঁচ বছর পরে আবার ফিরে এসেছে। বুড়ো বব এখন নেই। তবু জায়গাটাকে পর মনে হচ্ছে না ওর। বব নেই, কিন্তু টম আছে। ছেলেটা ওকে দেখে দারুণ খুশি হয়েছে। বারবার জানতে চেয়েছে, 'তুমি থাকবে তো, স্টিভ? গতবারের

মত চলে যাবে না তো আবার?’

স্টিভ হেসেছে কেবল। তবে এখন সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। থাকবে। অন্তত যদি না টম নিজেই র‍্যাঞ্চার দায়িত্ব নেয়ার মত শক্তপোক্ত হয়। ছেলেটাকে নিজের হাতে গড়ে তুলবে সে। গড়ে তুলবে ওর র‍্যাঞ্চটাও। একজন পুরুষ মানুষ চাই র‍্যাঞ্চে। জেনের পক্ষে একা কখনও এই র‍্যাঞ্চ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। হাজার বুদ্ধিমতী হলেও। বুদ্ধির খেলা পুবে ভাল কাজ দেয়, কিন্তু পশ্চিমে তার সঙ্গে শক্তিমত্তাও দেখাতে হয়।

কড় কড়াৎ শব্দ বজ্রপাতের মত এসে ঢুকল অন্যমনস্ক স্টিভের কানে, পরমুহূর্তে ডান কানের ওপর মাথার খুলিতে তীব্র জ্বালা অনুভব করল। স্বাভাবিক রিফ্লেকশনে ঘোড়ার পিঠ থেকে একদিকে ঝাঁপ দিল সে। মাটিতে পড়ল। ঘোড়াটাও ছিটকে সরে গেল রাইফেলের আওয়াজ চিনতে পেরে। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাসে মুখ ডোবাল।

মাটিতে পড়ে একদম অনড় হয়ে রইল স্টিভ। মাথা ঝিমঝিম করছে। জ্বলে যাচ্ছে যেন আহত জায়গাটা। চিৎ হয়ে আছে ও। চোখদুটো মলমল। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিয়েছে অপেক্ষা করছে।

ষোলো

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। স্টিভ ভেবেছিল, ওর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে

কি না দেখার জন্যে কাছে আসবে আততায়ী। কিন্তু কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হতাশ হলো। আততায়ী কাছে এলে ওকে ভাল করে চমকে দেয়া যেত। আটকও করা যেত নিশ্চয়। তা হলে কারা এসব ষড়যন্ত্রের পেছনে ঘাপটি মেরে আছে, তাদের চেনা যেত।

তবু উঠে বসার ঝুঁকি নিচ্ছে না সে। আততায়ী চালাক হলে কাছে আসবে না। চলেও যাবে না। অপেক্ষা করবে।

অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ক্ষতস্থানে। একপাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে গুলি। আঁচড় কতটা গভীর হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে আঙুল ছোঁয়াল ক্ষতের ওপর। কপাল থেকে মাথার পেছন পর্যন্ত বড় ফাঁকটা অনুভব করল। খুলির হাড় ঘেঁষে গেছে মনে হয়। রক্ত শুকিয়ে চুলে জট বেঁধে গেছে।

আঁধার নামতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল সিঁড়ি। মাথা ঘুরছে। টন টন করছে ক্ষতস্থানের দু'পাশে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছে সিঁড়ি। গুলিটা আর আধইঞ্চি চেপে এলে মারা যেতে পারত।

ঘোড়াটার উদ্দেশ্যে চারদিকে চোখ বুলাল। একটু দূরে দেখল চরছে ওটা। শিস দিল। কান খাড়া করল স্ট্যালিয়ন। তারপর ছুটে এল শিসের শব্দ লক্ষ্য করে। কাছে এসে থমকে গেল। ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল। সম্ভবত রক্তের গন্ধ পেয়েছে। ঘোড়াটার সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলল সিঁড়ি। কাছে গিয়ে হাত বুলাল ওটার ঘাড়, কেশর নেড়ে দিল। তারপর উঠে বসল পিঠে।

আপাতত র‍্যাঞ্জে ফিরে চলল ও। অন্ধকারে আততায়ীদের ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাল সকালে এসে পান্ডা লাগানো যাবে। ওকে অ্যামবুশ করা হয়েছে। কাজটা তারই, যে অস্টিনকেও অ্যামবুশ করে হত্যা করেছে। সেবার তারা সফল হয়েছে। কিন্তু এবার হয়নি। এবার ওদের মাণ্ডল গুনতে হবে।

কড়া মাশুল ।

কিছুদূর গিয়ে মত পাল্টাল সিঁভ । ঘোড়া ঘুরিয়ে রিংস্টোনের পথ ধরল । ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করানো দরকার । কাল সকালে আততায়ীদের খোঁজে বেরোতে হলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে হবে । আততায়ী যে-ই হোক, দেখা যাচ্ছে খুব দ্রুত অ্যাকশনে নেমেছে । ও বার-বি'তে যাওয়া মাত্রই সরিয়ে দিতে চাইছে ওকে । ওরা নিজেদের খুব চালু ভাবছে বোধহয় । সিঁভ দেখতে চায় কতটা চালু । ওদের ধারণা, আজ একটা সফল অপারেশন করেছে তারা । এমন একটা সফল অপারেশনের পর রিংস্টোনে গিয়ে ফুটি করতেই পারে । চোখ এবং কানকে ঠিকঠাক মত কাজে লাগাতে পারলে সিঁভের ধারণা, একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে । তবে এটা ঠিক, সূত্র খুঁজে পেলেও কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না সে । না পারুক । তবু সন্দেহ করার মত কাউকে পাওয়া গেলে সেটাও কম নয় ।

শহরে পৌঁছে প্রথমেই ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকল সিঁভ । এখানে বোধহয় খুনখারাবি আর মারামারি খুব বেশি হয় না । চেম্বারে ঢুকতে গিয়ে ডাক্তারের ম্লান মুখ দেখে টের পেল সিঁভ । রোগী দেখে মলিন মুখে হাসির বান ডাকল লোকটার ।

‘কীভাবে হলো?’ ক্ষতটা দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল ।

‘ঘোড়ায় লাথি মেরেছে ।’

‘যাহ্! বাজে বকছ । এটা গুলির দাগ । রাইফেলের । তোমাকে অ্যামবুশ করা হয়েছিল ।’

ডাক্তারের প্রথম প্রশ্নে বিরক্ত হয়েছিল সিঁভ । কিন্তু এবার অবাক হলো । ‘কীভাবে বুঝলে?’

‘অনেক দূর থেকে এসেছে গুলিটা । রাইফেল দিয়ে কাছ থেকে গুলি করা হয় না । এখানে কাছেপিঠে কোথাও লড়াই হচ্ছে না । তবে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে গোলাগুলি হতে পারে । সেসব

ক্ষেত্রে অ্যামবুশ করা হয়। শেষ অ্যামবুশের ঘটনা ঘটেছিল মাস কয়েক আগে। বব অস্টিনকে গুলি করে মেরেছিল কেউ একজন।’

‘এখানকার কেউ?’

‘এখানকারই তো হওয়ার কথা। তবে লোকটা সাদাসিধে ছিল। তাকে কেউ কাপুরুষের মত আড়াল থেকে মারবে, ভাবাই যায়নি।’

ক্ষতস্থান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল ডাক্তার। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে বলল, ‘শুকোতে তিন-চারদিন লাগবে। দিন দুয়েক পরে এসো। ব্যাণ্ডেজ পাল্টে দেব। তোমাকে এখানে আর দেখেছি কি না মনে করতে পারছি না।’

‘তাই?’ একটা মুদ্রা রাখল সিভ ডাক্তারের টেবিলে। ‘আশা করি, এখন থেকে ঘন ঘন দেখা হবে। অবশ্য হলে তোমার লাভ, না হলে আমার।’

‘তোমাকে ভাল লোক মনে হচ্ছে। আহত অবস্থার চেয়ে সুস্থ দেখতেই ভাল লাগবে।’ হাসল ডাক্তার। ‘কোথাও কাজ করছ নাকি এখানে?’

‘বার-বি।’

‘আচ্ছা!’ মুখের হাসি আরেকটু চওড়া হলো ডাক্তারের। ‘জেনকে বোলো, ডাক্তার ক্রুইপ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ভাল কথা, বার-বি ফোরম্যানকে দুপুরের দিকে সেলুনে দেখেছিলাম। মন-মেজাজ সুবিধের মনে হয়নি। ও সচরাচর শনিবার ছাড়া আসে না। আজ কেন এসেছিল কে জানে! লোকটাকে আমার পছন্দ হয় না। কোনও কারণ ছাড়াই।’

চুপচাপ খবরটা হজম করল সিভ। রিংস্টোন বার-বি থেকে পাশের বাড়ির দূরত্বে অবস্থিত নয় যে, কাজের লোক এখানে সকাল-সন্ধ্যা এসে আড্ডা দেবে। তা হলে কাজকর্ম ফেলে ডক

ডোনাল্ডের রিংস্টোনে ছুটে আসার মানে কী?

ব্যাটউয়িং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সিঁড়ি। সেলুন গমগম করছে। প্রথমেই জেট ম্যাডনের সঙ্গে চোখাচোখি। গোমড়া মুখে ভেঙুচি কাটল মাস্তান, চোখ নামাবার আগে একটা মিষ্টি হাসি উপহার পেল সিঁড়ির কাছ থেকে। তবে খুব একটা আপ্যায়িত মনে হলো না লোকটাকে। একটু পরে বেরিয়ে গেল।

বারটেণ্ডার স্বাগত জানাল ওকে। বোতল আর গ্লাস এনে দিল। এক পলক তাকিয়ে রইল সিঁড়ির মাথায় বাঁধা ব্যাণ্ডেজের দিকে। ফিসফিস করল, ‘ডানদিকের শেষ টেবিলের দু’জন। সন্ধে থেকে মদ খাচ্ছে। একটু আগে বড়াই করেছে একজনকে খতম করেছে বলে। পেটে পানি পড়তে টগবগ করতে শুরু করেছে

‘কারা এরা?’

‘এইচ-বার।’

‘আমাকে বলছ কেন?’

‘তোমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ...আর জেনকে পছন্দ করি তাই। তুমি ওখানে কাজ নিয়েছ। ডক ডোনাল্ড এসে কাঁদুনি গেয়ে গেছে শেরিফের কাছে। জেন অস্টিন হয়তো তোমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ সরে গেল বারটেণ্ডার।

আচমকা যেন পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি। এরই মধ্যে এত কিছু ভেবে ফেলেছে ফোরম্যান! লোকটা পাগল না মাথা খারাপ? শেষটার সম্ভাবনাই বেশি। পাগলকে নিয়ে ভয় নেই মাথা খারাপকে নিয়েই সমস্যা। কখন কী করে ফেলে ঠিক নেই।

আপাতত ফোরম্যানকে একপাশে ঠেলে রাখল ও। বারটেণ্ডার যে দু’জনের কথা বলেছে, তাদের দিকে মনোযোগ দিল বারটেণ্ডার একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে ওকে। সূত্রটা নিয়ে খেল যায়।

লোকগুলোর দিকে তাকাল ও। জাত চিনতে খুব একটা কষ্ট

হচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, সাধারণ নির্বিরোধী কাউহ্যাণ্ড এরা নয়।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে লোকদুটোকে দেখছে সিভ। সন্ধে থেকেই টানছে মনে হয়। টইটমুর অবস্থা, দু'জনেরই। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিভ ওদের ওপর। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ নামাচ্ছে না।

লোকদুটোকে আগে কখনও দেখেনি। তারাও নিশ্চয় দেখেনি তাকে। তা হলে ওরা কাকে অ্যামবুশ করতে হবে, সেটা জানল কীভাবে? প্রশ্নটার জবাব ওদের মুখ থেকেই বের করতে হবে।

অবাক হয়ে একটা জিনিস খেয়াল করল সিভ। লোকদুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কিন্তু একবারও তাকে দেখছে না। সিভ আগ্রাণ চেষ্টা করছে ওদের চোখে পড়ার জন্যে। কিন্তু একবারের জন্যে সফল হলো না চেষ্টা।

বুঝতে পারল, লোকদুটোর চোখ ইচ্ছে করেই ওর ওপর পড়তে চাইছে না। সম্ভবত ও ঢোকান সস্পে সস্পেই ওকে দেখেছে এবং ঘাবড়ে গেছে। দ্বিতীয়বার তাকানোর ঝুঁকি নিচ্ছে না তাই।

একটু পরে চেয়ার ছাড়ল দু'জনেই। এই প্রথম একজন সিভের চোখে চোখ রাখল। পরক্ষণেই নামিয়ে নিল। বার টেবিলের সামনে এসে কয়েকটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যেতে ফের কাছে এল বারটেণ্ডার। 'সিভ, ডক ডোনাল্ডকে সপ্তাহে একদিনের বেশি শহরে আসতে আমি খুব কমই দেখেছি। আজ দু'বার এসেছে ও। একবার সকালে, আরেকবার সন্দের আগে। কথা বলেছে শেরিফের সঙ্গে।' খালি গ্লাস আর বোতল তুলে নিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে দিল। 'আর এক গ্লাস চাই?'

'না, ধন্যবাদ। শেরিফ বোধহয়...'

বলতে না বলতে ব্যাটউয়িং ডোর ঠেলে ঢুকল একজন। 'হ্যাঁ, ওই তো। শেরিফ।' বলেই গ্লাস আর বোতল নিয়ে বারের দিকে

চলে গেল রিপ।

‘সিঁভ রাসেল,’ টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ইন্সম্যান। হাতে একটা শটগান। ‘তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তুমি...’

‘দু’জন লোককে অ্যামবুশ করে মারার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভুল করে গুলিটা নিজের মাথার দিকে ছুঁড়েছি...এবং কাজটা ঠিকমত করতে না পেরে এখন ডাক্তারের কাছে এসে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়েছি। এটাই তো?’

আচমকা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল বারটেগারের গলা। ‘শেরিফ, অভিযোগ দেখছি তোমার আগে তোমার আসামি নিজেই বলে দিচ্ছে।’

‘আইনের লোককে নিয়ে ঠাটা করাটাও বেআইনি, রিপ। চোখ রাঙাল শেরিফ। ‘কথাটা তোমার জানা থাকা উচিত।’ আবার তাকাল সিঁভের দিকে। ‘তোমাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার করতে এসেছি আমি।’

‘তাই?’ ঋজু ভঙ্গিতে চেয়ারে বসেছিল সিঁভ। এবার হেলান দিল। ‘কাকে আবার অপহরণ করলাম?’

‘টম অস্টিনকে। আজ বিকেল বেলায়। টমের ঘোড়াটা খালি পিঠে ফিরে গেছে র‍্যাঞ্জে। তুমি সকালে বেরিয়েছিলে। আর ফিরে যাওনি। জেন অস্টিন এজন্যে তোমাকে সন্দেহ করছে।’

ধাক্কার মত খেল সিঁভ। ‘টমকে অপহরণ করা হয়েছে? কেন?’

‘সেটা তুমি বলবে।’

‘জেন অস্টিন আমাকে সন্দেহ করছে জানলে কীভাবে? ও কি তোমার কাছে বলতে এসেছিল? কখন?’

‘হ্যাঁ...মানে, না।’ জবাব দিতে গিয়ে একটু থমকাল শেরিফ। ‘ডক এসেছিল। ডককে নিজের সন্দেহের কথা বলেছে মেয়েটা। উঠে দাঁড়াও। তোমার গানবেল্ট খুলে টেবিলের ওপর রাখো।’

ওটার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না অভিযুক্তের মধ্যে। শেরিফের চোখে চোখ রেখে হাসল। ‘তুমি প্রথমে বললে অপহরণের অভিযোগে আর এখন বলছ সন্দেহে। দুটো বিষয় কি এক, শেরিফ? তুমিই ভেবে দেখো।’

‘কী বলতে চাও তুমি?’

‘আমার সন্দেহ ফোরম্যান ডক ডোনাল্ড টমকে অপহরণ করেছে, তুমি তাকে গ্রেফতার করবে?’

‘দেখো, মিস্টার!’ বাজখাঁই গলায় চৈঁচিয়ে উঠল শেরিফ। ‘ধানাইপানাইয়ে কাজ হবে না। তোমাকে আমি গ্রেফতার করলাম। কিছু বলতে হলে জাজকে বলবে।’

‘বেশ,’ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল সিটভ। বসে রইল।

‘প্রথমে তোমার গানবেল্ট খুলে টেবিলের ওপর রাখো। তারপর...সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দু’হাত...’

‘দেখো, শেরিফ, আমি কিছুই করছি না।’ তোমার সাধ্যে কুলালে আমাকে গ্রেফতার করো।’ পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল কাউবয়। উপলব্ধি করতে পারছে শেরিফ। ওকে এখন তার গ্রেফতার করাই উচিত। নইলে সেলুনভর্তি এতগুলো লোকের কাছে একেবারে খেলো হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে ওকে গ্রেফতারের কোনও অজুহাতই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শটগান হাতে নিয়ে টম অস্টিনকে অপহরণের কথা বললে ভেবেছিল লোকটা ভড়কে যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে...

‘শটগানটা নামাও, শেরিফ। যেভাবে নার্ভাস হয়ে গেছ, ভয় পাচ্ছি, কখন না জানি ওটার ঘোড়ায় চাপ দিয়ে বসো। সেরকম হলে, তোমার শেরিফগিরি তোমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পারবে না। সবাই বলবে, বিনা উসকানিতে একজন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছ তুমি। সবাই স্বাক্ষর দেবে। কী রিপ, দেবে না?’ বারটেগারের দিকে মাথা ঘোরাল সিটভ।

‘হ্যাঁ, শেরিফ, ও কিন্তু ঠিকই বলেছে। শুধু সন্দেহবশে তুমি কাউকে গ্রেফতার করতে পারো না,’ বলল বারকিপার। ‘তা ছাড়া সন্দেহকারী নিজে তোমার কাছে এসে সন্দেহের কথা বলেনি। আরেকজনের কথায় তুমি নেচে উঠেছ। এটা কোনও আইনেই গ্রহণযোগ্য নয়।’

চুপচাপ শটগানটা নামিয়ে নিল শেরিফ। ওর পরিকল্পনাটা স্রেফ মাঠে মারা গেছে। লোকটা ওকে পাত্তাই দেয়নি। এমনকী ওর চোখের একটি পাতাও কাঁপতে দেখেনি। তবে মুখের জোর হারাল না। ‘বেশ। আজ বেঁচে গেলে। কিন্তু কাল আর বাঁচতে পারবে না। দেখো, যেন পালাতে চেষ্টা করো না। সে ক্ষেত্রে তোমাকে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে শেরিফ ইন্সম্যান।’

‘নাহ!’ হেসে উঠল সিড। ‘ভেবেছিলাম তুমি একটা খচ্চর। এখন দেখছি তাও নয়। তুমি একটা নিরেট গাধা। ব্যাংকে আমার তিন হাজার ডলার জমা আছে। কী করে ভাবলে যে, টাকাটা ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যাব?’

‘হ্যাঁ, সেটা আমি জানি। তাই এ-যাত্রা গ্রেফতার থেকে বাঁচলে। ওই টাকা তোমার জামিন হয়ে কাজ করবে।’

‘জানো? কী করে, শেরিফ? ফ্রেড রবিনসন তো আমাকে বলেছিল, ক্লায়েন্টের সব ধরনের গোপনীয়তা পাওয়ার অধিকার আছে ওর ব্যাংকে।’

ওর কথা না শোনার ভান করল শেরিফ। বারটেগারকে ডেকে সেলুনের সবাইকে বিয়ার দিতে বলল। জনসাধারণকে মুফতে মদ খাইয়ে তাদের কাছে নিজের ওজন বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে বেচারী।

সতেরো

কিছুই বুঝতে পারছে না জেন। গতকাল সন্ধে থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটছে, সব যেন স্বপ্নের মধ্যেই। ওর মনে হচ্ছে একটা লম্বা দুঃস্বপ্ন দেখছে সে, যে দুঃস্বপ্নে ও বসে আছে একটা অন্ধকার ঘরে, হাত-পা বাঁধা আর মুখে নোংরা কাপড় ঠাসা অবস্থায়। আর ওর পায়ের কাছে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে টম। তারও হাত-পা বাঁধা। মুখ বাঁধা আরেকটা নোংরা রুমাল দিয়ে। একটু আগে ছেলেটাকে প্রচণ্ড মার মেরেছে একটা লোক। ওর সামনেই। ভাইকে চোখের সামনে মার খেতে দেখেও কিছু করতে পারেনি জেন। কেবল চোখ দিয়ে আগুন ঝরিয়েছে। টমের অপরাধ, ওর বোনকে এভাবে বেঁধে এনেছে দেখে রাগ সামলাতে পারেনি। তখনও হাত-পা খোলাই ছিল ওর। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাহারাদার লোকটার ওপর। ষণ্ডামার্কী লোকটা ওকে ইচ্ছেমত পিটিয়েছে। তারপর হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে ওর সামনেই।

কাল সন্ধের পরে টমের ঞ্জলাকে খালি পিঠে র‍্যাপ্পে ফিরতে দেখে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ওর। কাউবয়রা র‍্যাপ্পে ফিরতে ও তাদের খবরটা জানায়। সবাই ছিল, কেবল স্টিভ রাসেল ছাড়া। লোকটাকে সকাল বেলা লুমের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল। কিন্তু দুপুরের দিকে লুম একা ফিরে এসেছে, লোকটা আসেনি।

টম কোথায় গেল ভেবে যখন সে অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন

এসেছে ফোরম্যান ডক ডোনাল্ড। সরাসরি বলে বসল, তার ধারণা, নতুন লোকটাই টমের গায়েব হয়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী। সে-ই ছেলেটাকে গায়েব করে ফেলেছে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে।

কথাটা বিশ্বাস হয়নি জেনের। নতুন লোকটা কেন টমকে অপহরণ করবে, জানতে চেয়েছিল ফোরম্যানের কাছে। ফোরম্যান সরাসরি বলেছে, সে জানে না। তবে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, যেখানে এতদিন কোথাও কিছু হয়নি, সেখানে নতুন লোকটা আসতে না আসতে কেন এ ঘটনা ঘটল। কে না জানে, বার-বি'র ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী টম অস্টিন। তাকে সরিয়ে দিতে পারলে কী ঘটবে, সেটা সবাই হিসেব না করলেও কেউ না কেউ তো ভাবতে পারে। স্টিভ রাসেল নামের লোকটা যে সেরকম কিছু ভাবেনি, কে বলতে পারে। তা ছাড়া লোকটা নিজেও হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল কেন? ডক তাকে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে বলল।

ফোরম্যানের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যায় জেন। কী বলছে লোকটা? কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও আশঙ্কার কথাও ভাবতে পারছিল না। সত্যি কি স্টিভ এই কাজটা করেছে?

রাতের বেলা অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি করা যাবে না, তাই ফোরম্যান তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিল। আশ্বাস দিয়েছিল, 'ম্যাম, সকাল বেলা আমাদের পুরো বাথান নেমে পড়বে টমের সন্ধানে। একই সঙ্গে স্টিভ রাসেলের সন্ধানও বের করব আমরা। যেখানেই থাকুক, এই তল্লাট ছেড়ে কোথাও যাবে না। ছেলেটাকে আটকে রেখে তোমার সঙ্গে দরাদরি শুরু করবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, পুরোটা র‍্যাঞ্চ ওর নামে লিখে দিতে বলবে সে তোমাকে। আমি জানি, তুমি এতে রাজি হবে না।'

একটু থেমেছে ফোরম্যান। তারপর ফের বলেছে, 'আমরা সকালে উঠেই টমের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। তোমার কাজ হলো রিংস্টোন গিয়ে শেরিফকে সব কিছু খুলে বলা। শেরিফ প্যাসি

নিয়ে বেরোবে। এ তল্লাটের অক্সিসক্সি সব ওর চেনা। স্টিভ রাসেল পালিয়ে থাকতে পারবে না।’

সবার সামনে নিজেকে স্থির রাখলেও নিজের বিছানায় শুয়ে আর সামলাতে পারেনি। অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়েছে জেন। ভাইয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় সারারাত চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ করতে পারেনি। শিউরে উঠেছে বারবার। কেউ যদি ওকে মেরে ফেলে!

ফোরম্যানের কথা অবাস্তব শোনাতেও একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারেনি সে।

আসলে কি সেটা হতে পারে না? স্টিভ রাসেল লোকটাকে ও কতটা চেনে? একসময় বার-বি’তে কাজ করেছিল। তারপর চলে গেছে। জেন সে-সময় র‍্যাঞ্জে ছিল না। তাই তাকে দেখেনি। আর টম ছিল নেহাত বাচ্চা মাত্র। এমনও হতে পারে, স্টিভ সব কিছু জেনে-শুনেই এখানে এসেছে। আগে বাবার চিঠি পেয়েও আসেনি। তারপর যেভাবেই হোক, বাবা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে মতলব ফেঁদে ছুটে এসেছে।

এটা ঠিক, স্টিভ রাসেল ওকে ম্যাডন নামের লম্পটটার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ও সেদিন যথাসময়ে হাজির না হলে ম্যাডন ওর চরম অবমাননা করত। কিন্তু ঘটনাটা কি সাজানো হতে পারে না? এমনও তো হতে পারে, ম্যাডন টাকার বিনিময়ে মার খেয়েছে। স্টিভ রাসেল জেনের কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে বার-বি র‍্যাঞ্জে ঢুকতে চেয়েছে। কারণ যেভাবেই হোক, সে জেনেছে, বার-বি’র মালিক কাউকে বিশ্বাস করে না। নতুন কোনও লোককে কাজে নেয় না। তাই ওই মারপিটের নাটক। ম্যাডনের মত লোকদের টাকা দিলে তারা সব কিছুই করতে পারে।

যতই ভেবেছে, ততই ফোরম্যানের কথায় যুক্তি খুঁজে পেয়েছে জেন। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছে, তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মেছে, টমকে অপহরণের কাজটা স্টিভ রাসেলই করেছে। উদ্দেশ্য, ভাইকে অপহরণ করে বোনকে কজা করা। লোকটা রাতে র‍্যাঞ্চে ফেরেনি।

ব্রেকফাস্ট শেষ করেই ডক ডোনাল্ড লোকজন নিয়ে টমকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। একটু পরে জেনও বেরিয়েছিল শহরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আসতে চার-পাঁচজন লোক মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। তারপর চোখে-মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে এসেছে এই জায়গায়।

এখন আবার বিভ্রান্তিতে পড়েছে জেন কারা ওকে অপহরণ করল? স্টিভের লোকজন? কিন্তু মাত্র দু'দিন আগে এসে লোকটা এত বড় একটা দল পেল কোথায়? তা হলে কি সে নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল? সম্ভাবনাটা নিজেই নাকচ করে দিল। যারা ওকে ধরে নিয়ে এসেছে, তাদের কাজ দেখে মনে হয়েছে এ অঞ্চলের প্রতিটি জায়গা এদের পরিচিত। সবচেয়ে বড় কথা লোকগুলোর চেহারা দেখতে না পেলেও ওদের অবয়ব ও ভাবভঙ্গি কেন যেন পরিচিত ঠেকেছে ওর কাছে।

জেন বুঝতে পারছে না, ওদের ভাই-বোনকে কেন এরা ধরে এনেছে? সম্ভবত র‍্যাঞ্চটা কেড়ে নেয়ার জন্যে। হয়তো জোর করে বিক্রির দলিলে সই করিয়ে নেবে দু'জনের কাছ থেকেই। তারপর তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে। কোথায় যাবে জেন ভাইকে নিয়ে?

সকালে উঠে রিংস্টোন ছাড়ল স্টিভ। দুশ্চিন্তা বোধ করছে। টমকে যদি সত্যি সত্যিই অপহরণ করা হয়ে থাকে, তা হলে তার মূলে রয়েছে ডক ডোনাল্ড। এতে কোনও সন্দেহ নেই ওর।

তার এই ধারণার কারণও আছে। বার-বি'তে ওকে কাজে নেয়ার ঘোর বিরোধী ছিল ডক। এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে র‍্যাঞ্চমালিককে নিজের উদ্ভার কথা জানিয়েছে। কিন্তু ওর কথায়

পাত্তা দেয়নি মেয়েটা। তার ওপর ওর পরামর্শে রাউণ্ডআপও বন্ধ করে দেয়। তাতেও ক্ষুব্ধ হয়েছে ফোরম্যান। এটাই ভাবাচ্ছে সিঁভকে। ফোরম্যানের সঙ্গে ব্যাপ্ত পরিচালনার ব্যাপারে সব কিছুতেই যে মালিকের সঙ্গে মতের মিল হবে, তা নয়। তাতে ফোরম্যান হয়তো মনে মনে ক্ষুব্ধ হতে পারে। কিন্তু বার-বি ফোরম্যান যে আচরণ দেখিয়েছে, তা তার অসম্ভব নয়, বিকোভই প্রবণ করেছে। তার মানে কী দাঁড়াল? ব্যাপ্ত পরিচালনায় ডক ডোনাভের নিজস্ব মতামত থাকবে কেন? তা হলে কি ধরে নেয়া যায়, লোকটার নিজস্ব পরিকল্পনাও আছে?

জেন সুন্দরী, শিক্ষিতা। তরুণী। টম অস্টিন নাবালক মাত্র। এ অবস্থা দেখে প্রভাবশালী কর্মচারী যদি মালিকের প্রেমে পড়ে যায়, তা হলে আশ্চর্যের কী আছে? ডক যদি সে-ধরনের বেগনও স্বপ্ন দেখে থাকে, তা হলে তাতে বাদ সেধেছে সিঁভের এই হঠাৎ আগমন। সেটা বার-বি'র কাছে যতই প্রত্যাশিত হোক, ওর কাছে বাড়তি ঝামেলা।

লোকটার মধ্যে, সিঁভ যতটা বুঝেছে, কাউকে আকর্ষণ করার মত তেমন কোনও গুণ নেই। এ-ধরনের লোক নিজের সম্পর্কে তেমন ধারণা রাখে না। চলে আবেগের বশে। আচমকা বাধা পেলে হয় মিইয়ে যায়, নইলে ফুঁসে ওঠে। যারা ফুঁসে উঠতে চায়, তাদের নিয়েই বিপদ। ডক ডোনাভ ফুঁসে ওঠাদের দলে। মালিকের সঙ্গে মতান্তরের কারণে ওর প্রতিক্রিয়া থেকেই বুঝতে পেরেছে সিঁভ।

ঠিক কী ঘটতে শুরু করেছে, তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে সিঁভ। তবে ওর মনে একটা সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। টমকে ডক ডোনাভ 'অপহরণ' করেনি তো? বোনকে বাগে আনতে হলে ভাইকে অপহরণ করার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। গতকাল কেউ একজন তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে অ্যামবুশ

করে। সিঁভ রীতিমত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। এই দুটো কাজ একই সঙ্গে একজনেরই হতে পারে। হয় জব হাইওস, নইলে ডক ডোনাল্ড। দু'জনেরই করার মত মোক্ষম কারণ আছে। সিঁভকে সরিয়ে দিতে পারলে দু'জনেরই বাধা অপসারণ, আর টমকে অপহরণ করে জেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সিঁভ। আগে র‍্যাঞ্জে ফিরে যাওয়া দরকার। ওখানে জেনের সঙ্গে আলাপ করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে হবে। তবে, মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসে ও। টমকে যারা অপহরণ করেছে, ওদের সে খুঁজে বের করবেই। আর যদি ছেলেটার কোনও ক্ষতি কেউ করে থাকে, তা হলে ওকেও আর বেঁচে থাকতে দেবে না সে। পাঁচ বছর পরে দেখেও বাচ্চা ছেলেটা তাকে চিনতে পেরেছিল। আর ওর মুখে শিশুসুলভ হাসির মধ্যেও বন্ধুত্বের আভাস খুঁজে পেতে ভুল হয়নি ওর।

এক নাগাড়ে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। গতি বেশি বাড়াচ্ছে না সিঁভ। চিন্তা করছে। একসঙ্গে গাঁথার চেষ্টা করছে ঘটনাগুলো। জলাভূমির পাড় ঘেঁষে পাহাড়ের ভেতর ঢুকল ট্রেইল। দু'পাশে খাড়া পাহাড় রেখে সামনে এগিয়েছে আঁকাবাঁকা রাস্তা। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে বাঁকের পর বাঁক পেরোচ্ছে ঘোড়াটা।

আধঘণ্টা চলার পর ছোটখাট একটা বাঁক পেরোতে গিয়ে আচমকা রাশ টানল সিঁভ। সামনে বামদিকে ছোট একটা ট্রেইল। তীক্ষ্ণ চোখে সামনে তাকাল সিঁভ। তারপর দোল খেয়ে নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে জায়গাটা। বেশ কয়েকটা ঘোড়া যেন একই জায়গায় একসঙ্গেই আঙুপিছু করেছে। বেশ কিছু বুটের ছাপও আছে। প্রায় সবগুলো ছাপই কম-বেশি একই মাপের। এর মধ্যে একজোড়া ছাপ দৃষ্টি কাড়ল ওর। অন্য ছাপগুলোর চেয়ে ছোট। মাঝে মাঝে দু'একটা ছাপ হড়কে গেছে।

মনে হচ্ছে ছোট ছাপঅলা পায়ের মালিককে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নেয়া হয়েছে। ছাপগুলো উঠে গেছে বামদিকে রাস্তার দিকে। মূল রাস্তার চেয়ে সামান্য উঁচু ওটা। ঘোড়া এবং বুটের ছাপগুলো ঘণ্টাখানেক আগের মাত্র। ঘণ্টাখানেক আগেই এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। কয়েকজন মিলে একটা ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে কোথাও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে।

র্যাঞ্জে ফেরার সিদ্ধান্ত পাল্টাল সিঁড়ি। পুরো ব্যাপারটা মাথায় একটা পরিকল্পিত ছকের মত গেঁথে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। ছোট ছাপঅলা পায়ের মালিক যে জেন অস্টিন, বুঝতে বাকি রইল না ওর। ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেয়েটাকে। সম্ভবত ভোরে উঠেই শহরের দিকে যাচ্ছিল জেন ভাইয়ের নিখোঁজের ব্যাপারটা শেরিফকে জানাতে। এ পর্যন্ত আসতে ওকে আটকে ফেলেছে ডক ডোনাল্ডের লোকেরা। ধরে নিয়ে গেছে যেখানে সেখানে টমও আছে অবশ্যই। ভাই-বোন দু'জনের ওপরই অত্যাচার চালাবে নিজেদের ইচ্ছে পূরণের জন্যে।

সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার একপাশে উবু হয়ে বসল সিঁড়ি। পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবছে। অপহরণকারী যারাই হোক, লোকবল নেহাত কম নয়। আট-দশজনের মত হবে। টম আর জেনকে এদের হাত থেকে উদ্ধার করতে গেলে প্রচণ্ড বাধা দেবে ওরা। চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হবে ওকে। কিন্তু সিঁড়ি একা। জায়গাটাও অচেনা। দু'চারজন হলে না হয় কথা ছিল।

জেরি-জ্যাব-লুম। কোথায় এরা? লুম বলেছিল, র্যাঞ্জে মালিকের জন্যে নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দেবে।

আচমকা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে কান খাড়া করল সিঁড়ি। বার-বি র্যাঞ্জের দিক থেকে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো। স্ট্যালিয়নটাকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা টিলার আড়ালে। চোখ রাখল রাস্তার ওপর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ল ঘোড়াগুলো। যা দেখে সিঁভ থেমে পড়েছিল, ঠিক তা-ই দেখে যেন ওরাও থেমে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল ট্রাকগুলো নিয়ে। বাকি দু'জন রাইফেল হাতে এদিক-ওদিক নজর রাখছে।

আড়াল থেকে জঙলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল সিঁভ তারপর উল্লসিত স্বরে ডাকল, 'লুম, জেরি, জ্যাব আমি আসছি গুলি কোরো না যেন।'

আঠারো

ডক ডোনাল্ডের ধারণা, ও একজন ভাল মানুষ। জীবনে খুব বেশি সুযোগ পায়নি। তবে ইচ্ছে করলে ডাকাত হতে পারত, গরুও চুরি করতে পারত ও। পশ্চিমে অনেকেই তো এসব করেছে। ডক ওসব 'পপে পা' বাড়ায়নি। বরং একটা সুযোগ খুঁজেছে। নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে কল্পনা করে এসেছে সব সময়। কিন্তু ত্রিশ ডলারের মাস-মাইনে দিয়ে ওই স্বপ্ন সফল হয় না। প্রতিষ্ঠিত হতে হলে বড় ব্যবসায়ী হতে হয়। নিদেনপক্ষে একটা র‍্যাঞ্চার মালিক তো বটেই।

একসময় সোনা খুঁজে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অতীরেই আবিষ্কার করেছে, সে-পথ ওর জন্যে নয়। তা ছাড়া সোনা পেয়ে বড়লোক হয়েছে, এমন মানুষের দেখাও এ পর্যন্ত পায়নি সে।

ওর বয়স এখন ত্রিশ। পনেরো বছর পর্যন্ত টেনেসিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ছিল। ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করত বাবা। বড় এক বোনসহ চারজনের সংসারটা চলত কষ্টেসৃষ্টে। ছয়-সাত বছর বয়স থেকে বাবা তাকে কাজ শেখাতে চেয়েছে। কিন্তু রাঁদা ঘষা আর হাতুড়ি-বাটাল নিয়ে ঠুক ঠুক করাটাকে ঘৃণা করত ডক। বাবার ভয়ে বছর দুয়েক তার সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করলেও পরে আর ধারে-কাছেও যেত না। বার কয়েক মারধর করে বাঁগে আনতে না পেরে শেষে হাল ছেড়ে দেয় বাবা রক ডোনাল্ড।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করত বাবা। তবে খুব বেশি টাকা আসত না তাতে। ছোটবেলা থেকে আবদার করে অনেক কিছু না পেয়ে পেয়ে বাবা-মার প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা জেগে গিয়েছিল ওর মনে। সমবয়সীদের কাছে ভাল কিছু দেখলে সেটা নিজেরও পেতে মন চাইত। বাবা দিতে পারত না। উল্টো মার লাগাত।

ডকের বয়স যখন চোদ্দ, বড় বোন একদিন পাশের বাড়ির এক ছোকরার হাত ধরে পালাল। বছর খানেক পরে ডক নিজেও ঘর ছাড়ল।

এর পরের জীবনটা নিয়ে এখন আর ভাবতে চায় না ডক। মোট কথা, বেঁচে থাকার জন্যে এমন কাজ নেই, যা তাকে করতে হয়নি। একবার ভিক্ষে করার চেষ্টাও করেছিল। তবে পাত্তা না পেয়ে ফের কাজ করার দিকে মন দিতে হয়েছে। বুঝে গেছে, নিজের ঘরে কাজ না করে বাবা-মার গালাগাল কিংবা মারধর খেয়েও শেষ পর্যন্ত উপোস থাকতে হত না। কিন্তু বাইরে সে সুবিধে নেই। বাইরে কাজ না করলে কেউ তোমাকে গালাগাল করবে না, ঠিক আছে, কিন্তু মুফতে খেতেও দেবে না।

বিশ বছর বয়সে একদল স্বর্ণসন্ধানীর সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গিয়েছিল ডক। এক বুড়ো স্প্যানিশের সঙ্গে বালি ছেঁকে

বেড়িয়েছে বছর দুয়েক। সোনা যে একদম পায়নি, তা নয়। তবে দু'জনের খাওয়া-পরাতেই তা লেগে যেত। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়ার মত অটেল সোনা পাওয়া যায়নি। সোনার গুঁড়ো দিয়ে মদ-মাংস আর শহরে গেলে ফুর্তির রসদ জোগাত।

কিন্তু তাতে পেট চললেও মন ভরেনি ডকের। অনেক টাকা উপার্জন করে রাতারাতি ধনী বনে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু সেটা কীভাবে কামাই করতে হয়, সেটাই বুঝতে পারত না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে সোনা খোঁজার কাজ বাদ দিয়ে র্যাঞ্ঝের চাকরি নেয়। এখানে অবশ্য একটা বাঁধা আয়ের মুখ দেখতে পেল সে। ভাল কাজ দেখিয়ে একদিন ফোরম্যান হয়ে গেল।

এখানে-ওখানে র্যাঞ্ঝের কাজ করেছে ডক। নিয়মিত বেতন পেয়েছে। কিন্তু সেটার পরিমাণ এত কম যে, ওই টাকা দিয়ে ধনী হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

বছর দুয়েক আগে বার-বি'তে যোগ দেয় ডক। ওমাহায় গরুর চালান নিয়ে গিয়েছিল বব। ওখানে পরিচয় হয় তার সঙ্গে। ঠিক এসময় বার-বি'র আগের ফোরম্যান বিদায় হয়ে গিয়েছিল। বব তাকে চাকরির অফার দিলে লুফে নেয় সে। আগের মালিকের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে-ও তখন চাকরি খুঁজছিল।

অনেক ধরনের কাজ করতে হয়েছে ওকে। তবে র্যাঞ্ঝের কাজ করতে গিয়ে দেখেছে, এই কাজটা সে উপভোগই করে। নিজের একটা র্যাঞ্ঝের স্বপ্ন তখনই তাকে পেয়ে বসে। তবে এটাও বুঝতে পেরেছে, সে যে-টাকা বেতন পায়, তা দিয়ে র্যাঞ্ঝ গড়ে তোলার মত সামর্থ্য তার কখনও হবে না। বব অস্টিন অ্যামবুশে নিহত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে সম্ভাবনাটা চোখে পড়তে থাকে তার। বিশেষ করে জেন অস্টিনের ওপর যখন র্যাঞ্ঝ বিক্রি করে দেয়ার জন্যে নানামুখী চাপ আসতে থাকে, সম্ভাবনাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে জেনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার সিদ্ধান্ত

নেয় ও। জানে, ওকে ছাড়া মেয়েটা আর এক পা-ও এগোতে পারবে না। নিজের স্বার্থেই বার-বি'র হয়ে লড়াই করতে নিজের মত করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। জেনকে বিয়ে করে এই র‍্যাঞ্চার মালিক হয়ে বসাটা তার কাছে খুব বেশি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু মাঝখান থেকে সিটভ রাসেল নামের ওই হতচ্ছাড়া লোকটা এসে ওর হিসেবে গোলমাল করে দিল।

জেন অস্টিন ওকে রীতিমত অবহেলা করতে শুরু করল। কিন্তু এটা একটা সুযোগ। এমন সুযোগ খুঁজে আসছে সে বছরের পর বছর ধরে। কোথাকার কোন্ সিটভ রাসেল এসে সে সুযোগ নষ্ট করে দেবে, ডক তা কিছুতে মেনে নেবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে পরিকল্পনাটা করেছে সে। টমকে অপহরণ ছিল সে পরিকল্পনার প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশ হলো জেনকে ধরে নিয়ে যাওয়া। ওর বিশ্বাস, ভাইকে বাঁচাবার জন্যে যে-কোনও প্রস্তাবে রাজি হবে জেন। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনে হলো, এত বড় একটা ব্যাপার সামাল দেয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না।

এরপর শেরিফের মাধ্যমে জব হাইওসের সঙ্গে যোগাযোগ হতেই ব্যাপারটা পানির মত সহজ হয়ে গেল। জব হাইওস ওকে প্রস্তাব দিল, পশ্চিমের পাহাড়ের গাছগুলো কেটে নিতে দিলে ডক যাতে বার-বি র‍্যাঞ্চার মালিক হতে পারে সেটা সে-ই দেখবে।

‘আর সিটভ রাসেল? ও এখানে একা একজন। ওকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়াটা কোনও ব্যাপার না।’

স্ট্যাম্প লাগানো একটা সাদা কাগজ বের করল জব পকেট থেকে। বিছিয়ে দিল জেনের সামনে। ‘ওনেছি পুবে থেকে তুমি অনেক নাকি লেখাপড়া শিখেছ,’ বলল হাসিমুখে। ‘আশা করছি, এখানকার পরিবেশ ভাল করে বোঝার মত বুদ্ধিও তোমার

আছে এটা একটা দলিল। এখানে একটা সহি করে দাও নইলে...বুঝতেই পারছ, তুমি একা মেয়েমানুষ। আর আমার লোকজন সব ছেলেপিলের দল ঘরের বাইরে ইঙ্গিত করল। 'ওরা খুশিই হবে। তা ছাড়া, তোমার ভাইয়ের দিকটাও তো আছে। তুমি নিশ্চয় ওর কান্না সহ্য করতে পারবে না কী বলো? পারবে নাকি?'

ঘরের ভেতর ডক ডোনাল্ডও আছে আগুন চোখে নিজের ফোরম্যানের দিকে চাইছে জেন। তা হলে এটাই ছিল ডক ডোনাল্ডের উদ্দেশ্য? এজন্যেই স্টিভ রাসেলকে কাজে নেয়ার পর এভাবে খেপে গিয়েছিল ফোরম্যান? আশ্চর্য! লোকটার মনের ভাব ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সে। ওরই ষড়যন্ত্রে প্রথমে টমকে অপহরণ করা হয়। দোষ চাপানো হয় স্টিভের ওপর। তারপর তাকেও অপহরণ করে নিয়ে আসার জন্যে শেরিফের কাছে পাঠানোর নামে র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে আনা হয় পথে ওর লোকেরাই ওকে ধরে নিয়ে আসে। ব্যাঙনা দিয়ে মুখ ঢাকা লোকগুলোকে তাই এত পরিচিত মনে হয়েছিল। অপহরণকারীরা আসলে ওরই র‍্যাঞ্চের কর্মচারী।

ডক ওর দিকে তাকাতে পারছে না। আর একদিকে চেয়ে আছে। জানে এখানে ওর করার ভেমন কিছু নেই। যা করার জব নিজেই করবে ডক র‍্যাঞ্চটা চায়। তাই বলে জেনকে বঞ্চিত করার ইচ্ছেও ওর নেই। বার-বি র‍্যাঞ্চে তার পাশে সবচেয়ে ভাল মানাবে জেন অস্টিনকেই। ছেলেটাকে সে পুবে পাঠিয়ে দেবে ওখানে বড় হবে। পশ্চিমের এই নোংরা জগতে ওকে রাখা ঠিক হবে না।

বিপদ টের পেতে দেরি হলো না জেনের। বুকে গেছে র‍্যাঞ্চটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যেই ফোরম্যান এই বদমতলব করেছে। এখন সে আর টম ওদের হাতের পুতুল। এই

লোকটা সম্ভবত জব হাইগুস। জেন তাকে কখনও মুখোমুখি দেখেনি। তবে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ডক ডোনাল্ড একজন মহা-অপদার্থ লোক। এমন একটা কাজ একা করার সাহস পায়নি। কিন্তু যার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, সেটাই হয়তো তার গলায় ফাঁস হয়ে এঁটে বসতে পারে। জেনের মনে হলো, ডক ডোনাল্ডের মত অপদার্থের সঙ্গে শেয়ারে কাজ করার মানুষ জব হাইগুস নয়।

মনের ভেতর ভয় আর আতঙ্ক অস্থির করে তুলেছে ওকে। এরা তাদের দু'ভাই-বোনকে রিংস্টোনে থাকতে দেবে না। সম্ভবত দুনিয়া থেকেও সরিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে তার আগে সহায়-সম্পদ সব কেড়ে নেবে, এবং সেজন্যে যা-যা করার দরকার করবে। তাদের অপহরণ করার ধরন এবং পরের আচরণ থেকেই আঁচ করা যাচ্ছে। তবে ভয় পেলেও সেটা তাদের জানান দেয়ার দরকার মনে করল না সে

আচ্ছা, এ মুহূর্তে সিঁড রাসেল কোথায়? গতকাল সকাল থেকে লোকটার দেখা নেই। লোকটা কি পালিয়ে গেছে?

শেষ পর্যন্ত কী হবে, জানে না জেন। তবে লোকগুলোর কাছে সহজে নতিস্বীকার না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। হঠাৎ মুখের ভাব পাল্টে ফেলল ও। করুণ চোখে তাকাল ডকের দিকে। 'এই কাজটা তুমি কেন করলে, ডক? শুধু শুধু নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারলে? বার-বি র‍্যাঞ্চার ফোরম্যান তুমি। শক্ত-সমর্থ সুদর্শন পুরুষ। আর আমি একজন অসহায় নারী, সঙ্গে একজন বাচ্চা ছেলে। আমি তো তোমার মুখ চেয়েই র‍্যাঞ্চ না বেচে দিয়ে এখানে থিতু হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এভাবে তুমি আমার স্বপ্ন ভেঙে দিলে?'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল ডক। 'কী বলছ?'

'এই লোকটা কে?' তীক্ষ্ণ স্বরে চঁচিয়ে উঠল জেন। 'ও কী

করে তোমার আর আমার মাঝখানে আসে? সে কী করে তোমার সামনে আমার ওপর হস্তিত্ব করে? সে কে যে আমার কাছ থেকে ফাঁকা দলিলে সই নেয়ার কথা বলে? তুমি এসব দেখেও চুপ করে আছ? বুঝতে পারছ না, ফাঁকা দলিলে সই দিলে তুমি-আমি কেউই ওর কাছ থেকে কানাকড়িও পাব না। পুরো র‍্যাঞ্চই ও গাপ করে দেবে?’

চমকে উঠল জব হাইগুস। মেয়েটা যা বলেছে, ঠিক সেরকমই ভেবেছে সে। উটকো লোক দিয়ে হুমকি-ধামকি পাঠিয়েছে, ম্যাডনকে লেলিয়ে দিয়েছে পেছনে। কিন্তু তাই বলে অস্টিনের ছেলেমেয়েকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত হয়তো সে নিতে পারত না। সে বরং আরও সূক্ষ্ম কোনও চাল চালত। কারণ তার কোনও তাড়াহুড়ো ছিল না। আস্তে আস্তে চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে মেয়েটা একসময় ভেঙে পড়ত। ফ্রেড রবিনসনকে দিয়ে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল পরিস্থিতি।

কিন্তু শেরিফের মুখে বার-বি ফোরম্যানের মনোভাব এবং অস্থিরতার খবর জানতে পেরে পরিস্থিতিকে দ্রুত নিজের অনুকূলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। এতে বরং সুবিধেটাই চোখে পড়েছিল ওর। মাছ ধরতে গিয়ে পানি না ছোঁয়ার মত। অস্টিনের ছেলেমেয়েকে অপহরণের দায় ডক ডোনাল্ডের কাঁধে তুলে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করে নেয়া। আশ্চর্য! পুবে বড় হওয়া আনাড়ি একটা মেয়ে সেটা বুঝে ফেলল কী করে? অথচ ডক ডোনাল্ডের মত একজন বুড়ো খাড়ির মাথায় তা আসেনি?

ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছে সে। আরেকটু পরেই শেরিফ মর্ট ইন্সম্যান এসে নারী ও শিশু অপহরণের দায়ে গ্রেফতার করবে ডোনাল্ডকে। তবে তাকে বিচারের মুখোমুখি করার অবকাশ পাবে না। তার আগে শহরের লোকজন খেপে উঠে শেরিফের হেফাজত থেকে কেড়ে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে লোকটাকে। আর এদিকে

র্যাঞ্চ বিক্রির পাকা দলিল দেখিয়ে অস্টিনের ছেলেমেয়েকে রিংস্টোন ছাড়া করবে। তারপর ওরা যাওয়ার পথে কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে!

সব কিছু পাকা করে রেখেছে জব। কোনও খুঁত নেই তার পরিকল্পনায়।

মনে মনে সম্ভ্রষ্ট বোধ করছে। অস্টিনের মেয়ে তার ফোরম্যানকে বকাঝকা করে নিজের অজান্তেই ওর কাজটাকে আরেকটু সহজ করে দিচ্ছে। শেরিফ এখনও আসেনি। আসতে দেরি করছে লোকটা। সমস্যা নেই। ঘরের বাইরে দু'জন লোক আছে পাহারায়। ডোনাল্ডের লোক। কিন্তু এদের ওপর নজর রাখছে ওর নিজের লোকেরা। জব হাইওস কাঁচা কাজ করে না। যা করে ভেবেচিন্তেই।

অবশ্য একটা ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছে। গতকাল স্টিভ নামের যে-লোকটাকে অ্যামবুশ করে হত্যা করতে পাঠিয়েছিল, তারা এখনও রিপোর্ট করেনি। তবে আশা করছে, প্যাট আর রস সফল হয়েছে। দু'জনে মিলে একজন লোককে আড়াল থেকে গুলি করে মারতে না পারাটাই অস্বাভাবিক। লোকগুলো মদ খেতে পছন্দ করে। সম্ভবত পড়ে আছে রিপের সেলুনে।

ডক ডোনাল্ডের মনে সন্দেহের বীজটি ভাল করেই ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে জেন। জেনের সামনে রাখা ফাঁকা দলিলটা ছোঁ মেরে তুলে নিল সে নিজের হাতে। 'যিগুর কিরে, ও ঠিকই বলেছে, জব। তুমি আগে দলিলে সব কথা লিখে নাও তারপর সই।'

দারুণ মর্মান্ত হওয়ার ভান করল জব। 'সে কী, ডক? তুমি জানো না, দলিলে কী লেখা হবে? জানোই তো সব। র্যাঞ্চটা তোমার নামে থাকবে। আমি তোমাকে সে-ব্যাপারেই সাহায্য করছি। বিনিময়ে তুমি পশ্চিমের পাহাড় থেকে আমাকে চাইলেই

গাছ কাটতে দেবে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। সেরকমই কথা। কিন্তু সেটা আগে দলিলে উল্লেখ করে তার পরেই সই। জেন ফাঁকা দলিলে সাইন করে দিলে তুমি সব তোমার নিজের নামে লিখে নেবে আমাকে কিছুই দেবে না। আশ্চর্য! আমি এত বোকা। এই সাধারণ কথাটা মাথায় খেলেনি।’ জেনের দিকে চাইল। ‘ধন্যবাদ, জেন। তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী। আ...আমি বুদ্ধিমান মেয়েই পছন্দ করি।’

‘আই, মেয়ে!’ বাজখাঁই গলায় চেষ্টিয়ে উঠল জব জেনের উদ্দেশে। ‘তুমি আগে দলিলে সই করো, নয়তো...আমার লোকদের হাতে ছেড়ে দেব তোমাকে। কই, ওর কাছ থেকে কাগজটা নাও।’

‘ওকে ধমকে লাভ নেই, জব।’ হাসল ডক। ‘তুমি আগে দলিলে কী-কী লেখা থাকবে তা উল্লেখ করো। নইলে কোনও দলিলপত্র সই হবে না। তুমি বরং চলে যাও। আমরা আমাদের মত নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেব। কী বলো, জেন? তাই না?’

উনিশ

সকাল বেলাতেই শহর ছেড়েছে শেরিফ মর্ট ইন্সম্যান। গন্তব্য মাইল পাঁচেক দূরের ফক্স ট্রেইল নামের ছোট একটি ক্যানিয়ন। কাল রাতে এইচ-বারের মালিক জব হাইওস লোক পাঠিয়েছিল।

ওখানে আজ সকালে একটা দলিলে সই হবে। সই করবে বার-বি'র মালিক জেন অস্টিন। সেখানে সাক্ষী হতে হবে শেরিফকে। মনে মনে হাসল মর্ট। ওকে সাক্ষী হবার জন্যে ডেকে একটা ভাল বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে র‍্যাধগর। আইনের লোক সাক্ষী থাকলে একটা ভুয়া দলিলও গুরুত্ব পায় বৈকি!

দলিলটা সই হয়ে গেলে কী হবে, বোঝে মর্ট। অস্টিনরা এখান থেকে চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে, আর জব হাইগুস হয়ে যাবে দুটো বড় বড় র‍্যাধগর মালিক। এতে শেরিফের নিজেরও লাভ আছে। হাইগুস বলেছে, অস্টিনদের র‍্যাধগর মালিকানায় তাকেও একটি অংশ দেয়া হবে। এর মানে হলো রিংস্টোনের শেরিফ মর্ট ইন্সম্যানের নিজেরও একটা ঠিকানা হয়ে যাবে। সত্যি বলতে কী, পশ্চিমে এখনও নিজের জন্যে সত্যিকার অর্থে একটা ঠাই করে উঠতে পারেনি মর্ট। জব হাইগুস রিংস্টোনের একজন প্রভাবশালী মানুষ। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে বড় একটা র‍্যাধগর মালিক হয়ে বসেছে। বুদ্ধিমান লোক। নিজের সম্পত্তি কী করে বাড়াতে হয়, সেটা বোঝে। অনেকদিন থেকে একটা চোখ রেখেছিল বার-বি'র ওপর। বব অস্টিন বেঁচে থাকতে খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। আততায়ীর হাতে লোকটার মারা যাওয়ার পর ওর কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। তরুণী মেয়েটা বাবার মৃত্যুর পর র‍্যাধগ চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। টাকা-পয়সা নেই। নতুন লোক রাখারও ক্ষমতা নেই। এদিকে ফোরম্যান টার্গেট করে বসে আছে মেয়েটি সহ পুরো র‍্যাধগটা গাপ করে দেয়ার জন্যে। সুতরাং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে র‍্যাধগর জব হাইগুস। আগে অবশ্য কিনতে চেয়েছিল গোঁয়ার মেয়েটা বারবার বলার পরও রাজি হয়নি। এখন বোধহয় র‍্যাধগটাই হারাতে যাচ্ছে। জবের পাছে হাঁটলে লাভ হবে, বোঝে শেরিফ।

সুযোগটা হঠাৎ করেই এসে গেছে। স্টিভ রাসেল নামের লোকটাকে কাজে না নিলে এ সুযোগ তৈরি হত না। ঈর্ষাতুর ফোরম্যান নিজে এসে সুযোগটা তুলে দিয়েছে জব হাইওসের হাতে। ফোরম্যানের হাতেই তার মনিবকে অপহরণ করে নিজের কজায় নিয়ে নিয়েছে ও।

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে ইন্সম্যান এখন থেকেই। বার-বি'র শেয়ারটা হাতে পেলে শেরিফের চাকরি ছেড়ে দেবে। নিজের র‍্যাঞ্চার উন্নতির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে। এক পাল গরু কিনবে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে। দক্ষ আর বিশ্বস্ত দেখে সাত-আটজন লোক রাখবে। একটু উন্নতি হলে বিয়ে করবে বলেও ঠিক করে ফেলল সে। বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও ওই কাজটা করা হয়নি। সুবিধেমত মেয়ে পেতে হলে কিছু সহায়-সম্পত্তিও থাকতে হয়। এই কাজটা তাকে সে-সুবিধে দিচ্ছে।

গিরিপথ থেকে বামদিকে ঘোড়া ফেরাল মর্ট। সামনে এগিয়ে চলল। আরও কিছুদূর গেলে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে পথটা। বাঁকের মুখে যেতে শ'খানেক গজ দূরে ঘোড়ার পিঠে রাস্তায় দাঁড়ানো লোকটাকে দেখল মর্ট। আচমকা ঘোড়ার গতি কমাল শেরিফ। কে লোকটা? আস্তে আস্তে একটা হাত স্ক্যাবার্ডের দিকে বাড়াতে শুরু করল। চিনতে পেরেছে লোকটাকে। স্টিভ রাসেল। হাতে একটা রাইফেল।

‘উঁহু, ওদিকে হাত বাড়িয়ে না। তোমার হাত রাইফেলটা ছোঁয়ার আগেই স্রেফ গুঁড়িয়ে যাবে।’

স্ক্যাবার্ডের দিক থেকে হাত সরিয়ে নিল শেরিফ। কিছু বলতে যাবে, পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল। আরও তিনজন ঘোড়সওয়ার। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কারা এরা? আবার সামনের দিকে চাইল ও। এগিয়ে আসতে শুরু করেছে

সামনের ঘোড়সওয়ারও। এক মিনিটের মধ্যেই চারজন ঘোড়সওয়ার ঘিরে ফেলল ওকে।

‘কী চাও তোমরা?’ গলা কেঁপে উঠল ওর। ‘তোমরা জানো আমি কে? রিংস্টোনের শেরিফ।’

‘জানি তো, শেরিফ।’ টিটকারির ভঙ্গিতে হেসে উঠল সিঁভ। ‘সেজন্যেই তো তোমাকে ধরেছি।’

‘কী চাও?’

‘তোমার সঙ্গে যেতে চাই। তুমি আমাদের জব হাইণ্ডসের কাছে নিয়ে যাবে।’

‘কী আবোল-তাবোল বকছ?’ ধমকে উঠল শেরিফ। ‘জব হাইণ্ডসের কাছে যেতে চাইলে ওর র‍্যাঞ্জে যাও। এখানে কোথায় পাবে ওকে? পথ ছাড়ো বলছি।’

‘কিন্তু তুমি ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? ওদিকে তোমার কী কাজ?’

‘সেটা তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?’

‘দেখো, শেরিফ!’ এবার ভয়াল কণ্ঠে ধমকে উঠল সিঁভ। ‘আমি জানি, তুমি কোন্ কাজে শহর ছেড়ে এই জঙ্গলের পথে যাচ্ছ। চালাকি করে পার পাবে না। সোজা কথায় কাজ না হলে স্রেফ একটা গুলি খরচ করে এ জঙ্গলের ভেতর ফেলে যাব। কবর দেয়ার ঝামেলায়ও যাব না। শেয়াল-শকুনে খুবলে খাবে তোমার লাশ। আমরা জানি, অস্টিনদের ছেলে আর মেয়েটাকে অপহরণ করিয়েছে তোমার বস জব হাইণ্ডস। কী করে জানি সেটা তোমাকে বলার দরকার মনে করছি না। এখন জানলাম, এ অপকর্মে তোমারও হাত আছে। জব হাইণ্ডস তোমাকে র‍্যাঞ্জের ভাগ দেবে বলেছে। তাই তুমি...’

‘জাহান্নামে যাও তুমি, রাসেল। তুমি যদি...’

‘আস্তু, শেরিফ, আস্তু।’ পেছন থেকে ওকে শান্ত করার ভঙ্গিতে বলল জেরি। ‘সিঁভ তোমাকে মেরে ফেলবে বলেছে।’

কিন্তু আমরা ওর সঙ্গে একমত নই। ও যা করতে বলছে, সেটা না করে তোমার হাতে-পায়ে আর পেটে গুলি করে জঙ্গলের ভেতর ফেলে যাব। মানুষের টের পাবে না, কিন্তু শেয়ালের পাল গন্ধ পেয়ে ছুটে আসবে। জ্যান্ত অবস্থায় শেয়ালের পেটে যেতে না চাইলে যা বলছি, তা করবে তুমি।’

লোকগুলোর হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় দেখছে না শেরিফ। এরা মনে হয়, যা করবে বলছে তাই করবে। ব্যাপারটা কল্পনা করতেই আতঙ্কে শিউরে উঠল ও।

কী করবে, বুঝতে পারছে না জেন। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। জব হাইওস কিংবা ডক ডোনাল্ড কারও কাছেই নিরাপদ নয় ওর আর টেমের জীবন। এরা ওর কাছ থেকে দলিলে সই নিয়ে নেবে, তারপর...হরতো মেরে ফেলবে। আতঙ্কে হাত-পা যেন পেটের ভেতর সঁধিয়ে যাচ্ছে ওর টেমের দিকে চোখ পড়তে বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল। ভাইটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একটু আগে বলেছে, ‘সিস, ওরা যা চায় দিয়ে দাও। আমরা ব্যাপস চাই না। আমরা চলে যাব এখান থেকে। আর কক্ষনো আসব না।’

ভাইয়ের কথা শুনে বুকের ভেতরটা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে জেনের।

কিন্তু আতঙ্কিত হলেও দিশা হারায়নি জেন। ওর প্রিয় শিক্ষক মি. বেলফোর্ডের সে কথাটা মনে পড়ল, ‘যতক্ষণ তোমার চিন্তা করার শক্তি আছে, ততক্ষণ হাল ছেড়ে দেয়ার কথা চিন্তা কোরো না। হাল ছেড়ে দেবে মৃত্যুর পর। চিন্তা করো, আবার চিন্তা করো, দেখবে একটা উপায় তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কখন তুমি তাকে দেখতে পাবে সে আশায়।’ বেলফোর্ড বলতেন, ‘মানুষ আসলে সবাই এক-একজন কলহাস। নিজের অজান্তেই

আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। চাইলে।’

দু’জন লোভী পুরুষ এখন পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা এই কাজটা শুরুতে একত্রে করলেও এখন আর কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে ডক সম্ভবত র‍্যাঞ্চমালিককে কিছুটা হলেও বিশ্বাস করেছিল। নইলে কাজটা একত্রে করত না। কিন্তু এখন জব হাইওসের হাতে ফাঁকা দলিল দেখে মাথা ঘুরে গেছে তার। স্বাভাবিক। ফাঁকা দলিলটায় সই নিতে পারলে পরে যা ইচ্ছে তা লিখে নিলেই হলো।

ডক ডোনাল্ডের কথা শুনে এ অবস্থায়ও হাসি পেল তার। একটা লোক এতটা অপদার্থ হতে পারে, জানা হত না ওর এ লোকটাকে না দেখলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটা পরিকল্পনা খাড়া করেছিল লোকটা, কিন্তু সেটার সারা গায়ে অসংখ্য ফুটো।

ওরা তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে চাইছে। কিন্তু জেন সিদ্ধান্ত নিল, যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে সে। ওর মনে হচ্ছে, এদের হাত থেকে নিজেকে এবং টমকে বাঁচানোর একটা উপায় ও খুঁজে পাবেই।

ডকের দিকে হাত বাড়িয়ে জব কাগজটা ফেরত চাইছে। ‘বুঝতে পারছ না কেন, গর্দভ!’ খঁকিয়ে উঠল। ‘আগে সইটা নিয়ে নিই। তারপর...’

‘উঁহু,’ ডক অটল তার দাবিতে। পাশে ফেলে রাখা রাইফেলটার বাটে হাত দিল একবার। ওটাকে নেড়েচেড়ে জায়গামত রাখল। যেন বুঝিয়ে দিল, ওর কথামত কাজ না হলে ওটাকে কাজে লাগাবে। ‘আগে দলিলটায় কী-কী থাকবে সেটা লিখে ফেলো। কী লিখতে হবে জানো তো? বার-বি র‍্যাঞ্চ জেন অস্টিন আমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আর আমি তোমাকে পশ্চিমের পাহাড় থেকে গাছ কাটতে দেব। শেরিফের সামনে

এরকমই তো কথা হয়েছিল আমাদের মধ্যে । নাকি?’

‘তুমি...তুমি একটা বেঈমান, ডক,’ আবার ফুঁসে উঠল জেন । ‘অথচ আমি ভেবেছিলাম কি না তুমি আমাকে ভালবাসো, তুমি আমাকে বিয়ে করে...’ কথা শেষ করল না । দু’হাতে দু’চোখ চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল ।

ব্যস্ত হয়ে উঠল ডক । ওর মনে হলো, পুরো পরিকল্পনাটাই করেছে সে একটা ভুলের ওপর দাঁড় করিয়ে । আসলেই সে বোধহয় বুঝতে পারেনি মেয়েটাকে । স্টিভ রাসেল লোকটাকে স্রেফ কাজের লোক হিসেবেই রাখা হয়েছে । আর সে এটাকে উল্টো ভেবে অহেতুক নিজের এবং জেনের, দু’জনেরই ক্ষতি করে ফেলেছে ।

‘তুমি একটুও ভেবো না, ম্যাম,’ গাঢ় স্বরে মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল ডক । ওর দিকে চাইল । ‘আমি এই লোক...’

ডেরিঞ্জারের গুলির শব্দ খুব একটা জোরালো শোনাল না । তবে পাঁজরার মধ্যে ধাক্কাটা ঠিকই অনুভব করল ডক । অবিশ্বাসভরা চোখদুটো ফেরাল র‍্যাঞ্চারের দিকে । ‘তুমি...তু...’ লুটিয়ে পড়ল নিজের পাশে রাখা রাইফেলটার ওপর হাত বাড়ানো অবস্থায় ।

নিষ্পলক তাকিয়ে রইল जब হাইগুস মৃত লোকটার দিকে । উঠে ওর হাত থেকে কাগজটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করে ফেলে দিল । তুবড়ে গেছে কাগজটা ডকের মৃত্যুকালীন খিঁচুনির কারণে ।

‘অসুবিধে নেই ।’ পকেট হাতড়ে আরেকটা কাগজ বের করে আনল । ‘কোনও জিনিসই একটা রাখতে নেই । এটা আমার বাবা শিখিয়েছিল । শেখানোটা আজ কাজে লেগে গেল ।’ চোখদুটো কুঁচকে মৃত লোকটার দিকে তাকাল । ‘একটা হাঁদা ছিল লোকটা, বুঝেছ? অকৃতজ্ঞও । তার শাস্তিও পেয়েছে এখন ।’

হেসে জেনের দিকে ফিরল। ‘এসো, এবার তা হলে সইয়ের কাজটা শেষ করে ফেলি। আর দেরি করা যাবে না। কী বলো?’

বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। চমকে উঠল হাইগুস। কাগজটা ফের পকেটে পুরে নিল। ডকের রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে সিঁধে হলো। ‘কে?’

‘আমি, জব। শেরিফ।’

একটু ইতস্তত করল জব হাইগুস। তারপর জেনের দিকে তাকিয়ে ওকে চুপ করে বসে থাকার ইঙ্গিত করল। ধীরেসুস্থে দরজার দিকে গেল। ছিটকিনি খুলে দাঁড়াতেই বাইরে থেকে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল শেরিফ ওর গায়ের ওপর। সরে যাওয়ার সময় পেল না র্যাঞ্চার। শেরিফের গায়ের ধাক্কায় পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল।

‘রাইফেল ফেলে দাও, জব হাইগুস।’

তিন-তিনজন লোককে অস্ত্র তাক করতে দেখল হাইগুস নিজের ওপর। রাইফেলটা ফেলে দিল হাত থেকে। ‘তো...তোমরা কারা? কী করে এলে?’

‘কেন, তোমার শেরিফই তো পথ দেখিয়ে আনল! নইলে তোমার এতসব পাহারাদারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কী করে আসতাম? শেরিফকে সঙ্গে দেখে কেউ কিছু বলেনি।’

‘তোমার নাম স্টিভ রাসেল না? তুমি মরোনি? প্যাট আর রস...!’

লুম ছুটে গিয়ে জেন আর টমের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ‘ওহ, ম্যাম। তোমরা ঠিক আছ তো? টম, তুমি?’

‘হা হা হা!’ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল স্টিভ। ‘তুমি যেমন অকাট মূর্খ, তোমার লোকগুলোও হয়েছে তেমনি। দূর থেকে গুলি করেই পালিয়ে যায়। কাছে গিয়ে পরখ করে দেখার সাহস হয় না, লোকটা মরল কি না। সবাই কি আর নির্বিরোধী বব অস্টিন?’

কও তো তুমি খুন করিয়েছ, তাই না?’

‘ক্...কী! মিথ্যে কথা। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি।’

‘দরকার হবে না। এখানে তোমাকে গ্রেফতার করার জন্যে যথেষ্ট কারণ রয়েছে দেখছি। অপহরণ ও হত্যা। কী বলো, শেরিফ? নাকি আরও দরকার আছে? নাও, এবার তোমার আসামী বুঝে নাও। হাতকড়া আননি বুঝি? সমস্যা নেই। আমি আর লুম তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আসামী নিয়ে রিংস্টোন যাব।’ হাসল একটু। ‘কী জানো? হাতকড়াকে বিশ্বাস নেই। খুলে দিতে কতক্ষণ?’

ওর পাশে এসে দাঁড়াল টম। ছেলেটার মাথায় একটা হাত রাখল স্টিভ। ‘জেরি, তুমি ম্যামকে নিয়ে র‍্যাঞ্জে চলে যাও। আমি লুম আর জ্যাবকে নিয়ে যাচ্ছি। কই, চলো, শেরিফ? এখানে আর কোনও কাজ নেই।’

বিশ

সকাল দশটা। রিংস্টোনের ব্যাংকার ফ্রেড রবিনসন বসে আছে ব্যাংকে তার নিজের কক্ষে। ঘামছে লোকটা। নোংরা একটা রুমাল দিয়ে বারবার কপাল, ঘাড় আর মুখ মুছছে লোকটা। ওর সামনে বসে আছে বার-বি র‍্যাঞ্জের মালিক জেন অস্টিন আর ব্যাংক-ক্লায়েন্ট স্টিভ রাসেল।

এরা দু'জন কেন এসেছে বুঝতে পারছে না সে। স্টিভ রাসেল নামের লোকটাকে প্রথম দিন তেমন পাত্রা না দেয়ার মত কেউ মনে না হলেও আজ কেন যেন ওর চোখের দিকে চাইতে পারছে না।

‘তো, মিস্টার রবিনসন,’ প্রথমে কথা বলল স্টিভ। ‘শহরের অবস্থা তো জানোই। এখানকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার জব হাইগুস খুন ও অপহরণের দায়ে হাজতে। বিচারে ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ব্যাপারটাকে তুমি কীভাবে দেখছ?’

‘দুঃখজনক।’ নড়েচড়ে বসল ব্যাংকার। ‘মি. হাইগুসের মত মানুষ এ কাজটা কেন করল বুঝতে পারছি না।’ একটু থামল। ‘কিন্তু তুমি কি ঠিক এটা নিয়ে আলাপ করার জন্যেই আমার কাছে এসেছ?’

‘না। আলাপ করার জন্যে নয়। একটা জিনিস তোমার মাথায় ভাল করে ঢোকাতে এসেছি। এক নম্বর কথা হলো, এরপরও যদি তুমি মিস অস্টিনের র‍্যাঞ্চ বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে আসো কারও কাছ থেকে, তোমাকে রিংস্টোন ছাড়তে বাধ্য করব আমি। বোঝা গেছে?’

‘আমি... প্রতিবাদ করতে গেল রবিনসন। ‘আরে আমি কেন...’

‘দুই নম্বর কথা হলো, আগামী বছরের প্রথম দিকে বার-বি তোমার সব কর্জ শোধ করে দেবে। এর মধ্যে যদি বার-বি’র মালিককে ঋণ শোধের জন্যে জবরদস্তি করতে যাও, তা হলে ভাবব, তুমি আরেকজন খদ্দের পেয়েছ, যে তোমাকে দালালি হিসেবে মোটা টাকা অফার করেছে।’

চুপ করে রইল ফ্রেড রবিনসন। ভাবছে।

‘হ্যাঁ, ভাবো। ভেবেচিন্তে কাজ করলে আর ভুল করবে না। ওঠো, ম্যাম। ব্যাংকারকে ভাবতে দাও। আমার বিশ্বাস, ও আর টাকার জন্যে তাগাদা দিতে যাবে না।’

পাঁচ দিন পর। সুস্থ হয়ে উঠেছে টম। সেদিনের মারধরে ভালই আঘাত পেয়েছিল ছেলেটা। রিংস্টোনের ডাক্তার নিজে দু'বেলা এসে দেখে গেছে তাকে। ওষুধপত্র দিয়েছে। ঝরঝরে হয়ে উঠতে বেশি সময় নেয়নি কিশোর। এই কয়দিনে দারুণ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে ওকে। বুঝে গেছে তাদের ওপর নেমে আসা বিপদ কেটে গেছে। এখন আর কেউই তাদের র্যাঞ্চ বেচে দেয়ার জন্যে চাপাচাপি করতে আসবে না।

সকালে ব্রেকফাস্টের পর ছোটখাট একটা আড্ডা হয়ে গেল দুই ভাই-বোন, র্যাঞ্চের নতুন ফোরম্যান জেরি কব্ব আর স্টিভ মিলে। জেরিকে কিছু দরকারি পরামর্শ দিল স্টিভ। তারপর বলল, 'আমি আজই যাচ্ছি, ম্যাম। এখানে আমার আর দরকার হবে না। জেরি ভাল লোক। লুম আর জ্যাবও। ওরাই দেখে-শুনে রাখবে বার-বিকৈ।'

ওর কথায় সবার আগে ঘোর প্রতিবাদ জানাল টম। 'আজই যাবে মানে? তুমি কোথাও যাচ্ছ না, স্টিভ। তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল স্টিভ। একটা হাত বাড়িয়ে ওর চুল নাড়িয়ে দিল।

জেরি উঠে পড়ল। 'তোমরা কথা বলো। ইয়ে, টম, তুমি কি আমাকে বার্ন থেকে জিনটা এনে দেবে? এক্সুনি বেরোব আমি। যাবে নাকি তুমি আমার সঙ্গে?'

'যাব।' লাফিয়ে উঠল ছেলেটা। 'যাব। চলো।' বেরিয়ে গেল লাফাতে লাফাতে ফোরম্যানের পিছু পিছু।

নীরবে বসে রইল ওরা। সময় কেটে যেতে লাগল। এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ...দশ সেকেন্ড।

'কেন?' আচমকা মুখ তুলল জেন। স্টিভের চোখে চোখ

রাখল ।

দুই সেকেণ্ডের জন্যে মিলে গেল দু'জনের অপলক দৃষ্টি ।
বুকের ভেতরটায় প্রজাপতির নাচন টের পেল সিঁভ । চোখ নামিয়ে
নিল । 'কেন, যেতে হবে না?'

চুপ করে রইল জেন মাথা নিচু করে । আবার চোখ তুলল ।
'কোথায় যাবে?'

'দুনিয়াটা অনেক বড়, ম্যাম । একটা জায়গা ঠিকই খুঁজে
নেব । তোমাকে তো বলেইছি । একটা র‍্যাঞ্চ করার স্বপ্ন দেখছি
আমি । সেখানে...'

'গরু থাকবে, ঘোড়া থাকবে, লোকজন থাকবে । শাকসবজির
বাগান থাকবে, একপাশে কিছু ফুলের গাছও হয়তো, তাই না?'

'হুঁ ।' মাথা দোলাল সিঁভ ।

'আর কী থাকবে, সিঁভ? বউ থাকবে না?'

'থাকবে ।'

নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এল জেন । সিঁভের সামনে এসে
দাঁড়াল । 'বউ হিসেবে আমার একটা চাকরি হবে না, সিঁভ?
তোমার র‍্যাঞ্চে?'

একটু ইতস্তত করল সিঁভ । তারপর দু'হাত বাড়িয়ে দিল
মেয়েটার দিকে । 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে তো?'

হেসে ওর বুকে মাথা গুঁজল জেন । ফিসফিস করে বলল,
'এরপরও পারব না? কী বলো তুমি? তা হলে বউ হতে চাইছি
কেন?'

এক

অন্ধকার মরুভূমি। বালির ভেতর থেকে যেন ভূতের মত বেরিয়ে এল চারটা বাদামি মূর্তি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। চার মূর্তি নিঃশব্দে এগোচ্ছে লোকটার দিকে।

ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। স্যাডল রোপটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে। চার মূর্তি যদিও থেকে আসছে, তার বিপরীত দিকে চেয়ে আছে ও। কাছেই প্রায় মরে যাওয়া ক্যাম্পফায়ার। নিভু নিভু শিখার ছায়া কাঁপছে লোকটার পিঠের ওপর।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল লোকটা, তারপর নড়ে উঠল। ওর একটা হাত আলগোছে ছুঁয়ে আছে স্ক্যাবার্ডে রাখা রাইফেলের বাট। পিছিয়ে ঘোড়ার পাছার দিকে চলে গেল ও। আরেক হাতে মৃদু চাপড় লাগাল ওটার শরীরে। ফিসফিস করে বলল, ‘আন্তে, বাছা। অস্থির হোস না।’

দ্রুত এগিয়ে এল চার মূর্তি। সামনে তাদের শিকার। উল্লসিত বোধ করছে ওরা। এই নির্বোধ সাদা চোখের লোকটার দুঃসাহস অবাক করেছে ওদের। লোকটা ওদের আওতার ভেতর এসে পড়েছে। আর এখন দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে পিঠ দিয়ে। মৃত্যু যে ওর কতটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাচ্ছে না এখনও।

একজন তার সঙ্গীদের পেছনে ফেলে সামনে চলে এসেছে। ওর হাতে একটা ছুরি। নিচু করে ধরা। সবার আগে শিকারের কাছে পৌঁছে ওকে ধরাশায়ী করার ইচ্ছে ওর। তবে লোকটাকে জ্যান্ত বন্দি করতে চায় ওরা। তা হলেই মজা। মারার আগে নির্যাতন চালিয়ে দেখা যাবে, কতটা শক্ত এই সাদা লোক। পেছন থেকে বাহুদুটো আঁকড়ে ধরতে পারলেই অসহায় হয়ে পড়বে শিকার।

ঘোড়ার পাশে দাঁড়ানো লোকটার নাম জেরেমিয়াহ্ ট্রিস্ট। একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। চার মূর্তি জানে না যে, ওদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে ওর কাছে। হঠাৎ নড়ে উঠল ও আবার। নড়ে উঠল মানে এক লাফে এগিয়ে ঘোড়ার সামনে চলে গেল।

অন্ধকারে ওর শরীর মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনের চারজনের চোখে। ওই অবস্থায় স্ক্যাবার্ড থেকে টেনে বের করা রাইফেলের চেম্বারে গুলি পাঠিয়ে দিয়ে ফায়ার করল ও।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে, টেরই পেল না পেছন থেকে শিকারি বেড়ালের মত পা টিপে টিপে আসা লোকগুলো। লাফ দেয়া, অস্ত্র হাতে নেয়া ও গুলি করার ব্যাপারটা যেন প্রায় একসঙ্গেই ঘটল। নিজের করণীয় সম্পর্কে পষ্ট ধারণা এবং তাতে পরিপূর্ণ দক্ষতা না-থাকলে কারও পক্ষে এটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। পেছনের অগ্রগামী লোকটা দৌড়াতে শুরু করেছিল মাত্র, গুলি ওকে গঁথে ফেলল। হোঁচট খেয়ে পড়ল সে। আতঁচিৎকার দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বালুতে।

গড়ান খেল ট্রিস্ট, একই সঙ্গে পর পর দু'বার গুলি করল। একটা গুলি বিঁধল আরেক আক্রমণকারীর কাঁধে, দ্বিতীয় গুলিতে চোয়াল উড়ে গেল তৃতীয় আক্রমণকারীর। চোখের কোনায় চতুর্থজনকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেও হাতের রাইফেলটা একপাশে

ফেলে দিল। তারপর ছুরির জন্যে বেণ্টের দিকে হাত বাড়াল। হামলাকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে গড়িয়ে গেল কয়েক ফুট। তবে লোকটা শেষ পর্যন্ত নাগাল পেয়ে গেল ওর। নাকের সঙ্গে লোকটার কাঁধের প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনুভব করল ট্রিস্ট। ঝাঁকি দিয়ে মাথা পেছনে সরিয়ে নিল। লোকটার শরীরে মরুভূমির রোদে পোড়া বালুর কড়া গন্ধ। এক হাতে লোকটার ছুরিধরা হাতের কজি ধরে ফেলল ও। নিজের বাউয়িটা ঢুকিয়ে দিল নির্দিধায়। একটু পরেই লোকটার পুরো শরীর কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

ধাক্কা মেরে লোকটাকে নিজের উপর থেকে সরিয়ে দিল ট্রিস্ট। গড়িয়ে অন্ধকারের দিকে সরে গেল কয়েক ফুট। গড়ানো অবস্থাতেই ওর গুলিতে চিবুক উড়ে যাওয়া লোকটাকে দেখল পিছিয়ে অন্ধকারের দিকে সরে যেতে। প্রাণঘাতী ব্যথাটা নিঃশব্দে হজম করছে লোকটা।

রাইফেলটা ফের তুলে নিল ট্রিস্ট। তারপর বেড়ালের মত নিঃশব্দে পা ফেলে ক্যাম্পের কাছ থেকে সরে গেল। হামলাকারী ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা কত, জানে না ও। চারজনকে দেখেছে। তবে আরও কম পক্ষে দু'তিনজন হয়তো থাকতে পারে। এরা সম্ভবত শিকার পার্টি। শিকারে বেরিয়েছিল। পথে জলজ্যান্ত একটা নিঃসঙ্গ মানুষ দেখতে পেয়ে আগে ওটাকে শিকার করার ধান্দায় এগিয়ে এসেছে। কিন্তু ট্রিস্টের সন্দেহ হচ্ছে, একটা হাণ্টিং পার্টিতে সাতজনের চেয়ে বেশি লোক থাকাও অসম্ভব নয়। সত্যিই যদি তা-ই হয়!

বিশাল একটা সেজ ঝোপের ছায়ায় গিয়ে ঢুকল ট্রিস্ট। হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সামনের অন্ধকারে। আচমকা একটা ঘোড়ার নাক ঝাড়ার আওয়াজ শুনতে পেল। আন্তে আন্তে এগোল ও। সামনে গিরিখাতের গায়ে একটা ছোট্ট ঢালের মত। ওখানে গিয়ে থামল। ওর কাছ থেকে আরেকটু দূরে

গিরিখাতের একপাশ ঘেঁষে একজন নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারকে এগোতে দেখল। ওর পেছনে অবশ্য আরও তিনটা ঘোড়া। ওগুলোকে নিয়েই এদিকে আসছে। ঘোড়াগুলোর মালিকরা সম্ভবত ওর জিম্মাতেই ওগুলো রেখে ট্রিস্টের পিছু নিয়েছিল। হাসল ট্রিস্ট। তা হলে হামলাকারীদের সংখ্যা চারজনই।

এখন ওকে যদি বাঁচতে হয়, তা হলে এই চতুর্থ লোকটাকে অবশ্যই খুন করতে হবে। সেটা যদি করা না-যায়, তা হলে ওর বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ লোকটা যদি টের পায় যে, ওর সঙ্গীরা নিকেশ হয়ে গেছে, তা হলে আপাতত লেজ তুলে পালাবে। তারপর আরও অ্যাপাচিকে ডেকে নিয়ে আসবে। এরপর সবাই মিলে ধাওয়া করবে ট্রিস্টকে। এতগুলো অ্যাপাচির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো তখন অসম্ভব হয়ে পড়বে। ওরা প্রয়োজনে টুসান পর্যন্ত ধাওয়া করবে ওকে।

পা টিপে টিপে ঢালের ওপর উঠে গেল ট্রিস্ট। ধীরে সুস্থে টার্গেট ঠিক করল। তারপর গুলি চালাল। অন্ধকারেও সামনের ঘোড়সওয়ারকে সিঁটের ওপর কেঁপে উঠতে দেখল যেন। মনে হলো ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবে লোকটা। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে নিজের সিঁটে টিকে রইল সে। একটু পরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঢাল থেকে নেমে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ট্রিস্ট। বালি দিয়ে ঢেকে দিল ক্যাম্পফায়ারের আগুন। স্যাডল বুটে রাইফেলটা রেখে ঘোড়ায় চড়ল।

খুব বেশি জোরে ছোটাচ্ছে না সে ঘোড়াকে। মরুভূমিতে এখন চাঁদের আলো। তবু এ-ধরনের আলোতেও চোরা খানাখন্দে হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে ঘোড়াটা। জানে, এখন যদি ঘোড়াটা কোনও কারণে অকেজো হয়ে পড়ে, তা হলে ওর বেঁচে থাকার আশা প্রায় শেষ। পাথরফাটা গরমে সিদ্ধ হয়ে না-ও যদি মরে,

অ্যাপাচিদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না ।

অ্যাপাচিটাকে যেখানে গুলি করেছিল, সে-জায়গায় পৌঁছাল ও । বালিতে জমাট বাঁধা রক্ত দেখতে পেল । ওখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তঝরা ট্রেইলটি দেখল । ট্রেইল ধরে কয়েকশ' গজ দূরে গিয়ে থামল ও । রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেছে । এরপরও অবশ্য লোকটা থামেনি । ঘোড়ার খুরের ছাপ টাঁদের আলোতেও চকচক করছে ।

ট্রেইল ধরে আরও প্রায় এক ঘণ্টা এগোল । একসময় বুঝতে পারল, অ্যাপাচি লোকটাকে ধরা ওর পক্ষে আর সম্ভব নয় । এর চেয়ে বেশি এগোনো মানে ওর গন্তব্য টুসান থেকে আরও দূরে সরে যাওয়া এবং অ্যাপাচি ল্যাণ্ডের আরও ভেতরে ঢুকে যাওয়া । কিন্তু সেটা ঠিক হবে না ।

ঘোড়ার রাশ টানল ও । মাথা ফিরিয়ে ঝাঁকি দিল ঘোড়াটা । ও মনে হয় আরও সামনে যেতে চায় । 'না, বাছা,' ঘোড়াটাকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল ট্রিস্ট । 'ইনজুনটার পেছনে ছুটে আর কোনও লাভ নেই । চল, আমরা আমাদের পথে যাই-'

স্যাল, মানে ঘোড়াটাকে নিয়ে পূর্ব দিকে এগোল ট্রিস্ট । দিগন্তে আবছা লালের আভাস ফুটতে শুরু করেছে এখন । রাত শেষ হয়ে এসেছে প্রায় । সকাল না-হতেই মরুভূমিতে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে । ন'টা না-বাজতে সেটা পৌঁছে যাবে প্রায় অসহনীয় মাত্রায় । দুপুরের দিকে পুরো শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বে । আর বেলা তিনটার দিকে পুরো মরুভূমিটাকে মনে হবে আদিগন্তজোড়া এক চুলোর মত—আর সেখানে নিজেকে মনে হবে আস্ত একখানা কাবাব, দারুণ তাপে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে । ওই অবস্থায় হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েই মারা যায় অসহায় মরুযাত্রী ।

ধীরগতিতে প্রায় এক ঘণ্টা এগোল ট্রিস্ট । এরপর থামল । পা থেকে ধূলিধূসর বুটজোড়া খুলে নিয়ে স্যাঁডল ব্যাগে রাখল ।

একজোড়া মোকাসিন বের করে পরে নিল। এরপর হাঁটিয়ে নিয়ে চলল স্যালকে। ঘোড়াটাকে কিছুটা বিশ্রাম দেয়া দরকার। তা হলে জরুরি মুহূর্তে ওটার বাড়তি শক্তিটুকু ব্যবহার করা যাবে। নিজের আরামের জন্যে বাহনটাকে খাটিয়ে মারলে পরিণামে নিজেকেই এর বিরূপ ফল ভোগ করতে হয়।

ঘণ্টা দুয়েক পর ফের ঘোড়ায় চড়ল ট্রিস্ট। সূর্য ঠিক মাথার ওপরে উঠে না-আসা পর্যন্ত এগোল। যেখানে থামল, সেখানে অসংখ্য ছড়ানো-ছিটানো পাথর। মরুভূমির বালি প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে ফেলেছে পাথরগুলোর। ঘোড়া নিয়ে ওই পাথরের রাজ্যে ঢুকে পড়ল ট্রিস্ট। নেমে একটা পাথরের ছায়ায় বসল ও। আরেকটা ছায়ায় দাঁড় করিয়ে দিল স্যালকে। ধূলিধূসর হ্যাটটা চোখের ওপর নামিয়ে দিয়ে বসে ঝিমোতে শুরু করল।

“আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে উঠে স্যাডল থেকে পানির ক্যান্টিন বের করল। বেশ কিছু সময় নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে পানি খেল সে। তারপর ঘোড়ার কাছে গিয়ে হ্যাটের ভেতরে পানি ঢেলে নিয়ে খাওয়াল ওটাকে। এরপর ক্যান্টিনের মুখ বন্ধ করে রাখল। ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে নিয়ে বালির ওপর ছুঁড়ে দিল ওটাকে।

ট্রিস্ট যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে, সেখান থেকে মাইল কয়েক পশ্চিমে এক জায়গায় অ্যাপাচি সর্দার শা-তা-নে তার লোকজন নিয়ে বসে আছে। গভীর কালো দু’চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে। একসময় চোখ ফিরিয়ে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। তারপর শান্ত ও নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, ‘আমাদের সাবধানে এগোতে হবে। ভেবো না, লোকটা সারাক্ষণ দৌড়ের ওপর থাকবে। ওর নিজের জন্যে সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে রুখে দাঁড়াবে।’

ইণ্ডিয়ানদের ছোট দলটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সর্দারের কথা

শুনল। সাদা চোখের ওই লোকটাকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ দেখছে না ওরা। জানে, একসময় লোকটাকে থামতে হবে। তখন ওরা হত্যা করবে লোকটাকে। ছোটখাট হলেও এটা তাদের কাছে একটা যুদ্ধ এবং যে-কোনও যুদ্ধেই জিততে পারাটা আনন্দের।

বিশাল পাথরের চাঁইটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্যাডলটার দিকে তাকিয়ে আছে ট্রিস্ট। জীর্ণ পুরানো স্যাডলটা আর কোনও কাজে আসবে না। ফেলে যেতে হবে এটাকে মরুভূমিতে। বিড়বিড় করে ঘোড়াটাকে বলল, ‘খারাপ লাগছে স্যাডলটা ফেলে যেতে, বুঝলি, স্যাল। এতটা ভাল স্যাডল আর পাইনি।’

ঘোঁৎ করে উঠল স্যাল। যেন সায় দিল মনিবের কথায়। ঘাড় ফিরিয়ে একবার ট্রিস্টের মুখের দিকে তাকিয়ে আরেকবার বালির ওপর পড়ে থাকা স্যাডলটার দিকে চাইল। স্যাডলটা তো ওর পিঠেই চাপানো হত। সুতরাং এর ভাল-মন্দ নিয়ে কথা বলার কিছুটা অধিকার ওরও আছে বৈকি!

মৃদু হেসে মেয়ারের গলায় হাত বুলিয়ে দিল ট্রিস্ট। ‘ঠিক আছে, বাছা। এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নে।’

এরপর পাথরের ছায়ায় বালির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে। টুপি দিয়ে ঢেকে দিল দু’চোখ।

শেষ বিকেলে তপ্ত মরুর বুক বেয়ে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল ওরা। ট্রিস্ট কখনও ঘোড়ায় চড়েছে, কখনও নেমে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে চাইছে না স্যাল বেশি পরিশ্রম করে শক্তি হারিয়ে ফেলুক। আপাতত ওর পেছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাকে ধাওয়া করা হচ্ছে না। সে জানে, অ্যাপাচিরা ওর পেছনেই আছে। ওদের কাউকে খুন করে কোনও সাদা মানুষ ওদের এলাকা থেকে নির্বিবাদে বেরিয়ে যাবে, এটা চিন্তা করাটা ভুল হবে। ওরা পেছন থেকে ট্র্যাক করতে

করতে একসময় ওর কাছাকাছি এসে যাবে। আর তখনই স্যালকে খাটাতে হবে পূর্ণোদ্যমে। আগেভাগে খাটিয়ে দুর্বল করে ফেলা হলে জরুরি মুহূর্তে ওর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া যাবে না।

সূর্যের তাপ কমে আসতে মরুভূমিতে দ্রুত ঠাণ্ডা নামতে শুরু করেছে। সন্দের পর একটা ক্ষীণ চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে। তার ম্লান আলোয় আরও ঘণ্টা কয়েক এগোল ট্রিস্ট। মেয়ারের রাশ হাতে নিয়ে ওটার পাশে পাশে হাঁটছে সে।

অবশেষে থামল এক জায়গায়। ক্লান্তিতে হাঁটু ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়েছে ওর। ক্যান্টিন থেকে পানি খেল; স্যালকেও খাওয়াল। তারপর একটা পাথরের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে প্রায় লুটিয়ে পড়ল বালির ওপর। পরমুহূর্তেই প্রায় জ্ঞান হারানোর মত করে ঘুমিয়েই পড়ল।

মুখের ওপর ভোরের সূর্যের ছটা এসে পড়তেই ঘুম ভাঙল ট্রিস্টের। উঠে বসে সশব্দে হাই তুলল। একটু দূরে ঝিমুচ্ছিল স্যাল। মনিবের হাইয়ের শব্দে চমকে উঠে চোখ মেলে ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল। কাছে গিয়ে ওটার পিঠ চাপড়ে দিল ট্রিস্ট। মৃদু স্বরে আশ্বস্ত করল জন্তুটাকে। ‘অমন চমকে উঠছিস কেন, বাছা? ইনজুন তো নই। কিন্তু আমাদের দেরি হয়ে গেছে। আরও আগে সরে পড়া উচিত ছিল এখান থেকে। এত অসাবধান হলে তো দু’জনেই মারা পড়ব।’

ক্যান্টিনটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাইফেলটা হাতে নিল। ‘চল, কম পক্ষে দু’ঘণ্টা পিছিয়ে পড়েছি। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে এখন।’

লাগামটা এক হাতের কজির সঙ্গে জড়িয়ে নিল ট্রিস্ট। বালির পাহাড় ঠেঙিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চলল। একসময় বালির প্রান্তর পেরিয়ে শুকনো খটখটে জমিনে গিয়ে পড়ল। প্রভাত সূর্যের নরম

আলো আস্তে আস্তে প্রখর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। টুপিটা কপালের ওপর টেনে দিল ও।

‘ইস,’ আবার বিড়বিড় করে উঠল ট্রিস্ট। ‘কাজটা একদম গাধার মত হয়ে গেছে, বুঝলি, স্যাল? বেশ কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেছি রে!’

নিজের নাম শুনে কান নেড়ে মনোযোগী হয়ে উঠল ঘোড়াটা। নাকের ওপর নেমে আসা ঘামের ধারা মুছল ট্রিস্ট। ‘ওরা হয়তো ঘণ্টা ছয়েক কিংবা তার চেয়ে কম সময় পিছিয়ে আছে আমাদের চেয়ে। বিকেলের মধ্যেই আমাদের স্প্রিং অভ ডগসে গিয়ে পৌঁছাতে হবে।’ ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করে দিল সে। ‘ওখানে গিয়ে বিশ্রাম নেব, বাছা।’

দিন আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দুপুরের দিকে ক্লান্তিতে হাঁটু ভেঙে পড়ার অবস্থা হলো ওর। শেষ এক ঘণ্টায় বার কয়েক হাঁটু গেড়ে বসেও পড়ল। তারপরও ঘোড়াটাকে ব্যবহার করছে না। বার কয়েক পানি খাওয়াল ওটাকে। নিজেও খেল কয়েক ঢোক। তারপর একটা বড় সাগুয়ারো ঝোপের ছায়ায় শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। কাছেই দাঁড়িয়ে রইল স্যাল। ঘণ্টাখানেক পরে উঠল সে। আবার চলতে শুরু করল। ওর লক্ষ্য, সামনে মাইল কয়েক দূরে একটা কালো ফুটকির মত জায়গা। ওখানে গেলে সে পানি, ছায়া এবং এমনকী শিকার-টিকারেরও দেখা পেতে পারে বলে আশা করছে।

ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত রেখে আবার আদর করল ও। ফিসফিস করে বলল, ‘শোন, বাছা, আর মাত্রই তো কয়েক মাইল। ওখানে গেলে প্রচুর পানি পাবি খাওয়ার জন্যে। ঘাস, ছায়া... বলতে বলতে পেছনে ঘাড় ফেরাল সে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন জমে গেল। ওর ইঙ্গিত পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল স্যালও। মাথা ঝাঁকাল।

দূর দিগন্তে অস্পষ্ট কিন্তু চলমান কিছু ধরা পড়েছে ট্রিস্টের

চোখে। ঘণ্টা তিনেকেরও কম দূরত্বের মধ্যে রয়েছে ওগুলো। মাথা থেকে টুপিটা সরিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। তারপর স্যালের পিঠে চড়ে বসল। ‘যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা, স্যাল।’

ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল মেয়ার। পাঁজরে মনিবের হাঁটুর মৃদু গুঁতো খেয়ে ছুটতে শুরু করল।

মনিবের আচার-আচরণ ভালই বুঝতে পারে স্যাল। জানে লোকটা তাকে অকারণে খাটায় না। অনেকক্ষণ ধরে তাকে নিয়ে হেঁটে এসেছে। কিন্তু এখন ছোট্টার ইঙ্গিত দিয়েছে। এর মানে হলো, এখন আর আরামের সময় নেই। জোরে ছুটতে হবে। নইলে বিপদ।

দুই

খেয়েদেয়ে তরতাজা মাসটাংটি ছোট্টার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তার পিঠে অলস ভঙ্গিতে বসা অ্যাপাচি সর্দার শা-তা-নে। ঘোড়াটা শা-তা-নের খুব প্রিয়। একে অন্যকে চমৎকারভাবে বুঝতে পারে ওরা। দু’পা দিয়ে ঘোড়াটার পাঁজর আঁকড়ে রেখেছে শা-তা-নে। এর মানে বোঝে মাসটাং। এখনই যে-কোনও মুহূর্তে ছুটতে হতে পারে ওকে।

শা-তা-নে ছোট্টাট গড়নের মানুষ। তবে গাউগোউ শরীরে অপরিমেয় শক্তির আভাস। মুহূর্তের নোটিসে ছেড়ে দেয়া স্প্রিং-

এর মত নড়ে উঠতে পারে। ছুটতে পারে দুর্দান্ত গতিতে। বাদামি মুখে কালো দু'চোখ। তাতে কোনও ভাব নেই এ-মুহূর্তে। সামনের দিগন্তে তাকিয়ে আছে ও। যত্নের সঙ্গে পরখ করে দেখছে প্রতিটি অস্পষ্ট বিন্দু, রেখা। ওর সঙ্গে বারোজন যোদ্ধা। নিজেদের বাহনের পিঠে অনড় বসে আছে ওরাও। অপেক্ষা করছে সর্দারের আদেশ-নির্দেশের।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু স্বরে কথা বলল শা-তা-নে, 'চলতে শুরু করেছে লোকটা। স্প্রিং অভ ডগসের দিকে।'

মাসটাং-এর পাঁজরে পা ছোঁয়াল ও। মৃদু সঙ্কেত পেয়ে নড়ে উঠল ঘোড়াটা। চলতে শুরু করল। বারোজন যোদ্ধা নীরবে অনুসরণ করল ওকে। বারোজন অ্যাপাচি যোদ্ধা নিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গকে 'শিকার' করতে বেরিয়ে তেমন কোনও দুশ্চিন্তায় ভুগছে না ও। তবু মাঝে মধ্যে মনের ভেতর এক ধরনের অস্বস্তি টের পাচ্ছে। সাদা মানুষটার ফেলে যাওয়া ক্যাম্প থেমে সেখানকার সব কিছু তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখেছে। এ ছাড়া আগের অ্যাপাচিদের আক্রমণ যেভাবে ঠেকিয়ে বেরিয়ে গেছে, তাতে মনে হচ্ছে, সাদা মানুষটা সাধারণ কেউ নয়। মাথায় বুদ্ধি আর বুকে সাহস দুটোই ধরে। বোকাসোকা আর ভীরা লোকদের পক্ষে ওই হলুদ পদার্থটা, যাকে ওরা সোনা বলে, সেটার খোঁজে আসা সম্ভব নয়।

রাগে লাল হয়ে উঠেছে শা-তা-নের বাদামি মুখ। সাদা লোকটার ক্যাম্পের কাছে মৃত অ্যাপাচিদের লাশ দেখে মাথায় খুন চেপে গেছে। বিড়বিড় করে লোকটার উদ্দেশে গাল বকতে বকতে লাশগুলোকে লাথি মেরেছে ও। আর আহত যোদ্ধাকে দেখে শুধু মারতে বাকি রেখেছে। লোকটা ক্যাম্পের কাছেই একটা জায়গায় পাথরে হেলান দিয়ে মরণ যন্ত্রণায় ধুঁকছিল। অন্ধকারে ট্রিস্ট খুঁজে পায়নি ওকে। তবে সর্দারের গালাগাল শুনে তার নিশ্চয় মনে

হয়েছে, ওসব শোনার চেয়ে সাদা লোকটার গুলিতে মরে যাওয়াই হয়তো ভাল ছিল।

শা-তা-নের মতে, গাধার মত কাজ করেছে লোকগুলো। লোকটাকে ওরা মাত্র একদিক থেকে আক্রমণ করেছে ওদের উচিত ছিল অন্তত একজনকে রাইফেল হাতে লোকটার পেছনে পাঠিয়ে দেয়া। তা হলে সামনে থেকে আসা লোকগুলো কোনও কারণে তাকে বন্দি করতে ব্যর্থ হলেও পেছনের লোকটা নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করতে পারত। মৃত চারজন লোক নেহাত বাচ্চা ছেলের মত কাজ করেছে। এমন ভুল অ্যাপাচি যোদ্ধাদের করা সাজে না। তারা সম্ভবত তাদের শিকারকে ভেড়ার বাচ্চা ভেবেছিল, তাই নেকড়ের মত হামলে পড়তে গিয়েছিল। এখন নিজের জীবন দিয়ে সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

ঘণ্টা কয়েক চলার পর থামল শা-তা-নে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসল। একটু পরে হাসিমুখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘ও এখন হাঁটছে না। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এর মানে হলো, ও আমাদের দেখতে পেয়েছে। এখন সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্প্রিং অভ ডগসে চলে যাবে। আমরা ওটার কাছাকাছি হতেই আবার ছুটতে শুরু করবে। এর মধ্যে যতক্ষণ সম্ভব ঘোড়াকে এবং নিজেকে বিশ্রাম দেবে।’

একটা বিশাল পাথরের নীচ দিয়ে পানি চুইয়ে আসছে। এটাই স্প্রিং অভ ডগস। একটা রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে নিজের নাক-মুখ মুছল ট্রিস্ট ভাল করে। পা থেকে বুট খসিয়ে ফেলল। তারপর পানির কাছে বসে ঠাণ্ডা পানিতে ডোবাল দু’পা। এতক্ষণ ধরে জ্বলছিল ওগুলো। এখন ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়া পেতে আরামে চোখ বুজে এল। বাচ্চা ছেলের মত আঁজলা ভরা পানি নিয়ে মাথায় ঢালতে লাগল সে। ঘাড়ের কাছে শার্টের কলার ফাঁক করে পিঠেও

ঢালল এবার প্যাণ্টের সামনের দিকটায় পানির ঝাপ্টা দিয়ে রীতিমত ভিজিয়ে নিল। পাড়ে উঠে ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে করুণার হাসি হাসল 'স্যাল, তোর কপাল নেহাত মন্দ যে ঘোড়া হয়ে জন্মেছিস আমার মত মানুষ হলে বুঝতে পারতি, এভাবে ভিজতে পারাটা যে কী আরামের

চুপচাপ শুনে গেল স্যাল। তারপর কান নাড়ল ব্যাপারটা যে ও নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে, কান নোড়ে সম্ভবত সেটাই বুঝিয়ে দিল মনিবকে।

নিজের পরিচর্যা শেষ করে এবার মেয়ারটাকে নিয়ে পড়ল ট্রিস্ট। পানি খাইয়ে নিল ওটাকে। তারপর ভেজা রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড় মুছে দিল বারকয়েক। একটু ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিয়ে পায়ে মোকাসিন পরে নিয়ে সবচেয়ে উঁচু বোল্ডারটায় উঠে পশ্চিমে তাকাল। তেমন কিছু দেখতে পেল না। তাই বলে নিশ্চিত হলো না।

রাতটা এখানে কাটানোর আশা করেছিল ট্রিস্ট। অন্তত কিছুক্ষণ বিশ্রাম হলেও নেবে ভেবেছিল। কিন্তু মনের ভেতর কেমন যেন বাধাও অনুভব করছিল। কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানে থামলে সে মারা যেতে পারে। তবু এ-জায়গাটায় যতক্ষণ সম্ভব অবস্থান করবে ও। ঘোড়াটাকে পানির কাছাকাছি রাখবে। এরপর অবস্থা বেগতিক দেখলে লেজ তুলে ভাগবে। ও জানে, অ্যাপাচিরা ওর পিছু ধাওয়া করতে করতে এখানেই আসবে। রাতটা এখানে কাটাবে। ভোরে উঠে ওর ট্রেইল ধরে আবার ধাওয়া শুরু করবে। তখন পর্যাপ্ত পানি ও বিশ্রাম পেয়ে তাদের ঘোড়াগুলো থাকবে টগবগে, তরতাজা। ট্রিস্ট সারারাত চলে ওদের কাছ থেকে ভাল একটা দূরত্বে চলে যেতে পারবে। কিন্তু রাতে পিছিয়ে পড়া দূরত্বটুকু দিনের বেলায় অবাধে ঘোড়া চালিয়ে পুঁথিয়ে নেবে ওরা। আর তখন সারারাত ধরে চলা ঘোড়া নিয়ে

ট্রিস্ট ক্লাস্তির চরমে গিয়ে পৌঁছবে। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে দু'জনকেই থামতে হবে বারবার।

পাথরের ওপর আরাম করে বসেছে ও। বারবার মাথা তুলে তাকাচ্ছে দিগন্তের দিকে। ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সন্ধ্যাস্ত পর্যন্ত ওদের চিহ্ন দেখা না-গেলে এখান থেকে পড়বে অনেকক্ষণ তাকিয়েও দিগন্তে কোনও দাগ বা রেখা দেখতে পেল না সে শেষে দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে উঠতে যাচ্ছে, এমনি সময় মাইলখানেক দূরে একটা অ্যারোয়ার বাইরে আসন্ন সন্দের অন্ধকারে কিছু একটা নড়ে ওঠার আভাস পেল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠল সে। পাথর বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ওটার পিঠে ভাঁজ করা কমলটা চাপাল ও। এরপর রাইফেল ও পানির ক্যান্টিন দুটোই কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বলল, 'এবার পালাতে হবে, স্যাল। ওরা আসছে। আমাদের এখানে পেল জ্যাস্ত ভেজে খাবে

এক মুহূর্ত পরে উন্মুক্ত মরুভূমিতে বেরিয়ে গেল স্যাল।

বারোজন অ্যাপাচি যোদ্ধাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিল শা-তা-নে। তিন দিক থেকে এগোল স্প্রিং অভ ডগসের দিকে। লোকটা এখনও ওখানে আছে কি না ওর সন্দেহ হচ্ছে। তবে যদি থাকে তা হলে দুর্দান্ত চালাক লোকটা নিশ্চয় ওদের দেখতে পেয়ে নিজের সুবিধে মতন জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। অবশ্য একসঙ্গে বারোজন যোদ্ধার মোকাবিলা করার মত সাহস ওর হবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। ওর ধারণা, এই লোকটা মরুভূমিকে নিজের হাতের তালুর মত করে চেনে। জানে, কী করে মরুভূমিতে নিজের বাহনের যত্ন নিতে হয় এবং নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয়

ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নিঃশব্দে এগোচ্ছে।

প্রতিটি পাথরের অবস্থান চুলচেরা বিচার করে নিয়ে অ্যামবুশের আশঙ্কা আছে কি না আগেভাগে যতটা সম্ভব খতিয়ে দেখছে।

হঠাৎ এক যোদ্ধার চড়া গলা শুনল সবাই। দ্রুত এগোল ওরা পানির দিকে। ওখানে একজন যোদ্ধা মাটির দিকে আঙুল দিয়ে কিছু একটা দেখাচ্ছে। উত্তেজিত স্বরে বলছে, ‘ও এখানে এসেছিল। পানি খেয়েছে তারপর নেমে গেছে মরুভূমির দিকে। ও আর এখানে নেই।’

ইণ্ডিয়ানরা সবাই এখন হাঁটু গেড়ে বসে শ্বেতাজ লোকটার ট্র্যাক পরীক্ষা করছে। সূর্য ডুবে গেছে একটু আগে। অন্ধকারে ঢেকে গেছে লোকটার ট্রেইল। ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেল শা-তা-নে মরুভূমিতে গিয়ে পড়ল। একটু পরে ফিরে গেল নিজের লোকদের কাছে। আগে থেকেই জানত, তবু লোকটা চলে গেছে দেখে খুশি হলো ও। রাতটা অন্তত শান্তিতে কাটবে। পুরো রাত টানা বিশ্রাম পেলেন কাল সকালে লোকটার পিছু ধাওয়া করতে সুরিধে হবে।

যোদ্ধাদের ডাকল ও। দু’জনকে দেখিয়ে বলল, ‘তোমরা ওখানে, ওই পাথরের ওপর থেকে সারারাত পাহারা দেবে।’

দুটো উঁচু পাথরের মাথায় রশি বেঁধে ঘোড়াগুলোকে বাঁধা হয়েছে। একজন যোদ্ধা ওদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, ‘ওখান থেকে ঘোড়াগুলোকে অন্ধকারে ভালো দেখা যাবে না।’

বিতৃষ্ণ চোখে লোকটার দিকে চাইল শা-তা-নে। ‘গাধা! তোমাকে আমি ঘোড়া পাহারা দিতে বলছি না।’

এরপর চুপ হয়ে গেল সবাই। আগুন জ্বালানো হয়েছে ছোট করে। পাতলা একটা পাথর খোলা হিসেবে বেছে নিয়ে একটা খরগোস ঝলসানো হচ্ছে। তেরোজনের রাতের খাবারের জন্যে মোট তিনটা খরগোস। বাকি দুটোর চামড়া ছাড়ানো হয়েছে। ঝলসে নেয়ার পর সবাই একসঙ্গে খেতে বসবে।

আগুনের পাশে বসে আধা বলসানো একখণ্ড খরগোসের মাংস চিবুচ্ছে শা-তা-নে। একটু পরে সুবিধে করতে না-পেরে থোঃ করে মাংসের টুকরোটা ফেলে দিল মুখ থেকে। এরপর নিবিষ্ট মনে আগুনের ওপর রাখা মাংসগুলোর আন্তে আন্তে বলসানো হওয়া দেখতে লাগল।

‘সর্দার,’ একজন হ্যাংলা-পাতলা শরীরের যোদ্ধা কথা বলে উঠল। ‘এই লোক এখানে কেন এসেছে বলো তো? ও কি নীল কোটঅলাদের* স্কাউট?’

‘হতে পারে,’ গম্ভীর স্বরে বলল শা-তা-নে। তারপর নড়েচড়ে আরাম করে বসতে বসতে বলল, ‘কিন্তু সে একজন যোদ্ধা বটে। অন্তত এটুকু নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি তোমাদের।’ একটু ঝুঁকে একে-একে সবার মুখের দিকে চাইল। ‘আমরা ওকে খুন করার আগে আমাদের কিছু লোককেও হয়তো ও খুন করবে।’

ওর এ কথায় জোর প্রতিবাদ শোনা গেল। এমন অলঙ্কুণে ভবিষ্যদ্বাণী বারো যোদ্ধার কারোই পছন্দ হয়নি। তারা এখানে মারতে এসেছে, মরতে নয়। তা ছাড়া, যত যা-ই হোক, তারা সংখ্যায় তেরোজন। একজন নিঃসঙ্গ সাদা মানুষের সাধ্য কী, এতজনের বিরুদ্ধে লড়বে?

একটা হাত তুলল শা-তা-নে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল হুটগোল। ‘আচ্ছা ধরো, তোমরা বারোজন মিলে আমাকে খুন করার জন্যে আমার পিছু নিলে। এখন যখন আমার সঙ্গে তোমাদের মুখোমুখি হবে, তখন মরার আগে আমিও কি তোমাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাব না?’

আগুনের পাশে বসা যোদ্ধাদের কাউকে কাউকে মাথা ঝাঁকাতে দেখা গেল। কেউ কেউ বিড়বিড় করে সমর্থন জানাল।

* আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় উত্তরাঞ্চলের সৈনিক। এরা নীল কোট পরত।

‘আমার বিশ্বাস,’ বলে চলল শা-তা-নে। ‘এই লোকটাও আমাদের কাউকে কাউকে খুন করতে পারবে। কারণ ও আমাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মেই লড়াই করতে জানে। বুনো ভালুকের মত প্রচণ্ড সাহসী ও। সকালে যখন এখান থেকে ওর ট্রেইল ধরব, তখন আমাদের অনেক হিসেব করে এগোতে হবে। ভেবো না, লোকটা সারাক্ষণ দৌড়ের ওপর থাকবে। নিজের সুবিধে মতন জায়গায় গিয়ে রুখে দাঁড়াবে ও। আমাদের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করবে। সুতরাং এরপর থেকে আমাদের সারাক্ষণই তৈরি থাকতে হবে সেজন্যে।’

ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল। যাকে শিকার করতে বেরিয়েছে, তার ব্যাপারে সর্দারের এমন স্বীকারোক্তি শুনে অবাক লাগছে তাদের। কেউ কেউ অবশ্য সমর্থনের ভঙ্গিতে চুপ করে রইল। কারও কারও ভাল লাগল না। এতগুলো মানুষের বিপরীতে একা একজন মানুষ সম্পর্কে এমন কথা একটু অতিশয়োক্তিই মনে হচ্ছে তাদের। তবু যদি লোকটা একজন সাদা মানুষ না-হয়ে অ্যাপাচি হত, তা হলে মেনে নেয়া যেত। একটা সাদা চামড়ার শয়তানকে এতটা সমীহ করা দেখে ভাল লাগছে না তাদের। মৃদু স্বরে আপত্তি জানাল কেউ কেউ।

অবশ্য একটা ব্যাপারে তারা একটু ধন্দের মধ্যেও রয়েছে। এ-লোকটাই খুন করেছে চারজন অ্যাপাচি যোদ্ধাকে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। তবে শা-তা-নে বলেছে, লোকগুলো বোকা ছিল, তাই সাদা চামড়ার লোকটার বিরুদ্ধে লড়াইতে পারেনি। তাদেরও তা-ই ধারণা। লোকগুলো স্রেফ নিজেদের বোকামির কারণে মারা পড়েছে।

তিন

বেশ কয়েক মাইল এক নাগাড়ে ঘোড়া চালিয়ে গেল ট্রিস্ট। ওর মাথায় দ্রুত চিন্তা চলছে। সামনের দিনটি কীভাবে বেঁচে থাকবে, সেটার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত এখন। অ্যাপাচিরা রাতের বেলায় ওর পিছু ধাওয়া করবে না। তবে সকালে উঠে সারারাত ধরে বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা ঘোড়া নিয়ে তীরের মত ছুটবে ওরা। ট্রিস্ট তার পরিশ্রান্ত ঘোড়া নিয়ে ওদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিয়ে পারবে না। কালই ওদের হাতে ধরা পড়ে যাবে সে। কাল যদি না-ও পড়ে, পরশু তো অবশ্যই।

‘থাম, স্যাল,’ মেয়ারের লাগাম ধরে টান দিল ও। ‘দাঁড়া, একটু চিন্তা-ভাবনা করে নিই।’

থেমে গেল ঘোড়াটা। ওটার পিঠ থেকে নেমে মুখের কাছে গিয়ে আদুরে ভঙ্গিতে নাকটা ঘষে দিল ট্রিস্ট। ‘শোন, স্যাল। অত বেশি ছোট্টাছুটি করে লাভ নেই। ওরা যেভাবে আসছে, শিগগিরই ধরা পড়ে যাব। আমি নিশ্চিত, ওদের সঙ্গে বাড়তি ঘোড়াও আছে। আর আমার বলতে শুধু তুই। আর তোকে যেভাবে খাটাচ্ছি, তাতে মনে হয় না, আগামীকাল বিকেলের দিকে তুই আর চলতে পারবি।’ রাতের অন্ধকারে চোখ মেলে দিল সে। চিন্তা করছে। তারপর আলাপের ভঙ্গিতে বলল, ‘স্যাল, চল আমরা আবার সেই স্প্রিংটার কাছে চলে যাই।’ আমাদের ধাওয়া করার

কাজটা ওদের জন্যে একটু কঠিন করে তুলি। ওরা আমাদের খুন করবে ঠিক আছে, তবে কাজটা ওদের অত সহজে করতে দেব না। তুই কী বলিস?’

লেজ নেড়ে ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল স্যাল। যেন বুঝিয়ে দিল, মনিবের জায়গায় ও হলেও ঠিক এই কাজটাই করত।

আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ল ট্রিস্ট। ‘ঠিক আছে, বাছা, চল ওদের একটু ভেলকি দেখিয়ে দিই।’

স্প্রিং-এর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। ওটাকে এক জায়গায় রেখে পা টিপে টিপে এগোল পাথরের চাঁইগুলোর দিকে। কাছাকাছি এসে থামল। অন্ধকারে চারদিকে তাকাল। তারপর সবচেয়ে কাছের বড় পাথরটা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

কোথাও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। পাহারাদার থাকার ব্যাপারটা অবশ্য মাথায় আছে ট্রিস্টের। ইণ্ডিয়ানরা সাদাদের মত সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাদের গায়ের রঙের সঙ্গে প্রকৃতির রঙের খুব একটা পার্থক্য নেই। তা ছাড়া পেশাগতভাবে শিকারি হওয়ায় তারা জানে, কীভাবে নিজেদের ছোটখাট বোপঝাড়, টুকরো পাথর, বালির ঢিবি, এমনকী সামান্য একটু ঘাসের মধ্যে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে হয়। আর এখন তো রাতের আঁধার। ওর মত একজন সাদা মানুষের সাধ্য কী, ইণ্ডিয়ানরা নিজে থেকে দেখা না-দিলে তাদের আভাস পায়?

পাথরটার ওপর উঠে গেল ট্রিস্ট। নড়াচড়া করছে খুব সন্তর্পণে। একটা ছোট পাথরের টুকরোও যদি স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে যায়, তা হলে নিস্তর্র রাতের প্রেক্ষাপটে সেটার পতনের শব্দ হবে ভয়াবহ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সে-ঝুঁকি নিতে পারে না ট্রিস্ট।

পাথরের সমতল পিঠে হাঁটছে ও। ওই পাথর থেকে নেমে কাছাকাছি আরেকটা পাথরের ওপর উঠল। সেখান থেকে নেমে

গেল ছোট্ট কুলুঙ্গির মত একটা জায়গায়। একটু পরে নেমে আরেকটা পাথরের চাঁই বেয়ে উঠতে শুরু করল। পাথরটার পিঠে চড়তে যাচ্ছে, এমনি সময় ডানপাশে একটা অন্ধকার ছায়া নড়ে উঠতে দেখল। মুহূর্তেই জায়গায় জমে গেল সে। নড়ে ওঠা অন্ধকার ছায়াটা আগের জায়গা ছেড়ে নতুন একটা জায়গায় পজিশন নিল। আবার মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে পড়ল লোকটা। বোঝাই যাচ্ছে না ওই জায়গায় একটু আগে কেউ নড়াচড়া করেছিল।

আস্তু আস্তু পিছিয়ে এল ট্রিস্ট। গার্ডের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে চাইছে। অন্ধকারে একজন ইণ্ডিয়ানের তুলনায় একজন শ্বেতাঙ্গ অনেক বেশি দৃশ্যমান। ও যদি এখন গার্ডের চোখে পড়ে যায়, তা হলে পরবর্তী ব্যাপারটা ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভাসছে। লোকটাকে তার খুন করতে হবে। কিন্তু তার আগে লোকটা চিৎকার করে অন্যান্য অ্যাপাচিকে সতর্ক করে দেবে এবং তারা ধেয়ে আসবে পঙ্গপালের মত। ট্রিস্ট ঘোড়ার কাছে পৌছানোর আগেই ধরা পড়ে যাবে।

আচমকা নড়ে উঠল গার্ড। একই সঙ্গে বুকের ভেতর নিজের কলজেটারও লাফিয়ে ওঠার শব্দ যেন স্পষ্ট শুনতে পেল ট্রিস্ট। শীতল ভাব টের পেল তলপেটে। তবে একটু পরে স্বস্তি ফিরে পেল ট্রিস্ট। নাহ, অ্যাপাচি গার্ড কিছু টের পায়নি।

বিশাল শব্দ করে হাই তুলল অ্যাপাচি গার্ড, পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিবে বসল। ওর সামনে এখনও ঘণ্টা কয়েকের দীর্ঘ রাত। একটা হাত তুলে নাকের ডগা চুলকাল সে। শা-তা-নের ওপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। লোকটা এখানে সারারাত নির্ধুম চোখে পাহারা দেয়ার জন্যে বসিয়ে দিয়েছে ওকে। এর মানে হলো, আগামীকাল যখন ওরা ফের সাদা মানুষটার পিছু নেবে, তখন আর সবাই সারারাত ঘুমিয়ে তরতাজা ও চাঙ্গা থাকবে, আর

ও সারারাত বিনিদ্র থাকার ক্লান্তি নিয়ে ওদের পেছনে ধুকতে ধুকতে যাবে। ব্যাপারটা ভাবতে খারাপ লাগছে ওর। শা-তা-নে একটা চালাকি করেছে। দলের দু'জন সেরা লড়িয়ে লোককে পাহারা দেয়ার মত ছোট কাজে নিযুক্ত করেছে। এর মানে হলো সাদা লোকটাকে মারার কতিত্ব ও নির্দিষ্ট সময়

সামনের দিকে ঝুঁকি বসল সে। পালো ক্যাম্পের ওপর চোখ মেলে দিল সবাই ঘুমুচ্ছে। স্যাচনকা পিঠের টায় সামান্য বাতাসের ঝাপ্টা অনুভব করল ও। এ-সামান্য পরিবর্তনটুকুই তাকে সতর্ক করে দিল। ঝট করে বসা অবস্থাতেই ঘুরতে চাইল সে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গলায় দুটো শক্তিশালী হাতের প্রবল চাপ অনুভব করল ইণ্ডিয়ান লোকটা। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার সামান্য চেপ্টা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। আন্তে আন্তে শরীর শিথিল হয়ে এল ওর। ওই অবস্থাতেই মারা গেল।

লোকটাকে আন্তে করে পাথরের ওপর শুইয়ে দিল ট্রিস্ট। তারপর একপাশে রাখা ওর রাইফেলটা সরিয়ে নিল। নীচে ক্যাম্পের দিকে চাইল এবার সে নিজেও মাটির ওপর সার বেঁধে শোয়া অশ্বকারে কালো অবয়বগুলোকে দেখল। কাছেই একটা ছায়াময় জায়গায় বাঁধা ঘোড়াগুলোর ওপর নজর গেল ওর। ওর মনে হলো ওখানে সবগুলো লোক'নেই কম পক্ষে একজন লোক কোথাও লুকিয়ে থেকে পাহারা দিচ্ছে। একজন লোক নিজেকে লুকিয়ে রেখে ক্যাম্প ও ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখতে পারে, এমন সম্ভাব্য সব জায়গায় চোখ বলাতে শুরু করল শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল জায়গাটা। একটা পাথরের থেকে ঝুল বারান্দার মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কিছুটা। সেখানে বসে একজন লোকের পক্ষে একই সঙ্গে ক্যাম্প ও ঘোড়া—দুটোর ওপরই নজর রাখা সম্ভব।

মৃত ইণ্ডিয়ানের লাশের কাছ থেকে সরে গেল সে। তারপর অন্য গার্ড যেখানে লুকিয়ে আছে বলে ধারণা করছে, সেদিকে চলতে শুরু করল।

বোম্বারের পর বোম্বার বেয়ে দ্বিতীয় পাহারাদারের কাছাকাছি পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টার মত সময় লেগে গেল ওর। এতটা পথ সে কেবল অনুমানের ওপর ভর করে এসেছে। সে এখনও জানে না, লোকটা আদৌ এখানে আছে কি না। তবে আছে ধরে নিয়ে এগোচ্ছে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে ট্রিস্ট, একজন ইণ্ডিয়ান গার্ড পাহারা দেয়ার সময় সাধারণত এক জায়গাতেই বসা কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে খুব বেশি নড়াচড়া করে না। কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ এই কাজটা করার সময় কিছুটা অসহিষ্ণুতায় ভোগে। সে হাঁটাইটি অথবা ধূমপান করে একঘেয়েমি কাটানোর চেষ্টা চালায়।

চুপচাপ অপেক্ষা করছে ও। জানে, ওই ছায়ার মধ্যে যদি কেউ লুকিয়ে থাকে, একসময় না একসময় তাকে নড়াচড়া করতেই হবে। একসময় অপেক্ষার ফল পেল ও। অন্ধকার জায়গাটায় কালো জমাট বাঁধা একটা ছায়া নড়ে উঠল। পাথরের প্রান্তে চলে এল লোকটা নীচে কালো জমাট বাঁধা ছায়ার মত শুয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখল এক নজর। ওর সঙ্গী পাহারাদার যে পাথরে থাকার কথা, সেদিকে তাকাল এক পলক। তারপর পাথরের কিনারা থেকে পিছিরে গিয়ে কম্বল বিছিয়ে বসল।

ট্রিস্ট এবার ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে শুরু করল। দু'দিক থেকে সে গার্ডটার কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে। তবে যদি লোকটার পেছনে যেতে চায়, তা হলে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও ওর চোখে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। আর যদি পাশ থেকে যায়, তা হলে ওর চোখে পড়ার ঝুঁকিটা এড়াতে পারলেও ওকে

মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বিপদের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত লোকটার পেছনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

অন্ধকারে চারদিকে তাকিয়ে একটা ছোট পাথরের টুকরো পেয়ে গেল ও। ওটা তুলে নিয়ে লোকটার ওপাশে ছুঁড়ে দিল। ক্ষীণ একটা শব্দ করে মাটিতে পড়ল পাথরের টুকরোটা। সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তও দ্বিধা না-করে সামনের ছোট পরিসরটা পেরিয়ে গার্ডের পেছনে চলে গেল ট্রিস্ট নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। আশঙ্কা করছে, হয়তো পাথরের শব্দটা শোনেনি এবং ট্রিস্টকে ওই জায়গাটুকু পেরিয়ে আসতে দেখে ফেলেছে। এখনই হয়তো একটা গুলি ছুটে আসতে পারে ওর দিকে। কিন্তু ওর আর কিছুই করার নেই।

হাঁটু গেড়ে বসে চুপচাপ বসে আছে ও। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ভয় আর উত্তেজনায়। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট...। মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। নিশ্চিত্ত বোধ করছে পাহারাদার দেখতে পায়নি ওকে। সোজা হলো ও। সন্তর্পণে এগোল। কয়েক পা যেতেই পায়ের নীচে একটা পাথর ঠেকল। নিচু হয়ে পাথরটা বের করে নিল। কারণ পা সরে গেলে পাথরটা হয়তো নড়ে উঠতে পারে। তাতে সামান্যতম শব্দ হলেও সতর্ক হয়ে যাবে গার্ড। আরেকটু এগোল সে, আরেকটু। একদম গার্ডের পেছনে ওর ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়াল ট্রিস্ট। তারপর হাত বাড়াল।

গলায় আচমকা প্রচণ্ড চাপ খেয়ে ছটফটিয়ে উঠল অ্যাপাচি। তবে ওর সংগ্রামটা নেহাত ক্ষণস্থায়ী আর প্রায় শব্দহীনই হলো। প্রাণহীন গার্ডের লাশটা আঁস্টে করে পাথরের ওপর শুইয়ে দিল ট্রিস্ট। আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলটা আঁকড়ে ধরেছিল ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা। সে-অবস্থায় মারা গিয়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় খামচে ধরা রাইফেলটা ওর মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নেয়া সম্ভব হলো না।

পাথরের অন্য প্রান্তে চলে গেল ও। তারপর নামতে শুরু

করল। কিছুক্ষণ পরে যেখানে ঘোড়াগুলো বাঁধা, সেখানে গিয়ে থামল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পরবর্তী আধঘণ্টা ওখানে দাঁড়িয়ে রইল ট্রিস্ট। অন্য কোনও গার্ডের সাড়া-শব্দ কিংবা নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যায় কি না সে আশায় চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে। তেমন কোনও আশঙ্কা করছে না সে, তবু সামান্যতম ঝুঁকিও নিতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে ফের সামনে এগোল। একটা ঘোড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। ঘোড়াটা সামান্য চঞ্চলতা দেখিয়েই থেমে গেল ফের। মৃত ইণ্ডিয়ানটার বিছানো কম্বল নিয়ে এসেছিল ও। ঘোড়াটা মাথা তুলে কম্বলটার দিকে তাকাল। তারপর কম্বল থেকে পরিচিত গন্ধটা পেতে নাক ঝাড়ল স্বস্তি পাওয়ার ভঙ্গিতে। একটু পিছিয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে ঝিমোতে শুরু করল। আরেকটা ঘোড়ার সামনে গেল ট্রিস্ট। একই প্রতিক্রিয়া দেখাল সেটাও।

একদিকের বোন্ডারে বাঁধা রশি কেটে দিল ট্রিস্ট। তারপর ঢুকে গেল ঘোড়ার লাইনের ভেতর। দু'একটা ঘোড়া একটু চঞ্চল হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখাতে ওগুলোর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। ওর শান্ত স্পর্শ আর কম্বলের পরিচিত গন্ধে স্থির হয়ে গেল ঘোড়াগুলো। এবার অপর পাশের পাথরে বাঁধা মাথাটাও কেটে দিল। এরপর সবগুলোর গলায় বাঁধা রশির সঙ্গে লাগানো রশিটা ধরে আস্তে আস্তে ঘোড়াগুলোকে চলার ইঙ্গিত দিল। ওর ইঙ্গিতে মরুভূমির দিকে এগোল সবগুলো। খুরের ঘায়ে মৃদু শব্দ উঠল। তবে ঘুমন্ত ইণ্ডিয়ানদের সচেতন করে তোলার মত জোরদার হলো না ওই শব্দ।

খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে এসেই কোন্টটা বের করল ও হোলস্টার থেকে। একটা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে গুলি ছুঁড়ল। তারপর ঘোড়াটার পেটে প্রচণ্ড গুঁতো লাগাল হাঁটু দিয়ে। আচমকা বেমক্কা গুঁতো খেয়ে চেষ্টা করে উঠল ঘোড়াটা। লাফিয়ে আগ বাড়তে

গিয়ে সামনের ঘোড়াটার ওপর গিয়ে পড়ল। আবার গুলি চালানল ট্রিস্ট। এবার পেছনে ফেলে আসা ক্যাম্পের দিকে। পর পর গুলির শব্দে আরোহীবিহীন ঘোড়াগুলো চোঁচাতে চোঁচাতে ছুটতে শুরু করল। এরপর অনবরত গুলি ছুঁড়তে লাগল সে। উদ্দেশ্য, পেছনে ক্যাম্পের ভেতর ততক্ষণে জেগে ওঠা হতচকিত ইণ্ডিয়ানদের আরও ভড়কে দেয়া। সামনের অন্ধকার থেকে ছুটে আসা গুলির ভয়ে পিছু নিতে ইতস্তত করবে ওরা। ওরা ধাতস্থ হওয়ার আগেই ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে চায় সে।

অ্যাপাচিরা প্রথমে দু'একটা গুলি ছুঁড়ে জবাব দিলেও পরে ক্ষান্ত দিল। পায়ে হেঁটে সশস্ত্র শত্রুর পিছু নেয়ার অসারতা বুঝতে পেরেছে ওরা। আর কোনও গুলি এল না।

অন্য ঘোড়াগুলোর পিছু ধাওয়া করতে করতে হাসল ট্রিস্ট। ঘোড়াগুলোর দৌড়ের গতি কিছুটা কমে আসতে কর্কশ স্বরে চোঁচিয়ে উঠল। আবার নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো।

যে-ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসেছে, সেটাকে পুরে ছোটাল সে। ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পটা পেছনে ফেলে স্যালকে যেখানে রেখে এসেছে, সেদিকে চলল। চাঁদের আলোয় ঘোড়াটাকে দেখল যেখানে রেখে গেছে, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ট্রিস্টের সাড়া পেয়ে মাথা তুলল মেয়ার, ডেকে উঠে অভ্যর্থনা জানাল।

‘আস্তু, বাছা!’ ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলল ট্রিস্ট। ‘দেখছিস না, সঙ্গে মেহমান? ভদ্রতা বজায় রাখা উচিত তোর।’

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নামল ও। রাইফেল তার ক্যান্টিনটা ভুলে নিল। মেয়ারের লাগাম হাতে নিয়ে ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ধার করা ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিল যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। যে-বেগে এসেছিল, ঠিক সে-বেগেই ছুটল ঘোড়াটা নিজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে।

‘ঠিক আছে, স্যাল,’ মেয়ারের সঙ্গে কথা বলল। ‘এবার আমরা একটু বিশ্রাম নিই। কী বলিস?’

কথাটা বলে মাথা ঘোরাতেই শব্দটা শুনল ও। একই সঙ্গে নড়াচড়াটাও চোখে পড়ল। তাঁদের আলোয় জমাট বাঁধা ছায়ার মত দেখাচ্ছে লোকটাকে। সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসছে ঘোড়াসহ। দ্রুত ঘোড়া ছোঁটাচ্ছে লোকটা, ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ওর গায়ে এসে পড়বে।

আরেকটু কাছে আসতে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল। মনিবের পা মাটি ছুঁতেই একপাশে সরে গেল ঘোড়াটা। লাফ দিয়ে তেড়ে এল লোকটা। তেড়ে গেল ট্রিস্ট নিজেও। লোকটাকে ওর ওপর চড়াও হওয়ার সুযোগ দিতে চায় না সে। লোকটার হাতে একটা ছুরি। তাঁদের আলোয় ফলা ঝকঝক করছে। সাদা মানুষটার বুকে ওটা আমূল ঢুকিয়ে দেয়ার নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রিস্টও। ওর ছুরিধরা হাতটা ধরে ফেলল। হাতটা নামিয়ে এনে ওর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়ার আশ্রয় চেষ্টা চালাচ্ছে ইণ্ডিয়ান। আর ট্রিস্ট চাইছে ওটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখতে। দুই তরফ থেকেই প্রচণ্ড চাপে কাঁপছে দু’জনের হাতদুটো।

লোকটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। হাতের চাপ থেকেই তা টের পাচ্ছে ট্রিস্ট। একটু ঢিলা পেলেই ছুরিটা আমূল বসে যাবে ওর বুকে। তবে প্রতিপক্ষের শক্তিটাও নিশ্চয় অনুভব করতে পারছে ইণ্ডিয়ান।

সুবিধা করতে না-পেরে এবার ভিন্ন পথ ধরল লোকটা। ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাল। ঠিক এটাকেই সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল ট্রিস্ট। ইণ্ডিয়ানটার হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টায় চাপে একটু ঢিলা পড়তেই আচমকা ঠেলা দিল ও। ফলে ভারসাম্য হারাল লোকটা, একই সঙ্গে প্রায় ওড়ার মত করে

লাফিয়ে উঠে লোকটার শরীরের ওপর নিজের শরীরের ভার চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ট্রিস্ট। শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল লোকটা। কিন্তু ভারী শরীরের চাপে টাল সামলাতে না-পেরে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল। লোকটার কুঁচকিতে স্পারঅলা বুটের প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল ট্রিস্ট। ব্যথায় ককিয়ে উঠল ইণ্ডিয়ান। বারকয়েক গড়ান খেল। তারপর উঠে চোঁচা দৌড় লাগাল নিজের ঘোড়ার দিকে। প্রায় লাফিয়ে ওটার পিঠে চড়ে বসে হারিয়ে গেল মরুভূমিতে।

এরকম হুড়োহুড়ি পছন্দ হচ্ছিল না স্যালের। চঞ্চল হয়ে উঠল ও। ঘোড়ার কাছে গিয়ে ওটার মাথায় হাত বাড়াল ট্রিস্ট। ‘ঠিক আছে রে, বাছা। এবার শান্ত হ।’ ক্যান্টিন আর রাইফেলটা তুলে নেয়ার জন্যে নিচু হতেই দেখল, ক্যান্টিনটা পড়ে আছে, কিন্তু রাইফেলটা নেই। গড়ান দেয়ার সময় হাতের কাছে রাইফেলটা পেয়ে ওটা তুলে নিয়ে গেছে ইণ্ডিয়ান। উত্তেজনায় সেটা খেয়াল করে উঠতে পারেনি ট্রিস্ট। খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ল ও।

ঠিক এসময় অন্ধকার থেকে একটা গুলি এল। ট্রিস্টের মাথার ওপর বাতাসে শিস কেটে চলে গেল। স্যালের পেটে হাঁটুর গুঁতো লাগাল ট্রিস্ট। পূর্ণোদ্যমে ছোটাল ওটাকে।

মাইল কয়েক একই গতিতে ছুটে গতি কমাল সে। হন্টন গতিতে চলতে দিল স্যালকে। আরও মাইলখানেক গিয়ে পিঠ থেকে নেমে ওটার পাশে পাশে হেঁটে চলল নিজেও।

ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপর একটা হাত রেখে বলল, ‘বুঝলি, স্যাল, দেখা যাচ্ছে সবগুলো ঘোড়া মরুভূমিতে তাড়িয়ে দেয়ার পরও একটা ঘোড়া ওদের রয়ে গেছে। ওটায় চড়ে পালিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোকে খুঁজে নিয়ে আসবে ওরা। তবে এতে ল্লাভ কী হয়েছে জানিনা? মহামূল্যবান কিছু সময় আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এটা

আমাদের খুব কাজে লাগবে, কী বলিস?’

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল ওর। স্যালকে ফের বলল, ‘কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অতিরিক্ত রাইফেলটা নিয়ে গেছে অ্যাপাচি ব্যাটা। ব্যাপারটা খুব খারাপ হলো আমাদের জন্যে।’ হাসল সে। ‘তবে সব ভাল যেমন সব সময় ভাল নয়, সব খারাপও তেমন খারাপ নয়। কিন্তু যা-ই বলিস, ওদের নেতা ইনজুনটা, বুঝলি, দারুণ বুদ্ধিমান। সব কিছু আগেভাগে অনুমান করে নিতে পারে। ও ঠিকই আন্দাজ করে নেবে আমরা এরপর কী করতে যাচ্ছি।’

চার

দূরে পাহাড়ের চূড়োর ওপর দিয়ে মুখ দেখাতে শুরু করেছে সূর্য। অন্ধকার কেটে গেছে অনেক আগে। মরুভূমিতে চলন্ত মানুষ আর তার সঙ্গী ঘোড়াটার ওপর সূর্যের উত্তপ্ত রশ্মি তীরের ফলার মত পড়তে শুরু করেছে।

তাদের থেকে আরও আধমাইলটাক পেছনে আরেকজন লোক। উত্তপ্ত সূর্যের তাপে দন্ধ হতে হতে একটা ঘোড়া নিয়ে সে-ও এগোচ্ছে। লোকটা শা-তা-নে। ক্লান্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে অ্যাপাচি সর্দারকে।

শা-তা-নে যতটা না ক্লান্ত, তার চেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ। ক্ষোভ তার নিজের ওপর, একই সঙ্গে মৃত দুই পাহারাদারের ওপরেও। নিজেকে কিংবা পাহারাদারদেরকে ক্ষমা করতে পারছে না সে।

সাদা লোকটার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় হেরে গেছে ওরা। ওই দুই বেকুব হারার মাশুল গুনেছে নিজেদের জীবন দিয়ে। আর সে-ও এক ব্যর্থ সর্দার। লোকটাকে শিকার করতে বেরিয়ে নিজেদের তার শিকার বানিয়ে ফেলেছে সে।

গত রাতে ওর উচিত ছিল পাহারাদারদের সংখ্যা আরও বেশি রাখা। আর তাদের ক্যাম্পের মধ্যে না রেখে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা। ও আসলে শত্রুকে খাট করে দেখেছিল। তাই তার মাশুলও গুনতে হয়েছে অমন করে। লোকটা তার দু'জন সেরা যোদ্ধাকে হত্যা করেছে, তাদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছে মরুভূমিতে। বুঝতে পারছে, সর্দার হিসেবে এটা তার জন্যে চরম বেইজ্জতির ব্যাপার। অথচ ওর উচিত ছিল, লোকটার জন্যে ফাঁদ পাতা। কিন্তু কে জানত যে, লোকটা প্রাণের ভয়ে খরগোসের মত লেজ তুলে না-ছুটে উল্টো এসে তাদের ওপর চড়াও হবে!

বালুর ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে তাকাল ও। বালির আকৃতি পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ট্র্যাকের চিহ্ন পড়ায় ওর জুড়ি খুব কমই আছে। বালির ওপর দিয়ে একটা গিরগিটি হেঁটে গেলেও এর গতিবিধি স্পষ্ট পড়ে ফেলতে পারে। সাদা লোকটার ঘোড়ার পায়ের ছাপ পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। লোকটা এখন ঘোড়ায় চড়ে এগোচ্ছে।

একটু পরে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। প্রায় লাফ দিয়েই চড়ে বসল ঘোড়াটার ওপর। সাদা লোকটা ঘোড়াগুলোকে মরুভূমিতে খেদিয়ে দেয়ার পর একটা ঘোড়াই ছিল ক্যাম্পে। ও এটা নিয়ে শিকারের পিছু ধাওয়া করতে চাইলে অন্যরা আপত্তি জানিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটার পিঠে চড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া ঘোড়াগুলোকে খুঁজে আনা। কিন্তু শা-তা-নে রীতিমত ঘৃণা বোধ করেছে কাজটা করতে। সাদা লোকটার স্পর্ধায় রাগে ব্রহ্মতালু

জ্বলে উঠেছে ওর। সঙ্গীদের বলেছে, ও ঘোড়া নিয়ে বেরোচ্ছে। লোকটাকে ধাওয়া করে ওর মাথার খুলি কেটে না-আনা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যে থামবে না ও।

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘোড়া ছুটিয়ে গেল ট্রিস্ট। এরপর হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ওকে।

আচমকা হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল ট্রিস্ট নিজেকে। ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলতে গেল। শুনকো কর্কশ স্বর বেরিয়ে এল গলা দিয়ে, 'স্যাল, আমার অবস্থা কাহিল। পায়ে জোর পাচ্ছি না আর। মোকাসিনের ভেতর বালি ঢুকে যাচ্ছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

একটা ক্যান্টিনের মুখ খুলে প্রাণভরে পানি খেল ও। এর বেশিরভাগ পানি ঘোড়াটাকেই খাইয়েছে। এখন তার পানি দরকার। সামনে হয়তো পানি পেতে হবে, নইলে পানির অভাবে বুক শুকিয়ে মরতে হবে।

আরেকটা ক্যান্টিনে অবশ্য এখনও কিছু পানি বাকি আছে। তবে তা নেহাত সামান্য। যেটুকু পানি আছে, হেঁটে গেলে হয়তো তা দিয়ে পোষানো যাবে। কিন্তু ঘোড়া নিয়ে ছুটতে গেলে দু'দফা খেলেই তা ফুরিয়ে যাবে। বিশেষ করে তার শরীরের এই দুর্বল অবস্থায় বারবার পানির প্রয়োজন হবে।

একটা চড়াইয়ে এসে থামল ট্রিস্ট। চোখের ওপর একটা হাত রেখে পেছনে চাইল। ঘোড়াটাকে দেখল ও। ওর মনে হলো ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসা লোকটা রাতের সে-লোকটাই হবে। চট করে কয়েকটা পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকাল ট্রিস্ট। ঘোড়াটাকেও লুকিয়ে ফেলল। রাইফেলটার জন্যে আফসোস হলো ওর। অস্ত্রটা থাকলে এখন ওই ইণ্ডিয়ানকে চমৎকার ভাবে অ্যামবুশ করা যেত। কিন্তু পিস্তল দিয়ে তা সম্ভব নয়। বেলেটে গোঁজা কার্তুজগুলো পরখ করে দেখল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল পেছনের লোকটার

জন্যে । কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম নেমে আসছে চোখের ওপর । বারবার কপাল মুছে নিচ্ছে ট্রিস্ট । ঘামের ফোঁটা চোখে এসে পড়লে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের জন্যে ।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে । প্রতিটি মুহূর্ত অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছে ট্রিস্টের কাছে । আকাশে জ্বলন্ত সূর্য আর নীচে উত্তপ্ত বালি—পুরো পৃথিবীটাকে একটা বিশাল আগুনের চুলোর মত মনে হচ্ছে । আর সময় যেন আটকে গেছে তাতে । ট্রিস্টের মনে হচ্ছে সে যেন অনন্তকাল ধরে বসে আছে তাপদগ্ধ ওই পাথরগুলোর কাছে, আর অসহনীয় গরমে ওর সারা শরীর আগুনের ওপর শিকে গাঁথা মাছের মত ঝলসে যাচ্ছে । নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর । নাক দিয়ে যেন বাতাস নয়, আগুনের হলকা ঢুকছে আর বেরোচ্ছে ।

তবু দাঁতে দাঁত কামড়ে অপেক্ষা করছে ও । জানে, শত্রু একদম কাছে চলে এসেছে । এখন নড়াচড়া করতে গেলেই স্রেফ মরতে হবে । ওর একমাত্র কামনা, নিজেই যেন আগে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাতে পারে ।

ঘোড়াটা এখন পাথরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে । মনে হয় উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা । তবে এটাও হতে পারে অ্যাপাচি লোকটা ওটাকে এদিকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে । শুকনো ঠোঁটদুটো চাটল ট্রিস্ট । হাসল । তারপর আচমকা ঢিল দিল সতর্কতায় । অ্যাপাচি টের পেয়ে গেছে, ও এখানে গা ঢাকা দিয়েছে । এখন সম্ভবত ঘুরে আসছে আরেক পাশ থেকে ।

ঘুরে আসছে! চিন্তাটা একটা ধারালো তীরের মতই যেন গঁথে গেল ট্রিস্টের মস্তিষ্কে । স্যাল! স্যাল ওখানে একা রয়েছে । অ্যাপাচি সম্ভবত ওদিকেই যাচ্ছে । লাফিয়ে উঠল ট্রিস্ট । পড়িমরি করে একটা পাথরের ওপর চড়ে প্রায় গড়িয়ে নামল ওপাশে । আরেকটা পাথরে উঠতে স্যালকে দেখল । দাঁড়িয়ে আছে

ঘোড়াটা । মনিবকে দেখে মাথা ঝাঁকাল ।

পাথরের ওপর থেকে নেমে কাছাকাছি আরেকটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল ট্রিস্ট । ওখান থেকে স্যালকে দেখতে পাচ্ছে । সুতরাং অ্যাপাচি স্যালকে চুরি করতে এলে ওর চোখে না-পড়ে পারবে না ।

মাত্র থিতু হয়ে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় এল আঘাতটা । মাথাটা বিম্বিম্ব করে উঠল ওর । ভাগিস, গলার ব্যাণ্ডানাটা মাথায় জড়ানো ছিল, আর ওটার ওপর হ্যাট পরা ছিল । নইলে ওই আঘাতে জ্ঞান হারাত সে ।

আঘাতের প্রচণ্ডতায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ও, সে অবস্থায় গড়িয়ে সরে গেল কিছুটা । উঠে দাঁড়ানোর অবকাশটা পেতে চাইছে । ব্যথায় ওর চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে । সে-অবস্থায় বাদামি রঙের বাহু আর সুদর্শন চেহারাঅলা লোকটাকে দেখল সে । লাফিয়ে খাড়া হলো ট্রিস্ট । ইণ্ডিয়ানটার নাকের ওপর ঝেড়ে দিল ঘুসিটা । ঘোঁৎ করে উঠে পিছিয়ে গেল ইণ্ডিয়ান । ওর নাক থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখল ট্রিস্ট ।

লাফ দিল ও লোকটার দিকে । তার আগে সরে গেল অ্যাপাচি একদিকে । ঝট করে ছুরি বের করে নিল কোমর থেকে । ট্রিস্টও হাত বাড়াল নিজের ছুরির খাপের দিকে । তারপর সতর্ক পায়ে এগোল অ্যাপাচির দিকে ।

সতর্ক পদক্ষেপ অ্যাপাচি লোকটারও । পূর্ণ দৃষ্টিতে ট্রিস্টের দিকে তাকাচ্ছে সে । ট্রিস্ট অবাক হয়ে দেখল লোকটার চোখে সমীহ আর প্রশংসার ভাব ।

‘সাদাচোখো, আচমকা কথা বলে উঠল লোকটা । ‘তোমার মত একজন ছেলেকে পেটে ধরতে পারলে গর্বে বুক ফুলে উঠত একজন অ্যাপাচি মায়ের । তুমি একজন সাহসী মানুষ । তুখোড় যোদ্ধা । কী নাম তোমার?’

শুকনো ঠোঁটদুটো আবার চেটে নিল ট্রিস্ট । কর্কশ স্বরে বলল,
'আমি জেরেমিয়াহ্ ট্রিস্ট । তুমি কে?'

কৌশলী ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরল ইণ্ডিয়ান । 'আমি শা-তা-নে ।
আমি নেকড়ের মত হিংস্র, হরিণের মত ক্ষিপ্র । তুমি আমার সঙ্গে
পারবে না, সাদাচোখো ।'

বৃত্তাকারে একে অন্যকে ঘিরে ঘুরছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী । তাদের
হাতে ধরা ঝকঝকে ফলাঅলা ছুরি দুটো যেন প্রখর রোদে
শয়তানের জিভের মত ঝলসে উঠছে । রক্ত ঝরানোর তৃষ্ণায়
অধীর । একে অন্যের চোখে তাকিয়ে দুই যোদ্ধা । কালো চোখের
ক্রুর দৃষ্টি যেন গেঁথে যেতে চাইছে ধূসর চোখের ভেতর । কিন্তু
ধূসর চোখের ভেতর থেকেও তেমনি ক্রুর দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে ।
কঠিন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টির নীরব সংঘর্ষে যেন আগুন জ্বলে উঠতে
চাইছে ।

কথা বলে নষ্ট করার সময় আর নেই । মরা অথবা মারার
সময় ঘনিয়ে এসেছে । দ্রুত নড়ে উঠল শা-তা-নে । 'এতক্ষণের
পাঁয়তারা বাদ দিয়ে আচমকা র্যাটল সাপের মত ছোবল মারার
ভঙ্গিতে লাফ দিল সামনে । বুকের কাছে তীক্ষ্ণ খোঁচার মত যন্ত্রণা
অনুভব করল ট্রিস্ট । কিন্তু সেদিকে তাকাল না সে । ওর মাথার
ভেতরটা ধপ ধপ করছে ব্যথায় । মুখের একপাশ থেকে রক্ত
ঝরছে । ইণ্ডিয়ানটার কাছ থেকে পিছিয়ে সরে যেতে গিয়ে পিঠেও
ছুরির খোঁচা খেল

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল ট্রিস্ট চরকির মত । ওর ভেতর থেকে
নিমেষে যেন সব ভয় চলে গেছে । মৃত্যুকে তেমন ভয়ঙ্কর মনে
হচ্ছে না এখন

ওর একমাত্র উদ্দেশ্য এখন শত্রুহনন । শত্রুর ওপর জয়ী
হতেই হবে ওকে । নইলে মরতে হবে ওর হাতে । এর মাঝামাঝি
কোনও পথ আর নেই ।

প্রতিহিংসার নেশায় উন্মুখ উন্মত্ত দুই নেকড়ে মত একে অন্যকে ঘিরে ঘুরছে ওরা। একে অন্যের দুর্বলতা খুঁজছে। একটু ফাঁক পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একেকবার পিছিয়ে যাচ্ছে ওরা। ফের লাফিয়ে এগিয়ে আসছে সামনে। বেশ কিছু সময় ধরে এভাবেই চলল। ট্রিস্টের মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটাও জানে, বাস্তবে এক মিনিটও হবে না।

আচমকা ঝাঁপ দিল ও অ্যাপাচিকে লক্ষ্য করে, চকিতে সরে গেল লোকটা। টাল সামলাতে না-পেরে মাটিতে পড়ল ট্রিস্ট। চোঁচিয়ে উঠল।

যেমনটি আশা করেছিল, তেমনটি ঘটল। লাফ দিল শা-তা-নে। ট্রিস্টের ওপর উদ্যত ছোরা হাতে ঝুঁকতে ওর ছুরি ধরা হাতটা ধরে ফেলল সে। অপর হাতে প্রচণ্ড ঘুসি ঝাড়ল।

ককিয়ে উঠল শা-তা-নে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো ওর। চোখে অন্ধকার দেখল। সামলে ওঠার আগে ট্রিস্ট আবার আঘাত করল ওকে। এবার পেটে—এবং এরপর আবার চোয়াল সহ করে।

এবার জ্ঞান হারাল শা-তা-নে। ট্রিস্ট কয়েক ফুট দূরে একটা পাথরের ওপর বসল উবু হয়ে। সতর্ক। যে-লোক ওর সামনে অচেতন হয়ে পড়ে আছে, সে একজন অ্যাপাচি। যে-কোনও মুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে লোকটা।

আর ও ইচ্ছে করলে এখন লোকটাকে মেরে ফেলতে পারে। ছুরিটা বুকের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই অ্যাপাচির জারিজুরি শেষ। কিন্তু ট্রিস্ট তা করবে না। অজ্ঞান শত্রু আর মৃত মানুষ ওর কাছে সমান।

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে হাঁফাচ্ছে ও। ব্যথায় চোখ কুঁচকে আছে। কপাল থেকে ঘাম বেয়ে পড়ছে চোখের কোনায়। চোখ জ্বালা

করছে। মাথার ওপর কঠিন তপ্ত আকাশ আর নীচে পায়ের পাতায় ফোসকা ফোটানো বালি। অপেক্ষা করছে ট্রিস্ট।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল শা-তা-নে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা ওকে পাগল করে দিচ্ছে। কোনও শব্দ করল না সে। প্রতিপক্ষকে দেখল একটা পাথরের ওপর ঘসা ওকে দেখছে শান্ত চোখ মেলে।

‘আহ, শেষ পর্যন্ত তা হলে জ্ঞান ফিরে পেয়েছ?’ ফ্যাকাসে মুখে মৃদু হাসার চেষ্টা করল ট্রিস্ট। কিন্তু ব্যথায় ফের মুখ কুঁচকে ফেলল। একটা হাত তুলে অ্যাপাচির ঘোড়াটাকে দেখাল। ‘ওটায় চড়ে বসো। তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারতাম। রাতে যারা আমার ওপর আক্রমণ করতে এসেছিল, তাদের খুন করেছি। কিন্তু শুধু অ্যাপাচি মেরে বেড়ানো আমার কাজ নয়। তা ছাড়া তোমার মত সাহসী যোদ্ধাকে মারতে আমার একটুও ভাল লাগবে না। তুমি চলে যাও।’

দীর্ঘ একটা মিনিট ট্রিস্টের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যাপাচি সর্দার। তারপর নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল। ট্রিস্ট নিজেও ফিরে চলল স্যালের কাছে। আচমকা অ্যাপাচির তীক্ষ্ণ গলা শুনল, ‘জের-মি-ট্রি-ই-ই-স্ট!’

ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে। লোকটিকে ঘোড়া নিয়ে ওর দিকে আসতে দেখল। ওর দু’হাতে ধরা একটা রাইফেল। রাইফেলটা চিনতে পারল ও। নলটা ট্রিস্টের দিকে নিচু করে ধরা। কাছে এসে থামল লোকটা। বলল, ‘সাদা লোকেরা যারা আমার পেছনে লেগেছিল, আমি ওদের সবাইকে শেষ করে দিয়েছি। কিন্তু আমি তাদের একমাত্র যোদ্ধা লোকটাকে খুন করতে চাই না। আমি তোমাকে জীবনটা উপহার দিলাম।’

রাইফেলটা আকাশের দিকে তুলে ধরল শা-তা-নে। ট্রিস্টের দিকে তাকিয়ে মাথা নত করল সমীহের সঙ্গে। তারপর

ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল। ওর পিঠের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ট্রিস্ট। লোকটার শরীর আস্তে আস্তে আবছা হতে হতে মরুভূমিতে মিলিয়ে গেল। নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে-ও।

মেয়ারের পিঠে চড়তে চড়তে বলল, ‘ওই লোকটা আমার সবচেয়ে সেরা রাইফেলটা চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্যে আমার একটুও খারাপ লাগছে না। আমার ধারণা, জয়টা শেষ পর্যন্ত আমারই হয়েছে। অবশ্য ও চাইলে রাইফেলের গুলিতে আমাকেও শেষ করে দিতে পারত। সুতরাং ঠিক বুঝতে পারছি না...তুই কী বলিস, স্যাল?’

ঘোড়ার পেটে হাঁটুর গুঁতো লাগাল ও। ঘোঁৎ করে উঠে আগে বাড়ল ওটা। যেন মনিবের কথায় দ্বিমত করার কোনও কারণ দেখছে না সে সেটাই জানিয়ে দিল।

‘চল, বাছা, এবার তা হলে টুসানের পথ ধরি।’

প্রমাণ

লাইব্রেরি ঘরটা বড়। মাঝখানে মেহগনি কাঠের প্রশস্ত টেবিল। টেবিলের কাছেই কুঁকড়ে-মুকড়ে পড়ে আছে লাশটা। ওটার ডান হাতে ধরা একটা .৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার। কপালের ডানপাশে পোড়া করডাইট আর রক্তের মিশেলে তৈরি কালচে গোল গর্ত, মাথা ভেদ করে গেছে গুলি

নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল ম্যাট স্কট। কাছে দাঁড়ানো খানসামার দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আত্মহত্যা। কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারছি না। বুড়ো আরলেপ তো জানতাম সুখেই ছিল। জীবনটাকে উপভোগ করত। সে কেন হঠাৎ আত্মহত্যা করে-বসবে? প্রচুর টাকা-পয়সা ওর, সুন্দর দুটি ছেলেমেয়ে। কখনও দেখে মনে হত না কোনও সমস্যা আছে। মনে হত দারুণ সুখী এক মানুষ। এমন মানুষ হুট করে নিজেকে শেষ করে ফেলবে, বিশ্বাস হতে চাইছে না।' মাথা নাড়ল সে। 'মোটাই না।'

'মাফ করবেন, স্যর,' বলল খানসামা। 'কিন্তু ইদানীং তাঁকে বেশ হতাশ মনে হচ্ছিল। মনে হত কোনও একটা সমস্যা আছে।'

'কী রকম?' স্কটের ঘন ভুরু জোড়ার নীচে স্থির, কৌতূহলী নীল দু'চোখ নিবদ্ধ হলো খানসামার ওপর ও একজন ল-অফিসার। খানসামার চোখে প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। তবে তাকে দেখে সে রকম কিছু মনে হয়। আচার-আচরণে যথেষ্ট

বন্ধুভাবাপন্ন। গ্রিনট্রি কাউন্টির এই পাহাড়ি গ্রামটিতে সে-ই একমাত্র আইনের লোক। এসব পাহাড়ি গ্রামে খুন-খারাবি খুব একটা ঘটে না বললেই চলে। এই ঘটনাটা স্কটকে নাড়া দিয়েছে। জীবনে এই প্রথমবার নিজের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরার মত একটা ব্যাপার যেন ঘটতে দেখল সে। এলাকার মানুষের মধ্যকার ছোটখাট ঝগড়াঝাঁটি মেটানোর কাজটা তাকে প্রায় নিত্যদিনই করতে হয়। কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা? খুন?

‘সমস্যাটা ঠিক কী, আমি নিজেও নিশ্চিত নই, স্যর,’ মিনমিন করে বলল খানসামা। ‘তবে তাঁর মেয়ে মি. ইয়োডর নামের ওই পোলো খেলোয়াড়ের সঙ্গে নিজের এনগেজমেন্টের কথা ঘোষণা করার পর থেকে তিনি কেমন যেন বিষণ্ণতায় ভুগতে শুরু করেছিলেন।’

‘তাই নাকি? মজার ব্যাপার তো! কখন এসেছিল এখানে মি. ইয়োডর?’

‘দু’সপ্তাহও হয়নি, স্যর।’ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল খানসামা। ‘এই বাগানেই তাঁদের এনগেজমেন্ট পার্টি হয়েছিল।’

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শেরিফও। ঝড়-বৃষ্টির রাত। অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাগানের দূর কোনায় দাঁড়ানো সাদা ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো মাঝে মধ্যে চোখে পড়ছে তখন। এ-অঞ্চলে এই গাছগুলো একশ’ মাইল দূর থেকেও দেখা যায়। এগুলো কেবল আরলেপের বাগানেই আছে। শুধু তা-ই নয়, তার বাগানে আরও কিছু বিরল গাছ আছে, যেগুলো নিয়ে রীতিমত গর্ববোধ করত সে। বিভিন্ন প্রজাতির দুর্লভ গাছ সংগ্রহের বাতিক ছিল আরলেপের।

‘মি. ইয়োডরকে পছন্দ করেনি ও?’ স্কটের কথাটা প্রশ্নের চেয়ে মন্তব্যের মতই শোনা গেল বেশি।

‘ওর সঙ্গে ভদ্র ও সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলতেন তিনি,’ বলল খানসামা। ‘তবে নিজের মেয়ের জামাই হিসেবে মনে হয়নি যে মেনে নিতে পারতেন।’

‘তোমার এরকম মনে হলো কেন?’

‘খানসামার কথায় সন্দেহ হচ্ছে স্কটের। লোকটা মনে হয় আরলেপের মৃত্যুর ব্যাপারে ইয়োডরকে জড়াতে চাইছে! অথচ আরলেপের মৃত্যুর সময় একমাত্র সে-ই ছিল সবচেয়ে কাছেপিঠে। তা ছাড়া চাকর হয়ে মনিবের মনোভাব নিশ্চিতভাবে বোঝার কথা নয় ওর। কিন্তু ওর কথাবার্তা ঠিক সেরকমই শোনাচ্ছে যেন!

‘না, মানে...’ ইতস্তত করছে খানসামা। ‘উনি যেভাবে মি. ইয়োডরের দিকে তাকাতে, দেখলে আপনারও হয়তো এমনটা মনে হতে পারত। তা ছাড়া...

‘তা ছাড়া!’

‘না, মানে...মি. আরলেপ সম্প্রতি একটা গোয়েন্দা দফতর থেকে বেশ কিছু চিঠি পাচ্ছিলেন। আমি নিশ্চিত, তিনি মি. ইয়োডরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন।’

‘তুমি দেখছি অনেক বিষয়েই নিশ্চিত হয়ে কথা বলছ। তা...সে-চিঠিগুলো কোথায় দেখতে পারি?’

‘ননা...মি. আরলেপ ওগুলো নষ্ট করে ফেলেছেন।’

শেরিফ স্কটের মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল। এই লোক দেখছি আবার সবজান্টা হতে শুরু করেছে।

‘তুমি কি গুলির শব্দ শুনেছিলে?’

‘না, স্যর। ঘণ্টা তিনেক আগে মি. আরলেপের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলাম। এরপর যখন তাঁর জন্যে সন্দের স্কচ আর সোডা নিয়ে আসি, তখন দেখি এ-অবস্থায় পড়ে আছেন। এরপর আমি আপনাকে খবর দিই।’

‘তাকে ডিনার দাওনি? ডিনারের সময় তো অনেক আগে

পেরিয়ে গেছে।’

‘ডিনারটা আমরা একটু দেরিতে করি। আজকের ডিনারে মিস আরলেপ, তাঁর প্রেমিক মি. ইয়োডর আর মাস্টার আরলেপের অংশগ্রহণের কথা ছিল। মনে হয়, ঝড়-বৃষ্টির কারণে দেরি হয়ে গেছে। আরও আগে তাঁদের এখানে এসে পৌঁছার কথা।’

মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে শেরিফ স্কটের। এই খানসামার ব্যাটা খানসামা তাকে নিয়ে খেলছে। বড় বেশি ধীর-স্থির আর উদাসীন ভাব দেখাচ্ছে লোকটা। যেন সে আগে থেকেই জানে তাকে কী-কী প্রশ্ন করা হতে পারে এবং জবাবে সে কী বলতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদে না গিয়ে একে নিয়ে কী করা উচিত, সেটা সিটি কর্পোরেশন নিশ্চয় জানে। নিজের কাছেই তার নিজেকে স্বীকার করতে হলো যে, সে একটি প্রায় গ্রাম্য শহরের সামান্য একজন ল-ম্যান মাত্র। খুনখারাপির মত জটিল কাজগুলোতে মাথা ঘামানোটা তার জন্যে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার মত বিশাল ব্যাপার। তবে সে যদি কেস সমাধান করতে পারে, তা হলে ক্যারিয়ারের জন্যে সামান্য সুবিধে হয়তো হতে পারে, কিন্তু ভুল করলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। আসল খুনিকে সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে তাতে।

‘আসতে যে দেরি হবে, সেটা ওরা তোমাকে ফোন করে জানায়নি?’

‘করেছিল, স্যর। এক ঘণ্টা আগে মি. ইয়োডর বেনেট থেকে ফোন করে জানিয়েছিলেন।’

‘এক ঘণ্টা আগে? তা হলে তুমি মি. আরলেপকে খবরটা জানাতে যাওনি কেন? তা হলে তো তার মৃতদেহটা আরও আগে দেখতে পেতে।’

‘আমাকে বলা ছিল মি. আরলেপকে ড্রিন্কেস সময় যেন বিরক্ত না করি। তাই জানানো হয়নি।’ একটু থেমে আবার বলল

খানসামা, ‘আমি সব সময় মনিবের আদেশ-নিষেধ মেনে চলি, স্যার।’

আবার মেজাজ হারাতে শুরু করল শেরিফ। এই হারামজাদা খানসামার বাচ্চার কাছ থেকে কোনও সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না...! ওর সব জবাব যেন আগে থেকে ভেবে রাখা। যেন জানে, ওকে কী-কী প্রশ্ন করা হতে পারে এবং সেসব প্রশ্নের জবাবও কী হতে পারে। লোকটাকে ধরে নিয়ে স্রেফ চাবকাতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। কিন্তু সে সিটি কর্পোরেশনের লোক নয়, তার সে অধিকার নেই।

‘তুমি তো সারাক্ষণই আছ। তোমার নজর এড়িয়ে বাইরের লোকের পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব?’

‘ন্-না...’ একটু ইতস্তত করল খানসামা। ‘তা হলে তাকে দেয়াল টপকে আসতে হবে। সেটা সম্ভব নয়।’

বাগানের দিকে তাকাল ফের স্কট। আলোকসজ্জার বাতিগুলো একবার নিভছে, আবার জ্বলছে। মিটিমিটি আলোয় বাগানের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের উচ্চতা মাটি থেকে বারো ফুটের কম নয়। ওটা কেউ টপকে আসতে হলে তাকে প্রচণ্ড শক্তিদর ও দক্ষ হতে হবে।

‘তুমি কি নিশ্চিত যে, এই অস্ত্রটা মি. আরলেপের?’ মৃতদেহের ডান হাতে ধরা অস্ত্রটার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা তৃতীয়বারের মত করল স্কট।

বিষণ্ণভাবে মাথা দোলাল খানসামা। তারপর বিনীতভাবে জানতে চাইল, ‘আপনার কি মনে হয় না এখন সিটি পুলিশকে ডাকা উচিত? আত্মহত্যা কিন্তু খুব মারাত্মক ঘটনা।’

খস খস করে নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা চিবুক চুলকাতে শুরু করল শেরিফ স্কট। ‘আত্মহত্যা! হ্যাঁ, ব্যাপারটা খানিকটা ওইরকমই দেখতে। তবে পুরোপুরি মনে হচ্ছে না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার আয়ত্তের বাইরে। আমার মনে হয় ওদের

ডাকাটাই সবচেয়ে ভাল হবে।' বলতে বলতে ডেস্কের ওপর রাখা টেলিফোন সেটের দিকে এগোল সে।

আচমকা ডোরবেলের শব্দে মাঝপথেই থেমে গেল। জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাল খানসামা।

'ঠিক আছে। ওদের ভেতরে নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল স্কট। ফের টেলিফোন সেটের দিকে চাইল। এগোতে গিয়ে ফের থেমে গেল। এরপর লাইব্রেরি রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে পেছন থেকে দরজা টেনে দিল। বসার ঘরে এসে ঢুকল আগন্তুকরা। পোড়খাওয়া চোখ মেলে দেখল স্কট ওদের। আরলেপদের দু'জনকে সে চেনে। বাকি দু'জনের মধ্যে একজন মেয়ে, আরেকজন নিশ্চয় ইয়োডর—দু'জনেই অপরিচিত ওর।

বিশালদেহী ইয়োডরকে যাচাই করল সে তীক্ষ্ণ চোখে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা লোকটা। নীলচে ধূসর চোখদুটো চকচক করছে। কিলবিলে পেশিবহুল শরীর। স্কট যেন লোকটার সঙ্গে মানুষের চেয়ে একটা জানোয়ারের বেশি মিল খুঁজে পাচ্ছে। ওর বিশাল গৌফঅলা মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল।

'আরে, শেরিফ স্কট যে! বাহ, কী ভাগ্য আমাদের সঙ্গে তোমাকে পেলাম!' প্যাট্রিসিয়া আরলেপই প্রথমে সম্ভাষণ জানাল ওকে। এরপর আরও কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল শেরিফের মুখের ভাবে গুরুতর কিছু একটার আভাস পেল যেন মেয়েটা। 'ইয়ে, মানে কোনও সমস্যা...'

'প্লিজ বসো, ম্যাম।' ঘাড় ফিরিয়ে খানসামার দিকে চাইল। 'হ্যাঁ, তুমিও।'

প্যাট্রিসিয়ার হাসিমুখে ফ্যাকাসে ভাব ফুটল। ডিভাইনের ওপর বসল ও, হাতদুটোর কাঁপন টের পেল হঠাৎ। ওর পাশে বসে পড়ল ইয়োডর, একটা হাত রাখল কাঁধে আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে

চারজোড়া চোখ একসঙ্গে গিয়ে পড়ল শেরিফের ওপর।

খানসামা নিজেও কোনার দিকের একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

‘একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে...’ শুরু করল শেরিফ।

খানসামার দিকে তাকাল প্যাট্রিসিয়া। ‘তোমাকে সাবধানে বাবার দেখাশোনা করতে বলা হয়েছিল, মোলার,’ অভিযোগের সুরে বলল। ‘কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিপদ একটা ঠিকই বাধিয়ে বসে আছ...’

‘ওকে আর দোষ দিয়ে কী হবে, সিস,’ ভাই বাধা দিল বোনকে। ‘আগেই তো বলেছিলাম, বাবার জন্যে একজন নার্সের ব্যবস্থা করতে। এই শকুনটার কাছে ওকে সাঁপে না দিতে...’

‘বাদ দাও ওসব। এখন সবচেয়ে জরুরি হলো বাবার কী হয়েছে সেটা জানা। কী হয়েছে, শেরিফ? বলো আমাদের।’

‘সব ক্ষেত্রেই আগে একটা প্রশ্ন থেকে যায়,’ মৃদু স্বরে বলল শেরিফ।

‘মারাত্মক কিছু হয়ে থাকলে আমাদের বরং একজন সিটি পুলিশ ডাকা দরকার!’ খঁকিয়ে উঠল ইয়োডর। ‘এই বুড়ো হাবড়াটাকে আরও আগেই পেসনে পাঠানো উচিত ছিল।’

সরু চোখে লোকটার দিকে তাকাল শেরিফ। লোকটার চোখে সুস্পষ্ট বিদ্বেষ। অবাক হলো ও। ধীর দু’চোখ মেলে পোলো খেলোয়াড়ের ছয় ফুট লম্বা শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত জরিপ করে নিল। পরমুহূর্তে শিথিল ভঙ্গিতে গা ঢেলে দিল নিজের চেয়ারে। একটা নিশ্চিত ভাব দেখা গেল ওর বয়সী শরীরে। বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

‘হয়তো তোমার কথাই ঠিক,’ মৃদু স্বরে সমর্থন জানাল ওর কথায়। ‘আমার মত একজন মূর্খ শেরিফের চেয়ে অনেক ভাল আর দক্ষ কর্মী আছে তাদের। তাদের কাছে পাত্রা পাওয়ার কোনও কারণ নেই আমার। কিন্তু একটা প্রায় পাড়াগাঁয়ে শহরের

একজন শেরিফ যা লক্ষ করবে, বড় শহরের মাথাঅলা আর দক্ষ গোয়েন্দা অফিসারের তা চোখ এড়িয়ে যাবে। যা হোক, আমার মনে হয় না আমাদের নগর পুলিশের কাছে যেতে হবে।’

নিজের মুখে হাতচাপা দিয়ে গুলা চিরে বেরিয়ে আসতে চাওয়া চিৎকারটা আটকাল প্যাট্রিসিয়া। প্রায় শোনা যায় না, এমন স্বরে বলল, ‘বাবা নেই? মারা গেছে!’

অস্বস্তির সঙ্গে মাথা দোলাল শেরিফ স্কট।

খুক করে কেশে উঠে গলা ঝাড়ল খানসামা মোলার। ‘দুঃখের বিষয়, মিস। তিনি নিজেকে নিজে শেষ করে দিয়েছেন। ...আত্মহত্যা।’

‘না,’ মৃদু, গম্ভীর গলায় প্রতিবাদ করল শেরিফ। মোলারের ভুল ভেঙে দেয়ার ভঙ্গিতেই যেন বলল, ‘আত্মহত্যা করেননি মি. আরলেপ। তাকে খুন করা হয়েছে।’

তড়াক করে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল ইয়োডর। তেড়ে গেল মোলারের দিকে। ‘তুই...তুই-ই খুন করেছিস, শালা। তোর ওপর প্যাট্রিসিয়ার সন্দেহের কথা আমাকে বলেও ছিল সে। ওই বুড়ো মানুষটাকে প্রায় সময় জ্বালাতন করতি তুই। কিন্তু তিনি তোকে বিদেয় করে দেননি এরপরও। এমনকী তোকে ভালও বাসতেন। অন্তত...’

‘হুঁ,’ বিষণ্ণ স্বরে সায় দিল মোলার। ‘তিনি ছিলেন আমার মালিক। অত্যন্ত ভাল মানুষ একজন মালিক।’ ওর গলা কেঁপে উঠল।

‘কতটা ভাল কল্পনাও করতে পারবি না তুই, কালা ভূত! উইল করে তোর নামে দিয়ে গেছে পঁচিশ হাজার ডলার। তুই জানতি, বিয়ের পর আমি আর প্যাট্রিসিয়া এখানে এসে থাকব। তখন তো আর তুই তাকে একা পেতিস না। এটাই ছিল বুড়োকে খুন করে তার টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়ার জন্যে একটা ভাল

সুযোগ তুই তাকে খুন করেছিস, এমন সাক্ষ্য দেয়ার মত কেউ ছিল না। কারণ ঝড়-বৃষ্টিতে আমাদের আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল....

‘এটা তার বিরুদ্ধে কেস সাজাবার খুব ভাল একটা পয়েন্ট। সিটি কর্পোরেশন পুলিশ হলে তাই করত। কারণ একা বাড়িতে সে ছাড়া মি. আরলেপকে আর কে-ই বা খুন করতে পারে? ওরা হয়তো ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতও। কিন্তু আমি সেটা করতে যাচ্ছি না।’

‘মানে! কী করতে চাও তুমি?’

‘ওকে অ্যারেস্ট করব না। তবে আমি এটাকে খুন হিসেবে ধরে নিচ্ছি। আমি বুঝতে পেরেছি, মি. ইয়োডর, তুমি বেনেট থেকে মোলারকে ফোন করে বলেছিলে যে, তোমাদের ডিনার পার্টি একটু বিলম্বে হতে পারে। ঝড়-বৃষ্টিতে আটকে গেছ তোমরা।’

‘কী? কী বললে? হ্যাঁ...ইয়ে...’ হঠাৎ গলা কেঁপে গেল ইয়োডরের। ‘তা করেছিলাম। সেটা মরিসনের পার্টিতে যোগ দেয়ার একটু আগেই। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল...আমার যেতে দেরি হচ্ছিল।’

‘হ্যাঁ। বেনেট আর মরমনের মাঝখানকার ব্রিজটাও ভেঙে গিয়েছিল। তবে সেটা আরও ঘণ্টা পাঁচেক আগের কথা...’

‘আরে না না! আচ্ছা, হ্যাঁ। হয়তো আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল খেয়াল করিনি, কোন্ শহরের নাম বলতে গিয়ে কোনটার নাম বলে ফেলেছি। ওটা ছিল লিব...’

‘তাকে কিছু আসে-যায় না।’ ব্যাপারটাকে স্রেফ নাকচ করে দেয়ার ভঙ্গি করল শেরিফ স্কট এরপরই রুক্ষ স্বরে বলল, ‘তবে আমি তোমাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি। বুড়ো

আরলেপকে তুমি খুন করেছ। কেন করেছ, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবু অনুমান করা তেমন কঠিন নয়।

‘বুড়ো আরলেপের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তুমি ওর সঙ্গে এনগেজমেন্টও হয়ে গেছে। কিন্তু আরলেপ চাইত না তুমি ওর মেয়ের জামাই হও। তোমার সম্পর্কে বিভিন্ন খোঁজ-খবর নিয়ে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করেছিল সে। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তোমার অতীত কীর্তিকলাপ সম্পর্কে পাওয়া খবরগুলো তাকে বিগড়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা তুমি আঁচ করতে পেরেছিলে। প্যাট্রিসিয়া আরলেপকে বিয়ে করে তুমি ওর পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়ে যাবে। তোমার মনে ভয় ছিল, আরলেপ যদি তার মেয়েকে তোমার এসব রেকর্ড দেখায়, প্যাট্রিসিয়া হয়তো তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তার মত পাল্টে ফেলতে পারে। তাই তুমি ভেবেছিলে আরলেপকে খুন করতে পারলে সে ভয় আর থাকবে না।

‘যা হোক, তোমার ওসব কাহিনি নিয়ে আমার তেমন কোনও আগ্রহ নেই। এসব সিটি কর্পোরেশন আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির এখতিয়ার। ওরা হয়তো শিগগিরই ওসব নিয়ে আদালতে যাবে। এসব ব্যাপারে তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ও আধুনিক। তুমিই তো একটু আগে সেরকমই বললে, তাই না?’

‘আমি বলেছি, তুমি আর কোনও কাজের জন্যেই উপযুক্ত নও!’ ব্যঙ্গের হাসি হাসল ইয়োডর। ‘তুমি আসলে এখন বদহজমিতে ভুগছ। তাই উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছ। আরে আমি একটা জায়গার নাম বলতে গিয়ে ভুলে আরেকটার নাম বলেছি বলে কি তুমি আমাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করবে? কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই!’

ধূসর ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা নাড়ল শেরিফ স্কট। ‘তুমি ঠিক বলেছ, বাছা। একদম ঠিক বলেছ। একজন মানুষকে সাক্ষ্য-

প্রমাণ ছাড়া ধরে নেয়া যায় না।’

ইয়োডরের গলা আবার দৃঢ় হয়ে উঠেছে। ‘তুমি বুড়ো পাঁঠা। তুমি আরও কিছু টের পাবে এখন। আমি তোমার নামে আদালতে মামলা করব...’

মৃদু হাসল শেরিফ স্কট। ‘কিন্তু সে-সময় পাবে না, বাছা। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে যার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, তার পক্ষে আদালতে যাওয়া তো সম্ভব নয়।’

‘কী বললে!’ গর্জন করে উঠল ইয়োডর। পরমুহূর্তে মনে হলো যেন আচমকা ওর পায়ের তলার মাটি সরে যেতে শুরু করেছে। আতঙ্কে কেঁপে উঠল ও। ওর সামনে দাঁড়ানো সামান্য এ আইনের লোকটাকে নানাভাবে হেনস্তা করতে শুরু করেছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, লোকটা মূর্তিমান আজরাইলের মত দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।

‘হ্যাঁ, বাছা।’ ওর উত্তেজনা যেন একটুও স্পর্শ করছে না স্কটকে। ‘তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে না, তুমি এখানে হপ্তা দুয়েক আগে এসেছিলে। ইয়োডর, তুমি খেয়াল করোনি যে, তোমার পায়ের জুতোর তলায় এখনও ইউক্যালিপ্টাসের ঝরে পড়া পাতার ছেঁড়াখোঁড়া অংশ লেগে আছে। তোমার পরনে যে ট্রাউজার, তার নীচের অংশেও দেখা যাচ্ছে কিছু নমুনা। বাগানের চারপাশে বারো ফুট উঁচু দেয়াল। তুমি একজন পোলো খেলোয়াড়, নামকরা অ্যাথলিট, তুমি ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব এই দেয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা বলো তো? তুমি আজ রাতে এখানে এর আগেও একবার ভেতরে ঢুকেছিলে।’

চোখের পলকেই যেন ছোট পিস্তলটা লাফিয়ে উঠে এল ইয়োডরের হাতে। ‘বেশ, ঠিক আছে। তুমি এই শহরের, অবশ্য যদি এটাকে শহর বলা যায়, মহাপ্রতাপশালী শেরিফ, তুমি আমাকে গ্রেফতার করো। কিন্তু তোমাদের সবাইকে এখন আমি

খুন করব। আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে কেউ বেঁচে থাকবে না। আর প্রথমে তোমাকে খুন করব, আইনের মানুষ।’

স্কটের বুক বরাবর পিস্তল তাক করল ইয়োডর। গুলি করার জন্যে তৈরি। তীক্ষ্ণ স্বরে চৈঁচিয়ে উঠল দুই মহিলা।

আচমকা গুলির শব্দ এবং পরমুহূর্তে গোড়া কেটে দেয়া কলা গাছের মত উপুড় হয়ে পড়ল ইয়োডর। ধড়াম শব্দে কেঁপে উঠল মেঝে। উপুড় হয়ে পড়া ইয়োডরের মাথার একপাশ থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে ভেসে যেতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে ইয়োডরের হাত থেকে ছিটকে পড়া পিস্তলটা তুলে নিল স্কট। খানসামার দিকে তাকাল। দু’চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে বুড়োর।

‘এরপর কী করা যায়, মোলার?’

উঠে দাঁড়াল মোলার। ‘আ-আমি সিটি পুলিশকে খবর দিই, স্যর?’

‘নিশ্চয়।’ অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল শেরিফ স্কট। ‘নইলে কিছুক্ষণ পরেই ওই ভৌদরটার মৃতদেহ গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে। তোমার অতিথিদের ডিনারে অসুবিধে হবে তখন।’

নিঃসঙ্গ নেকড়ে

এক

বিশাল শরীর জ্যাস্ট্রো ব্র্যাণ্টের। কোমরের কাছটা কমজোর হয়ে যাওয়ার পর থেকে বাইরে বেরোয় খুব কম। দুপুরের পর থেকে সন্ধে পর্যন্ত পুরোটা বিকেল হাই পাসে নিজের সরাইখানার পোর্চে বসে কাটায়। ওখানে একটা সার্বক্ষণিক চেয়ার পাতা থাকে ওর জন্যে। পোর্চে বসেই দুনিয়ার খবরাখবর রাখে সে।

শরীর অচল বলেই কি না কে জানে, মনটা এখন বেশ সচল ওর। চিন্তাশক্তিও অনেক প্রসারিত। রাস্তায় তাকালে যাদের দেখে, এরা প্রায় সবাই পরিচিত। জ্যাস্ট্রো ওদের হাঁটাচলা আর মুখের ভাবভঙ্গি দেখেই কে কী ভাবছে তা বোঝার চেষ্টা করে। পুরোটা অবশ্য বোঝা হয়ে ওঠে না। তবে বড় কোনও ঘটনা ঘটানোর আগে কিছু একটা আঁচ পেয়ে যায় সে। ইদানীং খুব বড় একটা ঘটনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। হাই পাসের বাতাসে আরেকটা বড় রেঞ্জ ওয়ারের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন।

পোর্চে বসে খুব আগ্রহের সঙ্গে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে জ্যাস্ট্রো ব্র্যাণ্ট।

হাই পাস থেকে পশ্চিমে ইয়েলো হর্ন কার্ভি, দিগন্ত পর্যন্ত সমতল ভূমি। ঘাস-পানি কোনোটারই অভাব নেই। ক্যাটলম্যানদের সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের দখল ও ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বহুবার রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়ে গেছে। রেঞ্জের পশ্চিম দিকটা

ছন্নছাড়া, অনাবাদি রক্ষ, উঁচু-নিচু। সালফার-ব্রোঞ্জ রঙের মাটি দূর থেকে দেখতে চমৎকার। অনভিজ্ঞ কোনও আগন্তুক এর চকচকে সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে গেলে অভিজ্ঞতাটা সুখকর হয় না। ওটা আসলে এক গোলকধাঁধা। ঢোকা যায়, কিন্তু বেরিয়ে আসা মুশকিল।

পশ্চিমের চারণভূমি থেকে রাইডাররা শহরে ফিরতে শুরু করেছে। এইমাত্র একজন অল্পবয়সী ঘোড়সওয়ার তার ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে শহরে ঢুকেছে। ছেলেটাকে প্রচণ্ড উত্তেজিত মনে হলো ব্র্যাণ্টের। একটুও দ্বিধা না করে সোজা পানির ট্রাফের কাছে চলে এল ও।

পূর্ব দিকে ষাট মাইলের মধ্যে এটাই একমাত্র ওয়াটার ট্রাফ। শহরের লোকদেরই টানাটানি হয়ে যায়। কেউই চায় না বাইরে থেকে যে-সে এসে হুটহাট করে এর পানি ব্যবহার করে শেষ করে দিক। জ্যাস্ট্রো তাই ছেলেটাকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইল পানি যেন হিসেব করে খরচ করে। ডাক দিল, ‘আই!’

চমকে পেছন ফিরে চাইল ছেলেটা। তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। জবাব দেয়ার দরকার মনে করছে না।

‘গাধা!’ বিড়বিড় করল জ্যাস্ট্রো। ‘দুনিয়ার হাল-হকিকত কিছুই বোঝে না এখনও। কোন্ সময় না ঘোড়াটা খুইয়ে বসে।’

ছেলেটা একগুঁয়ে। আনাড়িও। কোথাও কিছু ঘটিয়ে পালিয়ে এসেছে হয়তো। ভাবল সে।

একটু পরে আরও তিন ঘোড়সওয়ার এল ইয়েলো হর্নের দিক থেকে। এরা কঠিন ও দুর্ধর্ষ। এরা অবশ্য পানির ট্রাফের ওপর হামলে পড়ল না। জ্যাস্ট্রোর মনে হলো, লোকগুলো একটু অস্বস্তিতে ভুগছে। একটু পরে চলে গেল ওরা কাউকে কিছু না বলে।

‘উঁহু,’ মনে মনে মাথা ঝাঁকাল জ্যাস্ট্রো। ‘লক্ষণ ভাল ঠেকছে

না।’

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আরেকজন ঘোড়সওয়ার এল একটা ঘর্মাক্ত রোনের পিঠে চড়ে। একটা হাত অকেজো ওর, কাঁধ থেকে ঝুলছে। অপেক্ষা করল না লোকটা। যেদিক থেকে এসেছে, তার বিপরীত দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁক পেরিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল। মিনিট খানেক পরই আরেকদল ঘোড়সওয়ার এসে ঢুকল দক্ষিণ থেকে। সোজা সরাইখানার কাছে চলে এল ওরা। জ্যাস্ট্রো চেনে ওদের। ওয়াই ক্রস-এর রাইডার। সবক’টারই শত্রুসুলভ চেহারা। শিকারে বেরিয়েছে এরা, কারও পিছু নিয়েছে। লিডারকে চেনে জ্যাস্ট্রো। টুমি। ওয়াই ক্রস ফোরম্যান। সে-ই কথা বলল, ‘এদিকে পালাচ্ছে এমন কাউকে দেখেছ, ব্র্যান্ট?’

‘না। আমি কখনও কিছু দেখি না। তুমি জানো না, টুমি?’

‘আবার নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে এখানে,’ কণ্ঠে উদ্বেগ ফোটাল টুমি। ‘আমাদের সবাইকে এর মূল্য দিতে হতে পারে।’

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে কথা বলল কিছুক্ষণ। ঘোড়াগুলোর পানি খাওয়া শেষ হলে সরাইখানার উত্তর দিকে বিউটের দিকে রওনা হলো। ‘তুমি আমাদের দেখোনি, তাই না, ব্র্যান্ট?’ যেতে যেতে ঘাড় ফেরাল ফোরম্যান।

ওদের পেছনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জ্যাস্ট্রো। তারপর বিড়বিড় করল, ‘ডায়মণ্ড অ্যাণ্ড হাফ আর ক্লোভারলিফ ওয়াই ক্রস-এর ওপর হামলে পড়তে চায়, এটা বুঝি। ওয়াই ক্রস নিজেকে রক্ষা করতে লড়াই করে, এটাও না বোঝার কথা নয়। কিন্তু ব্যাপারটা দেখতে অসুন্দর। বিশ বছর ধরেই তো চলছে। একটা আউটফিট আরেকটার কাছে বিষের মত। আর তারা যেন এসব করতে পারলেই বেঁচে যায়। মনে হচ্ছে, দু’তিন দিনের মধ্যে আবার শুরু হতে যাচ্ছে।’

ওয়াই ক্রস-এর রাইডাররা চলে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর।

গুলির একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল পাহাড়ের চূড়োর কাছ থেকে ।

সূর্য ডোবার আগে, সোনালি রশ্মি যখন রাঙিয়ে দিচ্ছে চারদিক, তখনই লোকটাকে শহরে ঢুকতে দেখা গেল । লোকটা ইয়েলো হর্ন কাণ্ডি থেকে আসেনি, এসেছে পূব দিকের ব্যাডল্যাণ্ড পেরিয়ে ।

কালো একটা পিঠ-উঁচু ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ও । ঘামে ভেজা ধূলিধূসর ঘোড়াটাকে দেখে মনে হয় অনেক দূর থেকে এসেছে । অ্যালকালি ধুলোয় ভরা আরোহীর জামা-কাপড় । চামড়া সূর্যের আলোয় পোড়া, বাদামি । মুখ দেখতে হাসি হাসি মনে হলেও লোকটা হাসছে না । চোখের কোনায় আর নীচে অজস্র ভাঁজের ভিড় চেহারায়ে একটা হাসি হাসি ভাব এনে দিয়েছে ।

ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটছে লোকটা । টিলেঢালা অলস ভঙ্গি । ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেও পানি খেল । তারপর বিশাল এক তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল । দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে লোকটা একজন কাউপাঞ্চগর । অলস চোখ মেলে নিজের চারদিকে তাকাচ্ছে । মেপে নিচ্ছে যেন সব কিছু ।

পরমূহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল । তাকাল জ্যাস্ট্রোর দিকে । মৃদু স্বরে বলল, ‘তুমি আরাম করে বোসো । ঘোড়ার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিচ্ছি ।’

বার্নের পাশ দিয়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ও । ঘোড়ার ব্র্যাণ্ডের দিকে চোখ গেল জ্যাস্ট্রোর । অবাক হয়ে দেখল ব্র্যাণ্ডটা ওর অপরিচিত । ৪৪ স্ল্যাশ । স্মৃতির ভাণ্ডার তোলপাড় করে হাতড়াতে শুরু করল জ্যাস্ট্রো । ইতোমধ্যে ঘোড়ার পরিচর্যা শেষ করে সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়াল আগন্তুক । পকেট হাতড়ে তামাক বের করতে গেল ।

‘এমন একটা দিন,’ তামাক বের করে নিয়ে হলুদ চুলে ভরা মাথাটা নিচু করে সিগারেট রোল করতে করতে বলল । ‘ধকল

সামলাতে গিয়ে জীবন শেষ ।’

‘তা-ই ।’ মাথা ঝাঁকাল জ্যাস্ট্রো সায় দেয়ার ভঙ্গিতে ।

শিক্ষাদীক্ষা আসলেই অন্যরকম একটা ব্যাপার । বইয়ের শিক্ষা নয়, ঘোড়াদের মত মানুষের আচরণ দেখেও সেটা আঁচ করা যায়, সে আসলে কী । অন্তত জ্যাস্ট্রো সেটা বোঝে । শিথিল ভঙ্গির এই লোকটার মধ্যে চোখে পড়ার মত তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই । গায়ে একটা পনচো । চওড়া বুক । আঙুলগুলো দেখে মনে হয় প্রচুর সিগারেট খায় । সিগারেট রোল করার কারণে খয়েরি দাগ পড়ে গেছে । তবে একমাত্র বিশেষত্ব ওর পিস্তল ঝোলানোর ভঙ্গিতে । একটু নিচু করে বাঁধা উরুর সঙ্গে । দ্রুত ড্র করার জন্যে কৌশলী ভঙ্গি । খুব কম লোকই অভ্যস্ত এতে ।

অমায়িক, বন্ধুভাবাপন্ন চোখে জ্যাস্ট্রোর দিকে চেয়ে আছে লোকটা । কিন্তু জ্যাস্ট্রোর পোড়খাওয়া চোখে এর কাঠিন্যটাও যেন ধরা পড়ছে, প্রথম দর্শনে যা সচরাচর বোঝা যায় না । তবে যারা বোঝার, তারা প্রথমবার দেখেই বুঝে নিতে পারে যে, নিজের সম্পর্কে পুরোপুরি জানা আছে লোকটার । আত্মবিশ্বাসী ।

‘ভাটিতে,’ আঙুল হেলিয়ে পেছনে দেখাল আগন্তুক, ‘দেখে এসেছি, র্যাটল সাপগুলো পর্যন্ত গর্তে ঢুকে আছে ।’ একটু থেমে যোগ করল, ‘মানুষও ।’

তাকিয়ে রইল জ্যাস্ট্রো । লোকটার মুখে হাসির আভাস । সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চোখ । কুচকে রেখেছে । তবে পুরো অবয়ব জুড়ে একটা প্রশান্ত ভাব । ভবধুরে কোনও কাউবয়ের সঙ্গে এটা যায় না ।

চারদিকে আঁধার নামছে । ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে । এরকম বাতাস প্রতিদিনই বয় সন্দের দিকে । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাস্ট্রো । প্রতিদিনই এ-সময়টা উপভোগ করে ও । নিজেকে তরতাজা মনে হয় ।

সরাইখানার ভেতর একটা আলো জ্বলছে। একটু পরে দরজায় ছায়া পড়ল। তার সঙ্গে ভেসে এল একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর, ‘সাপার রেডি...’

মুহূর্তে যেন গা ছাড়া ভাব উধাও হয়ে গেল আগন্তকের। সোজা হয়ে দাঁড়াল। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। সরাইখানার দোরে একটা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরা মেয়ের দিকে চোখ গেল ওর।

‘যাই, হাত-মুখ ধুয়ে আসি।’ সরে গেল সে।

ভেতরে গেল জ্যাস্ট্রো। একটু পরে লোকটা এসে ঢুকল। সরাইখানার মালিক আর তার মেয়ে টেবিলে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে দেখতে পেল। ওর হলদেটে সোনালি চুলে কিছু পানি লেগে আছে, আলো পড়ে চিকচিক করছে। চোখে চকচক করছে কৌতুক।

খেতে বসার আগে ভদ্রতাসূচক কিছু বলার দরকার মনে করল ও। পরিচিত হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘আমার নাম লুইস ক্যানট্রেল। পিউই কার্টি থেকে এসেছি।’

‘আমার নাম জ্যাস্ট্রো ব্র্যান্ট,’ ভদ্রতায় সাড়া দিল জ্যাস্ট্রো। ‘আর আমার মেয়ে লি অ্যান। বসে পড়ো এবার। রাইডিং মানুষকে ক্লান্ত করে দেয়।’

‘তাতে অবশ্য পেট ঠেসে খাওয়ার লাইসেন্সটাও পেয়ে গেছি,’ হাসল লুইস। ‘রান্ধস-টান্ধস ভেবে বোসো না যেন।’ হাসিমুখে লির দিকে তাকাল। ‘আমার জীবনটাই কাটছে ঘোড়ার পিঠে, ম্যাম।’

‘হ্যাঁ, সার দিল জ্যাস্ট্রো। ‘ওই অভিজ্ঞতা আছে আমারও।’ হাসল। ‘সে-সময়টা আবার ফেরত পাওয়ার জন্য আমি আমার সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি। আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন পুরো পৃথিবীটাকে হাতের তালুর মত মনে হত। কিন্তু এখন নয়।

বিশ বছর ধরে ঘোড়ার বদলে রকিং চেয়ারে চড়ে বসে আছি।’

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লুইস সরাইখানার মালিকের দিকে। তারপর লির দিকে চাইল। লির মুখে মৃদু হাসি।

আচমকা পুরো ঘরটা যেন অন্যরকম এক আলোতে ভরে গেল লুইসের চোখে। যুবতীর মুখের রহস্যময় হাসি দোলা জাগায় যুবকের মনে। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না জ্যাস্ট্রোর। বুকের ভেতর খোঁচা দিল একটা কষ্ট। মানুষ কেন বুড়ো হয়ে যায়! তবে লোকটির শান্ত চোখের কঠিন ভাবটুকুও চোখ এড়াল না তার। এ লোক কি কোথাও বাঁধা পড়ার?

‘থাকবে নাকি কিছুদিন এদিকে?’ আলগোছে জানতে চাইল সে।

‘না, বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারি না। পায়ের তালুতে চুলকানি শুরু হয়ে যায়।’ মৃদু হাসল। ‘বড়াই করে বলছি না। এটা সত্যি।’

‘কেউ কেউ চলার ওপর থাকে। তারা এটা পছন্দ করে। আবার কাউকে কাউকে চলতে হয়।’

মৃদু হাসল লুইস। হাসির সামান্য শব্দে যেন ঘরের পরিবেশ পাণ্টে গেল। ‘আমার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রথমটাই বেশি সত্যি। তবে পরেরটাও মাঝে মধ্যে ঘটে বৈকি!’

চকিতে মেয়ের দিকে চাইল জ্যাস্ট্রো। লি বেআইনি কোনও কাজ পছন্দ করে না। ও সব সময় ন্যায়-নীতির মধ্যে থাকতে ভালবাসে। আউট ল-দের ঘৃণা করে মনে-প্রাণে। মেয়ের চোখে ঘৃণাই দেখবে বলে ভয় করেছিল ও। কিন্তু সেরকম কোনও ভাব ফোটেনি লির চোখে। বরং কিছুটা আগ্রহ নিয়েই যেন প্রশ্ন করল, ‘ওই জীবনটা তোমার ভাল লাগে?’

‘ভাল লাগে।’ আবার হাসল লুইস। ‘তারাজুলা রাতের আকাশের নীচে কম্বল পেতে ঘুমানো, মুখের দু’পাশে স্নিগ্ধ

বাতাসের পরশ নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে দুরন্ত গতিতে মাইলের পর মাইল ছুটে যাওয়া। অবশ্য তোমার চোখে যদি আচমকা কিছু এসে পড়ে, তখন আর ততটা উপভোগ্য হবে না।’

ওর দিকেই চেয়েছিল লি, চোখ নামাল না। ‘কেন ভাল লাগে, বলো তো?’

‘একটা মানুষের চাওয়া, ম্যাম, ততখানিই, যতখানির কথা সে ভাবতে পারে। আমি ভাবি আমি যদি সারাক্ষণ এভাবে চলার ওপর থাকতে পারতাম! অন্তত একটা পুরো দিন। কিন্তু তা হয় না। দিগন্ত থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে ফের ট্রেনের দিকে চাইতে হয়। তখন সে ট্রেনটাকে মনে হয়, অনেক দূরের পথ। সামনে কেবল ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। ...একাকী ঘোড়সওয়ার আসলে নিঃসঙ্গ নেকড়ের মত। এক-একবার ওরা পাহাড়ের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, ফের চলে যায়। দ্বিতীয়বার দেখা যায় না।’

বিদ্রূপের আভাস দেখা গেল লির চোখে। দুই ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেল। ‘তুমি তো হাসতে হাসতেই এলে। কিন্তু এখন তোমাকে কেন যেন দুঃখিত মনে হচ্ছে। আমাদের ঘরটা কি তেতো ওষুধ?’

সেকেণ্ড কয়েক একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তারপর মৃদু হাসল লুইস। ‘মিষ্টি ওষুধও তো হতে পারে।’

রাতের নীরবতা যেন জমাট বেঁধে গেল হঠাৎ ঘরের ভেতর। খাবারের প্লেটটা ঠেলে দিল জ্যাস্ট্রো। উঠে ম্যাচ জ্বলে কাঠিটা ফেলল ফায়ারপ্লেসের ভেতর। ফের এসে নিজের চেয়ারে বসল। ওর অসংখ্য ভাঁজ পড়া চোখের নীচে একটা কালো ছায়া।

আচমকা টেবিল পরিষ্কার করার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখা গেল লি-কে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আগুনের বেগুনি শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে ওর

পোশাকে । সে-ও যেন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে আগুনের লাল রঙ ।

‘৪৪ স্ল্যাশ নামটা আমার কাছে নতুন শোনাচ্ছে,’ জ্যাস্ট্রো মন্তব্য করল ।

‘ওটা রড ভাইদের র‍্যাঞ্চ । ওয়েস্টার্ন ক্যানসাস,’ অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল লুইস ।

‘একমাত্র ব্যবসার কাজেই মানুষ এরকম দিনে এরকম একটা খারাপ জায়গায় আসতে পারে ।’

‘ব্যবসার কাজে? হ্যাঁ ।’

‘তার মানে তুমি কিছুদিন থাকছ?’

‘কোনও প্রয়োজন ছাড়াই থাকছি । এটা বোধহয় খুব কঠিন জায়গা, না?’

‘কোনও কোনও সময় ।’

‘অবাক হচ্ছি, তুমি কী করে কোনও ঝামেলা ছাড়াই টিকে আছ?’

কিচেন থেকে ফিরে এসে বাবার কাছে বসল লি অ্যান । বাবা-মেয়ের মধ্যে একবার দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল ।

‘আমি আসলে কোনও ঝামেলায় যাই না,’ জবাব দিল জ্যাস্ট্রো অস্পষ্ট স্বরে ।

দুই

দু'হাত পেছনে রেখে পিছিয়ে এল লুইস। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফায়ারপ্লেসের পাশে দেয়ালে টাঙানো একটা বেল্ট আর দুটি অস্ত্রের দিকে। প্রচুর ব্যবহারে কালো হয়ে গেছে বেল্টের রঙ। অস্ত্রদুটো কিন্তু তেল চকচকে। নিয়মিত যত্নের ছোঁয়া তাতে। 'একজন দক্ষ লোকই কেবল জানে কী করে ওগুলো ব্যবহার করতে হয়।'

যেন শুনতে পায়নি, এমন ভাব করল জ্যাস্ট্রো। একটু পরে কাঠখোঁটা স্বরে বলল, 'তোমার থাকার ভাড়াটা এখনও দাওনি, মিস্টার। ওটা অগ্রিম দিতে হয়।'

'ও, তাই তো!' মৃদু স্বরে বলল লুইস।

বাইরে একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। চট করে মাথা তুলে কান খাড়া করল লুইস। ঘোড়ার পায়ের শব্দ পূর্ব দিকে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওভাবেই রইল। আস্তে আস্তে কপালে পড়া ভাঁজ মিলিয়ে গেল ওর। কিন্তু ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লি আর জ্যাস্ট্রো দেখল, লোকটার চেহারা যেন এতক্ষণ ধরে যে নির্লিপ্ততা ছিল, তা নিমেষে মিলিয়ে গেছে। ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুলল জ্যাস্ট্রোকে। জানতে চাইল, 'ইয়েলো হর্ন কার্টিটা তুমি চেনো নাকি?'

'খুব বেশি নয়,' প্রসঙ্গটা ওখানেই শেষ করে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল লুইস।

লি উঠল। পেছন দিকের দরজা খুলে বেরোল। 'ফিরে' এল একটু পরেই একজোড়া স্লিপার নিয়ে। বাবার পা থেকে বুট খসিয়ে নিয়ে স্লিপার পরিয়ে দিল। মুখ নিচু করে বসে আছে লুইস। মলিন। লি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লুইস মুখ তুলে চাইতে বলল, 'কথাটা কি খুব বেশি আঘাত করেছে তোমাকে?' সমবেদনা নয়, ওর গলায় চ্যালেঞ্জের সুর।

'আমার জীবন,' তেতো গলায় বলল লুইস। 'আমাকে শিখিয়েছে নারী, উষ্ণ আরামপ্রদ ঘর আর আগুনের পাশে বসে অবসর কাটানো কেবল ভাগ্যবানদের জন্যেই। এসবের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।'

'কখনও কি পরিচয় হবে না?'

'এখন ঘুমানোর সময়, ম্যাম,' অস্পষ্ট স্বরে বলল লুইস। সরে গেল ওখান থেকে।

আরেকটা বাতি নিয়ে এল লি। লুইসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওপরতলার একটা ঘরের দিকে। দোরের কাছে গিয়ে ওর হাত থেকে বাতিটা নিল লুইস, তারপর লির চোখে তাকাল এক মুহূর্তের জন্যে।

ওর চোখ এখন সজীব। আগের সে মলিনতা কেটে গেছে। নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তবে এরই মধ্যে যেন একে অন্যকে যা বলার তা বলা হয়ে গেল। মুখে রঙ লাগল লির, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। নির্বিকার মুখে নড করে পিছিয়ে এল।

ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। ভেতরে ভাঁজ করা একটা বিছানা আর মশারি। বিছানা করে নিল লুইস, তারপর আলো নিভিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের অন্ধকারে চোখ মেলে দিল। চাঁদ উঠেছে, তবে সিকি পরিমাণ চাঁদের আলোয় সামনের উঠানের অর্ধেকটাও ভরাতে পারেনি। অস্পষ্ট ছায়া জমাট বেঁধে

আছে এখানে-ওখানে। দূর থেকে ভেসে আছে বিভিন্ন শব্দ।
খানিকক্ষণ পরে সরে এল জানালার কাছ থেকে। শুয়ে পড়ল।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল। আচমকা লি অ্যানের
মুখটা ভেসে উঠল চোখে। ‘একটা মেয়ের মত মেয়ে,’ বিড়বিড়
করল সে। ‘ওর মত একটা মেয়ে কি কখনও বাইরে থেকে এলে
আমার পরার জন্যে স্লিপার নিয়ে আসবে?’

নীচে বড় ঘরটাতে বসে কথা বলছে বাবা-মেয়ে। কোনও
রকম ভণিতায় গেল না জ্যাস্ট্রো। সরাসরি জিজ্ঞেস করল
মেয়েকে, ‘তুমি কি ওকে পছন্দ করে ফেলেছ, লি?’

‘হ্যাঁ, আমি ওকে পছন্দ করে ফেলেছি’ স্বীকার গেল মেয়ে।

মেয়ের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগুনের দিকে চেয়ে
ভুরু কুঁচকাল জ্যাস্ট্রো। ‘আমি অবশ্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না।
আমার মত বুড়ো বাপ ছাড়া তো সঙ্গী হিসেবে পাবার মত তোমার
আর কেউ নেই। তোমার দরকার সমবয়সী সঙ্গী।’

একটু চুপ করে রইল লি। তারপর বলল, ‘তুমি ভুলে গেছ,
বাবা। আগেও এখানে অনেক যুবক বয়সী পুরুষ ছিল। আমি কিন্তু
তাদের কাউকে পছন্দ করিনি।’

উঠে দাঁড়াল জ্যাস্ট্রো। হাই তুলল মস্ত করে। তারপর প্রসঙ্গ
পাল্টানোর ভঙ্গিতে বলল, ‘আমার ঘুম পাচ্ছে। ঠিক আছে, লি।
এই লোককে আমার কাছে অন্যদের মত মনে হয়নি। ও হয়তো
পরের গরুর মাংস খেয়েই পেট চালায়। তবে ওকে আমার খারাপ
লোক মনে হচ্ছে না।’

‘নিশ্চয় না। তুমি ওর নাম শোনোনি? ওই নামে কোনও
আউট-ল বা খুনির কথা তুমি শুনেছ কখনও?’

‘কিন্তু সে এখানে নেহাত ঘুরে বেড়াতে আসেনি। উদ্দেশ্য
আছে নিশ্চয়।’ উঠে পড়ল জ্যাস্ট্রো। নিজের ঘরের দিকে পা
বাড়াল। বিছানায় বসে ভাবতে লাগল লুইসকে নিয়ে। লোকটাকে

অস্থির প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে ওর।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছে জ্যাস্ট্রো। ঘুম আসছে না। হঠাৎ করে ঘোড়ার পায়ের শব্দে কান খাড়া করল। শব্দটা উঠোনে এসে থামল। বারদুয়েক হালকা শিসের আওয়াজ শোনা গেল। এর পরই ওপরের ঘর থেকে নেমে আসার শব্দ কানে এল। লুইস ক্যানট্রেল নিশ্চয়। বিছানা থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জ্যাস্ট্রো। বাইরে পোর্চের কাছাকাছি চাঁদের আলোয় দু'জনকে দেখা গেল নিচু স্বরে কথা বলতে। কী বলা হচ্ছে শুনতে পেল না জ্যাস্ট্রো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো আলাপটা। এরপর সরে গেল ওরা। আগন্তুক তার ঘোড়ার পিঠে গিয়ে উঠল। উঠোন পেরিয়ে যাওয়ার সময় চকিতের জন্য ওর মুখটা দেখল জ্যাস্ট্রো। লুইস ক্যানট্রেল ভেতরে ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

আচমকা যেন শরীরের প্রতিটি শিরায় হিংস্র আক্রোশের আভাস টের পেল জ্যাস্ট্রো। যখন সুস্থ ও সচল ছিল, তখন এমন অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় ছিল না। অচল জীবনে এক ধরনের শান্তিতে ছিল। অনেক কিছু আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আজ রাতে এ কী ঘটল ওর? সে পুরানো অনুভূতিতে ফের মন আচ্ছন্ন হতে চাইছে!

‘ফ্রলি,’ বিড়বিড় করল ও। ‘কোভারলিফ বস। এখানে এসেছে ক্যানট্রেলের সঙ্গে দেখা করতে। তার মানে আগে থেকেই ঠিক করা আছে তারা এখানে এসে কথা বলবে। তা হলে কি এখানে যে লড়াই ফের শুরু হতে যাচ্ছে, তার মূলে ইন্ধন যোগাচ্ছে লুইস! ও একজন বন্দুকবাজ ছাড়া তো আর কিছু নয় তা হলে। আর আমার মেয়ে কি না তাকেই চাইছে। আমি তার চোখে মুগ্ধতার ছায়া দেখেছি। ধ্যাওেরি, জাহান্নামে যাক ব্যাটা! ওকে আমি কালই দূর করে দেব। আর আমার মেয়ে কি না

নিজেকে ওই আউট ল-টার সমানে নিয়ে এল...হাহ্!’

তবে রেগে গেলেও পরদিন সকাল পর্যন্ত নিজেকে শান্ত রাখল জ্যাস্ট্রো। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘোড়া নিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল ক্যানট্রেল। জ্যাস্ট্রোর দিকে তাকাল। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ভাবছে ওরা। পরস্পরের মনের কথা আঁচ করতে পারছে। তবে কে আগে কথা বলবে, তা নিয়ে এক ধরনের খেলা চলল যেন কয়েক মুহূর্ত। উরুর ওপর দু’হাত ঘষল জ্যাস্ট্রো। তারপর নীরবতা ভাঙল। ‘ক্যানট্রেল নামের এক লোক ছিল ইয়েলো হর্নে। কিছুদিনের জন্যে ওর মালিকানায় ছিল ওয়াই ক্রস।’

ধূসর নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল লুইস বুড়োর ওপর। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘তাকে চিনতে নাকি তুমি?’

ধীরে ধীরে সিগার ধরাল জ্যাস্ট্রো। লম্বা টান দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ল। ওর মুখ অস্পষ্ট হয়ে গেল ধোঁয়ায়। প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড পরে মাথা ঝাঁকাল, ‘এক-আধটু চিনতাম।’

‘আমার বাবা,’ মৃদু স্বরে বলল লুইস। ‘খুব ভাল আর উদার মানুষ ছিল। নিজে সৎ ছিল বলে অন্যদেরও তাই ভাবতে চাইত।’ ম্লান শোনাচ্ছে লুইসের মুখের প্রতিটি শব্দ। বিষণ্ণও। ‘পুরনো সব ভাল ভাল প্রথা মেনে চলত সর্বান্তঃকরণে। ভাবত, নিজের চারপাশের বর্বর অসভ্য মানুষগুলোও বুঝি সেসব মেনে চলবে। এখন তো ওয়াই ক্রস ভরভরন্ত র্যাঞ্চ। আমার বাবাই গড়ে তুলেছিল। নিজের জীবনের সেরা বছরগুলোর বেশিরভাগই ব্যয় করেছিল ওটার পেছনে। আমার জন্ম ওখানেই। আমার জীবনের সাতটি বছর ওখানে কেটেছিল। ওই সাতটি বছরই এখন পর্যন্ত জীবনের সবচেয়ে সেরা সময় আমার। সম্ভবত এর পরেও থাকবে। ...বাকি ইতিহাস হয়তো তুমিও জানো।’

‘বিশ বছর আগে, এই অক্টোবরেই, খুন হয়ে গিয়েছিল ক্যানট্রেল।’ মাথা ঝাঁকাল জ্যাস্ট্রো।

‘ইয়েলো ক্রস-এর বাজে ও বর্বর লোকগুলো তার যা আছে তা কেড়ে নিতে চাইত। কিন্তু একা ওর মোকাবিলা করার সাহসও ছিল না কারও। সুতরাং সবাই একাট্টা হয়ে লড়াই ঘোষণা করল ওর বিরুদ্ধে। তাকে হত্যা করল। আর ওরাই এখন ইয়েলো ক্রসের মালিক বনে বসে আছে। বাবাকে খুন করার মাস কয়েক পরেই মাও মারা যায়। আর আমি তখন নেহাত বাচ্চা ছেলে। এরপর থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে-সেখানে।’

‘কিন্তু এখন তুমি ফিরে এসেছ?’

‘হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি,’ স্বীকার করল লুইস। মৃদু স্বরেই বলল কথাটা, কিন্তু জ্যাস্ট্রোর কানে সেটা শুধু স্বীকারোক্তি নয়, বরং হুমকি হয়েই বাজল যেন। ওর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করল জ্যাস্ট্রোর চোখ। ওয়াই ক্রস-এর ওয়াটার লাইনের ধূসর আউটলাইনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। তারপর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে এমন গলায় বলল, ‘ওরা আমাকে পাবে এক নিঃসঙ্গ নেকড়ের মত। হিংস্র আর নিষ্ঠুর।’

‘মানুষের প্রতি ঘৃণা,’ শব্দ বাছাই করছে জ্যাস্ট্রো। ‘এই পৃথিবীকে নরক বানিয়ে ফেলে। অথচ তা না হলে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে উঠতে পারত।’

ঝট করে ঘাড় ফেরাল লুইস সরাইখানার মালিকের দিকে। ‘মনে হচ্ছে এ অভিজ্ঞতা তোমার নিজের জীবন থেকেই পাওয়া। বই পড়ে পাওয়া বিদ্যা নয়। এটা সত্যি হতে পারে। কিন্তু আমার মত একজন সাধারণ রাইডার এর মর্মার্থ বুঝতে পারে না।’

‘দাঁড়াও, বাছা।’ নিষেধ করার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল জ্যাস্ট্রো। ‘এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেয়ো না।’

দোরগোড়ায় একটা শব্দ হলো। দু’জনেই একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল। লি-কে দেখল দ্রুত বড় রুমটার দিকে যেতে। নিজের চেয়ার থেকে উঠল জ্যাস্ট্রো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গেল বার্নের দিকে।

একটু পরে ফিরে এসে বলল, ‘আমি একটু বেরোচ্ছি।’

একটু পরে পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল জ্যাস্ট্রো।

শেষ বিকেলে ফিরে এল সে মুখে এক রাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে।
লুইসকে দেখতে পেল না। মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে বার্নের দিকে
দেখিয়ে দিল। ‘ওখানে। ওর ঘোড়ার কাছে। কিন্তু তুমি সারাদিন
কোথায় ছিলে? কেন গিয়েছিলে?’

‘আগে আমার কথার জবাব দাও।’

‘কী বলো?’

‘আচ্ছা আমি তোমার জন্যে কী করিনি, বলো তো? এখন
ভাবছি, কোমরে গুলি খেয়ে অচল হয়ে যাওয়ার চেয়ে আমি মরে
গেলাম না কেন? গুলিটা কোমরে না লেগে আমার বুকে লাগল না
কেন?’

‘আহ, চুপ করো, বাবা! কী সব বলছ?’

‘তাই বলে একদম অচল হয়ে পড়েছি, তা কী করে ভাবলে?
তুমি জানো, পুরো অঞ্চলটা এখন ভবঘুরে আর খারাপ লোকজনে
গিজ গিজ করছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে ওরা। ওয়াই
ক্রস-এর ওপর ফের আকাশ ভেঙে পড়তে যাচ্ছে মনে হয়। গত
রাতে কোভারলিফের ফ্রলির ক্যানট্রেলের কাছে আসা দেখেই
আন্দাজ করতে পেরেছি। ওরা সব ক্যানট্রেলের লোক। ক্যানট্রেল
তার বাবার খুনের বদলা নিতে এসেছে। তার মানে পুরনো
সময়ের মত আরেকটা লড়াই ঘনিয়ে আসছে।’

‘ও সেসব করবে না,’ দৃঢ় স্বরে বলল লি।

‘তুমি কী করে জানো?’ চোখ সঙ্কুচিত হলো জ্যাস্ট্রোর। ‘তুমি
কি আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর ওর সঙ্গে কথা বলেছ?’

‘হুঁ।’

আরেকটু কাছাকাছি হয়ে মেয়েকে নিবিড় চোখে দেখল
জ্যাস্ট্রো। ‘আমি কিন্তু এটা আশা করিনি। ...তুমি আমার মেয়ে,

লি অ্যান। আমি তোমাকে জানি। তুমি যা চাইবে, তা চাইবেই। সেটা খারাপ হোক আর ভাল হোক।’

‘কিন্তু ও আউট-ল নয়। কখনও না।’

জ্যাস্ট্রী কিছু বলল না। কিন্তু ওর মনের সন্দেহ গেল না। সে জানে, ওর পরিবারের রক্তের মধ্যে কিছুটা বুনোভাব আছে। ব্যক্তিভেদে এর তারতম্য হলেও একেবারে চলে যায় না। ওর নিজের অচল শরীরটাই তার সাক্ষী। আর সে একই উন্মাদনা বা বুনোভাব যদি লির মধ্যেও দেখা যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

দুশ্চিন্তা আর তিক্ততা নিয়ে কিচেনে ঢুকে কিছু খেয়ে নিল সে। তারপর নিজের রুমে গিয়ে ঢুকল। ওর ইচ্ছে করছে ক্যানট্রেলের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু ভেতর থেকে কেমন একটা বাধাও অনুভব করছে। কারও ব্যাপারে নাক গলানোটা ওর পছন্দ নয়। তা ছাড়া ক্যানট্রেলদের প্রকৃতি সম্পর্কেও ধারণা আছে তার। ও এমন কিছু বলতে পারবে না, যা একজন লোককে তার জন্মস্থানে ফিরে আসা থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে। সুতরাং মানসিকভাবে এবং এমনকী শারীরিকভাবেও কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে সে।

তিন

উঠানে কথার আওয়াজে ঘুম ভাঙল জ্যাস্ট্রীর। দু’জনের গলা শুনতে পেল। উত্তপ্ত গলায় তর্কাতর্কি চলছে। ক্যানট্রেল বলছে,

‘আমি কে, কোথেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি, সেটা আমার ব্যাপার।’

‘তোমার ব্যাপার কি না সেটা আমরাই বলব,’ কেউ একজন কঠিন গলায় ধমকে উঠল।

শয্যায় উঠে বসল জ্যাস্ট্রো। তারপর নামল। ধীরে ধীরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পোর্চে গিয়ে দাঁড়াল। লোকগুলোকে দেখতে পেল এবার। ওয়াই ক্রস-এর প্যাট্রল পার্টি। ফোরম্যান টুমি বিদ্রোহের চোখে তাকাল জ্যাস্ট্রোর দিকে। ‘আমরা এই রাস্তা আর এই লোকের ওপর একটা চোখ রেখেছি, জ্যাস্ট্রো। তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু তুমি বোকার মত তা-ই ডেকে আনছ।’

‘তুমি কিছু মনে কোরো না, জ্যাস্ট্রো,’ দৃঢ় স্বরে বলল লুইস। ‘আমি এখানে থাকছি। কারণ এটা একটা পাবলিক প্লেস, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আমাদের চাপ দিয়ে লাভ হবে না। আমি নিজেও একটা কমিটি চালাই।’

‘তুমি ব্যাডল্যাণ্ড থেকে এসেছ,’ অভিযোগের সুরে বলল টুমি।

‘তাতে কী হয়েছে?’

‘একটা কথা মনে রেখো, মিস্টার। এখানে একটা সীমানা রয়েছে। তুমি বলেছ, এটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার...ভাল কথা। কিন্তু তুমি এখন সীমানা অতিক্রম করে ইয়েলো হর্নে ঢুকে পড়েছ। প্রয়োজনে তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।’

‘এখান থেকে চলে যাও, টুমি!’ ঘোঁৎ করে উঠল জ্যাস্ট্রো।

অপ্রস্তুতের হাসি হাসল টুমি। ‘কিছু মনে কোরো না, জ্যাস্ট্রো। আমরা স্রেফ সতর্ক করে দিতে এসেছি।’ সঙ্গীদের দিকে ফিরল। ‘চলো যাওয়া যাক।’

ঘুরে গেল প্যাট্রল পার্টি। শেষ বিকেলের হলুদ আলোয় ধুলোর ঘূর্ণিঝড় তুলে চলে গেল ইয়েলো হর্নের উদ্দেশে।

ওদিকে তাকিয়ে রইল লুইস। বাতাসে ধুলো উড়ছে। যতক্ষণ না শেষ ঘোড়সওয়ারটাও বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, ততক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল। একটু পরে নিজের ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়াল জ্যাস্ট্রোর সামনে। তাকাল সরাইখানার মালিকের দিকে। ‘আমি তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম, মিস্টার। সেজন্য দুঃখিত। আমি এক্ষুণি আমার পথে চলে যাচ্ছি। তোমাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।’

‘পথটা কি দক্ষিণে গেছে?’ নিজের চেয়ারে গা ডুবিয়ে বসল জ্যাস্ট্রো।

কঠিন, নীল চোখদুটো তুলে তাকাল লুইস বুড়োর দিকে। ‘আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুখোড় বুড়ো...কিছুই তোমার চোখ এড়ায় না।’ হাসল একটু। ‘হ্যাঁ, দক্ষিণেই যাচ্ছি।’

‘গত বিশ বছর ধরে আমার দিন কাটছে কীভাবে, জানো? মানুষের আসা-যাওয়া দেখে। এদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারে চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি। কেউ কেউ ফিরে এসেছে। তারপর মারা গেছে এখানে। তারা অবশ্য তোমার মতই বোকা ছিল, ক্যানট্রেল।’

‘আমি কবে নিজেকে চালাক বললাম?’

‘সেটাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তুমি সাধারণ আর দশজনের মত নও। তোমার যেমন মাথায় বুদ্ধি আছে, তেমনি ভেতরে আছে একটা হৃদয়ও। একজন সত্যিকারের সাহসী ও হৃদয়বান মানুষের রক্ত শরীরে বহন করে চলেছ তুমি। কিন্তু আমি তোমাকে ধরে রাখতে পারব না, ক্যানট্রেল। ওই দেখো...’

মাথা ঝাঁকিয়ে দক্ষিণ দিকটা দেখাল সরাইখানা মালিক। ওদিককার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একজন রাইডারকে নেমে আসতে দেখা যাচ্ছে। বিশাল এক অর্ধবৃত্ত রচনা করে আসছে লোকটা।

দেখতে দেখতে মুখের ভাব পাল্টে যেতে লাগল লুইসের।
জ্যাস্ট্রোর দিকে ফিরে বলল, ‘আমি তোমার সঙ্গে করমর্দন করতে
চাই, জ্যাস্ট্রো।’

হাত বাড়তে গিয়ে বাড়াল না জ্যাস্ট্রো। রকালের হাতলে হাত
রেখে জরুরি কণ্ঠে বলল, ‘তুমি যাও। চলে যাও এম্ফুনি!’

ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল লুইস। লাগামটা হাতে নিয়ে
জ্যাস্ট্রোর দিকে ফিরে বলল, ‘এখানে আসাটা আমার উচিত
হয়নি। এটা আমাকে পুরনো সে দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে
দিয়েছে। আমার মত নিঃসঙ্গ নেকড়ে পক্ষি ওগুলো মনে আনাই
উচিত নয়। স্মৃতি শুধু মানুষের মন খুঁড়ে বেদনাই জাগায়।’

ভেতর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল লি অ্যান। দরজা থেকে
নামল এক সিঁড়ি। ঘোড়ার কাছে এসে একটা হাত রাখল ওটার
ঘাড়ের। তারপর চোখ তুলল লুইসের দিকে। ‘তুমি চলে যাচ্ছ,
না?’

মাথা থেকে টুপি সরিয়ে নিল লুইস। মাথা নুইয়ে অভিবাদন
জানাল মেয়েটাকে। শেষ বিকেলের সূর্যের আলোয় চকচক করে
উঠল ওর মাথার কয়েক গাছি চুল। ‘হ্যাঁ, ম্যাম। চলে যাচ্ছি।’

‘এখানে কোনও কিছুতেই কি তোমার কিছু আসে-যায় না?’

মুখ নামিয়ে নিল লুইস। তারপর বলল, ‘এর জবাব দেয়া
আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ম্যাম।’

‘আমার কোনও কথাই কি তোমার মত পাল্টাতে পারবে না?’

‘যেভাবে হতে যাচ্ছে, ব্যাপারটাকে সেভাবেই হতে দেয়া
উচিত, ম্যাম।’

লোকটার জন্যে নিজের মনের ভেতর এক ধরনের করুণা
অনুভব করল জ্যাস্ট্রো। কিন্তু নিজের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে
ধাক্কা খেল ও মনে মনে। লি অ্যানের সরল সাদা মুখটায় যেন
বুনো এক হিংস্রতা এসে জমা হয়েছে। রেগে গেছে ও। জ্যাস্ট্রো

টের পেল এটা অভিমানের রাগ নয়, নিখাদ ঘৃণা।

‘তা হলে যাও!’ খেপাটে গলায় টেঁচিয়ে উঠল লি। দু’হাতে ঘুসি লাগাল লুইসের ঘোড়াটার ঘাড়ে। ‘যাও। দূর হও তুমি, নোংরা আউট-ল। আর কক্ষনো এসো না আমাদের এখানে।’

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না লুইস ক্যানট্রেল। চুপচাপ মেয়েটাকে নড করে ঘুরে দূরে সরে গেল।

সকালের সূর্যের লাল রশ্মি আটকে আছে পাহাড়ের গায়ে। আকাশে উড়ছে রঙিন মিহি ধুলো। লুইসের কাছে আসা মেসেঞ্জারকে দেখা যাচ্ছে একটু দূরে। অপেক্ষা করছে লোকটা।

সরাইখানার দিকে শেষবারের মত তাকাল লুইস। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে উঠানে। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ঋজু, অনমনীয় ভাব। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল লুইস। ‘এ-ই ভাল হলো, ম্যাম,’ বিড়বিড় করে বলল। ‘সারা জীবন কষ্ট পাওয়ার চেয়ে একবারই কষ্ট পাওয়া ভাল। আমি আসলে এমন এক ধরনের মানুষ, যা ছুঁই, তা-ই ধ্বংস হয়ে যায়। এটা সহ্য করাটা আসলে কষ্টকর, ম্যাম।’

ঘোড়াটার পেটে স্পারের গুঁতো লাগাল মেসেঞ্জার। অসহিষ্ণু স্বরে ডাকল, ‘সমস্যা কী, লুইস?’

‘কিছু না!’ খেঁকিয়ে উঠল লুইস। ‘তুমি দয়া করে তোমার নোংরা মুখটা বন্ধ করো।’

তারা দু’জনে পাশাপাশি হেঁটে গালশের দিকে এগোল। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এল। প্রায় আধঘণ্টা পরে কয়েকজন মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। ওরা অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। এদের একজন কোভারলিফের ফোরম্যান ফ্রলি। অসহিষ্ণু স্বরে জানতে চাইল লোকটা, ‘তোমরা কি তৈরি?’

নিজের চারদিকের অন্ধকারে অস্পষ্ট অবয়বগুলো ঠাহর করতে

চাইল লুইস। ফ্রলির সঙ্গে জনাদশেক কোভারলিফ রাইডার। এ ব্যাপারটা সে জানত না। ওর নিজের লোকদের সম্পর্কে ওর ভাল ধারণা ছিল। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্যরকম মনে হচ্ছে। ওরা পশ্চিমে যাচ্ছে অন্য কোনও লোভে। সেজন্যে যে-কোনও ধ্বংসাত্মক কাজে ওদের এখন আর আপত্তি নেই। বিতৃষ্ণ বোধ করছে লুইস। তারা আর আগের মত নেই। তারা এখন কোভারলিফ ফোরম্যান ফ্রলির কজায়।

‘কই, তোমরা তৈরি?’ কর্তৃত্বসুলভ গলায় বলল ফোরম্যান।

‘আমরা যাব,’ একঘেয়ে গলায় বলল লুইস। ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়াল ও। ওর পেছনে চলল ছোট বাহিনীটা। আকাশে ছোট্ট এক ফালি চাঁদ। অন্ধকারকে আরও গাঢ় প্রলেপ দেয়া ছাড়া তেমন কোনও কাজ হচ্ছে না ওটা দিয়ে। তবে আকাশের তারাগুলো স্পষ্ট, জ্বলজ্বলে। কিছু কিছু তারার উজ্জ্বল জটলা আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে উন্মুক্ত প্রেইরিকে। অন্ধকারেও দূর থেকে ওয়াই ব্রস-এর বাতি দেখা যাচ্ছে। ফ্রলি মৃদু স্বরে বলল, ‘এখানে থামো। তোমার লোকদের হৈ চৈ করতে নিষেধ করো।’

নিজের ফ্যাসফেসে গলা শুনতে পেল লুইস, ‘থামো, তোমরা।’

লোকগুলো তাকে পেরিয়ে গেল। ঘিরে ধরল ফ্রলিকে। ‘কী হলো?’ রুক্ষ স্বরে বলল ফ্রলি।

‘র‍্যাঞ্জে কে আছে?’ জানতে চাইল লুইস। ওর ভেতর এখন অনেক তিক্ততা। দলা পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে গলা দিয়ে।

‘আছে কিছু কাজের লোক আর মালিকদের একজন। ক্রো হিকস। চিন্তা করো না। এর পুরোটাই আমি দেখছি। কোনও অসুবিধে হবে না।’

ঘরের ভেতর থেকে কিছু কালো অবয়ব বেরিয়ে আসছে।

বিতৃষ্ণায় মাথা নাড়ল লুইস। লোকগুলোর সামনে দিয়ে একটা ল্যাম্প হাতে বেরিয়ে আসছে একজন মহিলা। ওর সাদা হাতে এক জোড়া স্লিপার।

‘ওয়াই ক্রস-এ যদি এমন খাতিরই পাব, তা হলে আমি আগে বুঝতে পারিনি কেন?’ বলল লুইস।

‘কী বললে?’ অসহিষ্ণু স্বরে জানতে চাইল ফ্রলি।

‘ফ্রলি,’ ঠাণ্ডা স্বরে বলল লুইস। ‘আমি কিন্তু বিরক্ত হচ্ছি।’

‘শোনো, লুইস।’ ওর কাছে এসে ভিড়ে গেল ফ্রলি। ‘তিন মাস ধরে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখন আর পিছিয়ে গেলে চলবে না। বুঝেছ?’

‘না, আমরা এর মধ্যে নেই।’

‘ধেত্তেরি!’ খঁকিয়ে উঠল ফ্রলি। ‘এখনই হাঁটু গেড়ে বসে পোড়ো না তো!’

আচমকা আশপাশের লোকগুলোর কাছ থেকে সরে গেল লুইস। ওদের কাছ থেকে দূরে নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

ফ্রলি গাল বকল বিড়বিড় করে। নিজের লোকদের নিয়ে লুইসের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল।

রাগে আগুন ধরে গেল লুইসের মাথায়। তবে নিজেকে সামলাল। অন্ধকারে ঠোট বাঁকা করে হাসল সে।

‘ওকে ধরো! ধরো! শেষ করে দাও!’ চৈঁচিয়ে উঠল ফ্রলি।

‘ও যেন আমাদের পেছনে যেতে না পারে। তা হলে হাল খারাপ করে দেবে!’ চৈঁচিয়ে উঠল আরেকজন। ‘ওকে সবাই মিলে আটকাও।’

‘এই মাথামোটার দল!’ ধমকে উঠল লুইস। ‘আমিই তোমাদের একত্র করেছিলাম... আমিই তোমাদের দল ভেঙে দেব। আমার কাছে যে আসতে চাইবে, সোজা একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেব তার বুকে।’

‘ওর বুকে একটা গুলি ঢুকিয়ে দাও। সব তড়পানি বন্ধ হয়ে যাবে ওর,’ একজন চেষ্টা করে উঠল হেঁড়ে গলায়।

এক টানে অস্ত্র বের করে ফেলল লুইস। কিন্তু টার্গেট করার আগেই মুখে আঘাত পেল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল বুক থেকে সারা গায়ে। চোখে অন্ধকার দেখল ও, মনে হলো কিছু মানুষ নয়, অলৌকিক প্রেতাত্মা ছুটে আসছে ওর দিকে। তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর কানে আঘাত হানছে বজ্রের মত। চলে যাচ্ছে ওরা। ওর মনে হলো, ও মারা যাচ্ছে। ওয়াই ক্রস-মালিকের সম্ভ্রষ্ট গলা শোনা গেল, ‘শালা, মরে ভূত হয়ে গেছে...দু’মুখো সাপের শাস্তি এমনই হওয়া দরকার!’

ওর পনিটা কাছেই কোথাও নাক ঝাড়ল ঘোঁৎ করে। শব্দটা তাকে সচেতন করে তুলল।

‘না, তারা তা কখনোই করতে পারবে না,’ বিড়বিড় করল ও। ‘ঘোড়ার খুরের শব্দই বলে দিচ্ছে, ওরা ওয়াই ক্রস-এ যাচ্ছে।’

ছোরার আঘাতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে লুইসের বুকে। তীব্র ব্যথায় মারা যাচ্ছে যেন। একটা হাত ওর শরীরের নীচে। খুব কষ্টে উঠে বসল ও। হাতটা ঝুলছে ল্যাগব্যাগ করে। ভাল হাতটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাঁপতে কাঁপতে গেল ঘোড়াটার কাছে। শরীরের বাকি জোর আর ইচ্ছাশক্তি একত্র করে ওটার পিঠে চড়ল। জানে, ওর জন্যে এখন একটাই মাত্র জায়গা আছে যাওয়ার জন্যে। সেটা হলো...

কখন কীভাবে সরাইখানার সামনে গিয়ে হাজির হলো ওর ঘোড়াটা জানে না লুইস। কিন্তু সেটা বুঝতে পারতেই ওখান থেকে সরে পড়ার তাগিদ বোধ করল ও। জানে, ফ্রলির দল ওখানে আসবেই। যখন ফের এসে জায়গামত ওর লাশ দেখবে না, তখন দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে অসুবিধে হবে না ওদের। তা ছাড়া ওর গা থেকে ঝরে পড়া রক্তের ধারাই ওদের পথ দেখিয়ে

নিয়ে আসবে।

হঠাৎ বাতাসে বারুদের গন্ধ আর গুলির শব্দ শুনল ও। তারপর দ্রুত ঘোড়ার খুরের শব্দ। আসছে ওরা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী করতে হবে, বুঝতে পারছে না যেন ও।

আচমকা জ্যাস্ট্রোর দরাজ গলা কানে এল ওর। ‘লি, তাড়াতাড়ি একটা আলো নিয়ে এসো।’

লোকটা তার কাছেই, বুঝতে পারল লুইস। কিছু বলল না সে। ওয়াটার ট্রাফের পানির শব্দে পুরো চেতনা ফিরে এসেছে ওর। জ্যাস্ট্রো ব্র্যাণ্টের বিশাল বাহুদুটো তাকে বাচ্চা একটা ছেলের মত নামিয়ে নিল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ইতোমধ্যে আলো নিয়ে এসেছে লি। ‘ওর পাংশু মুখ আর উদ্ভিগ্ন চোখ দেখল লুইস।

‘কিছু মনে কোরো না, লি। আমি তোমার বাড়িতে আসিনি। এই পানিটা সরকারি রাস্তায়। আমি ওখানেই এসেছি।’

‘ওকে ভেতরে নিয়ে চলো, বাবা!’ ওর রসিকতার চেষ্টায় কান দিল না লি। ‘ওরা নিশ্চয় আসছে ওর ট্রেইল ধরে।’

‘না, ভেতরে নিয়ো না,’ প্রতিবাদ করল লুইস। ‘আজ রাতটা ওয়াই ক্রস-এর। ওরা আমাকে শিকার করতে চায়। এখানে পেলে তোমাদের সহ শেষ করে দেবে। তোমরা বুঝতে পারছ না এর ফল কী হতে পারে? তোমাদের দয়ার দরকার নেই আমার। আমাকে বাইরে ফেলে রেখে যাও।’

কিন্তু লি অ্যান তার কথায় কান দিল না। ওর গলার নীচে একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বাবাকে বলল, ‘ওকে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে চলো, বাবা। আমি জানি, ও আমার কাছে ফিরে এসেছে। ওকে আমি আর হারাতে দেব না। ওরা ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।’

‘তুমি বুঝতে পারছ না, এতে তোমাদের কোনও লাভ নেই। বরং বিরাট ক্ষতি হবে।’

‘আমার অবশ্যই লাভ হবে,’ দৃঢ় স্বরে বলল লি। একটু থেমে বলল, ‘আর যদি ক্ষতিই হয়, দু’জনে একত্রে ভাগ করে নেব।’

জ্যাস্ট্রোর কঠোর দৃষ্টি এখন লুইসের ওপর। ‘তোমার সমস্যা কী, বলো তো? তোমার কি নিঃসঙ্গ নেকড়ে হিসেবে থাকতে ভাল লাগবে?’

‘খ্যাৎ!’ খেপে উঠল লুইস। ‘আমি বিরক্ত হচ্ছি, জ্যাস্ট্রো। তুমি ওকে থামাও। আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব হবে না। তোমরা ভীষণ বিপদে পড়বে। গত রাতে প্রতিহিংসার যে আগুন আমি দেখেছি, তা ভীষণ ভয়াবহ। আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।’

একটু থেমে বলল, ‘আমি সন্ত্রাসকে ভয় পাই না। ওদের ঋণ আমি সময়মতই বুঝিয়ে দেব। কিন্তু এখানে থেকে তোমাদের তাতে জড়াতে পারব না।’

‘বাবা!’ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল লি। ‘তুমি যদি ওকে চলে যেতে দাও, আমি তোমাকে কখনও ক্ষমা করব না।’

দরজায় একটা ছায়া পড়ল। ‘ওকে আমরা নিয়ে যাব, জ্যাস্ট্রো,’ বলল ছায়াটি।

চার

কোনও কথা না বলে সামনে এগোল জ্যাস্ট্রো, হাত বাড়িয়ে দেয়াল থেকে অস্ত্রটা নিল। লুইস অবাক হয়ে দেখল বুড়ো, প্রায়

অথর্ব লোকটাকে। দেখল ঘরের ভেতর দাঁড়ানো লোকটাকে।
বাইরে আরও ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

‘জ্যাস্ট্রো!’ ধমকে উঠল লোকটা। ‘তুমি এর বাইরে থাকো!
ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও। সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি যদি
বাধা দাও, তা হলে পরিণাম ভাল হবে না।’

চুপচাপ নীচের দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাস্ট্রো। ওর অস্ত্র
নড়াচড়া করছে। অতটা আশা করেনি আগন্তুক। এবার ধমকে
উঠল, ‘তুমি অস্ত্র ধরছ, জ্যাস্ট্রো?’

‘আমার ঘরটা প্রায় দুর্গের মত, টুমি। তুমি এখন তাড়াতাড়ি
দূর হও। আমি মেজাজ হারানোর আগেই! নইলে জান নিয়ে
টানাটানি পড়ে যাবে তোমাদের।’

‘সাবধান, জ্যাস্ট্রো! তুমি ওয়াই ক্রস-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে
যাচ্ছ। এর পরিণতি বোঝো?’ এবার অবশ্য গলা কিছুটা ম্রিয়মাণ
শোনাল ওয়াই ক্রস ফোরম্যানের।

‘ধ্যাৎ! ওয়াই ক্রস!’ অবজ্ঞায় ঠোঁট ওল্টাল বুড়ো। ‘নিজের
সময়ে এর চেয়ে পাঁচগুণ বড় র‍্যাঞ্চ চালিয়েছি আমি। তুমি এই
অস্ত্রটা দেখছ নিশ্চয়? জান নিশ্চয়, এটা দিয়ে আমি কী করতে
পারি, চাইলে?’

‘এই, ব্যাটা ইঁদুরমুখো শয়তানের দল!’ আবার খঁকিয়ে উঠল
জ্যাস্ট্রো। ‘তোরা মায়ের পেট থেকে মাটিতে পড়ার আগেই আমি
অস্ত্র চালানো শিখেছি। এখন এই জায়গাটা কসাইখানা বানানোর
আগেই জান নিয়ে ভাগ হারামজাদার দল! দূর হ!’

‘তোমার সঙ্গে কোনও ঝামেলা চাই না আমি, জ্যাস্ট্রো,’ নরম
কণ্ঠে বলল টুমি। ‘আমি স্রেফ আদেশ পালন করতে এসেছি।
আমাদের ওপর হুকুম আছে ওই লোককে ধরে নিয়ে যেতে।’

‘আমি বিরক্ত হচ্ছি, টুমি,’ ক্ষীণ স্বরে বলল এবার লুইস।
‘তোমাদের ওই ফালতু র‍্যাঞ্চটাকে আমি ঘৃণা করি। ওটা আমি

একদিন ধ্বংস করে দেব। তবে তোমাদের মত অস্ত্র দিয়ে নয়, অস্ত্র ছাড়াই।’

‘আচ্ছা বেশ বেশ।’ পিছিয়ে গেল টুমি।

ঝট করে ঘুরল জ্যাস্ট্রোও। ওর চোখে আগুন। কথা বাড়াল না আর টুমি, ওয়াই ক্রস-এর ফোরম্যান। বেরিয়ে গেল।

এবার লুইসের দিকে ফিরল জ্যাস্ট্রো।

‘বদনামের একটা ভাল দিকও আছে বুঝলে? আমার থাবা কাটা গেছে আরও বহু বছর আগে। কিন্তু খারাপ নামটা রয়ে গেছে। একসময় সারাদেশ দাপিয়ে বেড়াতাম। লোকে সেটা এখনও মনে রেখেছে। ভয়ও পায়। তুমি নিশ্চয় এখন আমাকে চিনতে পেরেছ, ক্যানট্রেল? আমার গল্প শুনেছ, না?’

‘তোমার অস্ত্র হাতে নেয়া থেকেই আন্দাজ করেছি, তুমি ঘাণু মাল।’ হাসল লুইস।

‘কেউই উপদেশ শুনে মানতে চায় না।’ হাসল জ্যাস্ট্রোও। ‘নিজে আহত হওয়ার আগে বোঝে না, সন্ত্রাস কতটা খারাপ। আমি নিজেও তখন বুঝিনি। তোমার বাবার সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল। এক রাতে সে আমাকে পেয়ে যায়। গুলি করে কোমর ভেঙে দেয়। সুস্থ হয়ে উঠলাম, কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেলাম চিরতরে। কিন্তু লাভটাও বুঝলাম। ভাঙা কোমর নিয়েও তো বেঁচে আছি ভালভাবে। নইলে হয়তো কারও গুলির মুখে ঝাঁঝরা বুক নিয়ে মরে থাকতাম কোথাও।

‘এরপর, ভাল হয়ে তোমার বাবাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি। খুব ভাল লোক ছিল ক্যানট্রেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারা গেল গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে। তার ছেলে জেনেই তোমাকে আমি ওদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারিনি। আর তুমি যখন বলেছ, ওয়াই ক্রস-এর ফয়সালা তুমি অস্ত্র ছাড়াই করবে, তখন ভাল লাগল। তোমার বাবার ভুল তুমি নিশ্চয়

করবে না ।’

‘আমার অস্ত্রটা তুলে রাখো, লি ।’ মেয়েটার চোখে চেয়ে হাসল লুইস । ‘আজ থেকে আরেকটা নিঃসঙ্গ নেকড়ের মৃত্যু ঘটল ।’

ওর ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়াল লি । ‘কিন্তু পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় নয়, লুই । আমার ভালবাসার ছায়ায় ।’

মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল জ্যাস্ট্রো । একটা হাত রাখল মাথায় । ‘ওর পাশে বসে থাকিস, মা । ওর অনেক যত্ন দরকার । সেটা কেবল তুই-ই পারবি ।’ হাসল বুড়ো ।

ওর শীর্ণ হাতটা টেনে নিয়ে চুমু খেল মেয়ে । ‘হ্যাঁ, বাবা । তুমি দেখো, আমি পারব ।’

বাকশটের বউ

এক

‘ভেবে দেখলাম আমার একটা বউ দরকার।’ সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট করে একটা কামড় বসাল বাকশট জোস। চিবোতে চিবোতে বলল, ‘আমি বিয়ে করব।’

‘কী?’ থুহ্ করে একদলা থুতু ফেলল শর্টি হাইটাওয়ার। ভুরু কুঁচকাল। ‘কী দরকার বললে?’

সকাল বেলা। রান্নাঘরে বসে নাস্তা খাচ্ছে রানিং আয়রন র‍্যাঞ্জেয় কাউবয়রা। একটু পরে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়বে। খেতে বসে এমন ঘোষণা দিয়ে বসল র‍্যাঞ্জেয় সবচেয়ে কম বয়সী কর্মী ডেঙ্গা বাকশট।

‘তুমি কী করবে বললে?’ ভালুকের লোমের মত ঘন ভুরুঅলা একটা চোখ উঁচিয়ে ফের জানতে চাইল বেঁটে-খাট কাউবয় শর্টি।

‘বিয়ে করব বললাম।’ নিরীহ চোখ দুটো তুলল সহকর্মীর দিকে বাকশট। হাসল। ‘কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি?’ হাতে ধরা বাকি ডিমটুকু একসঙ্গে চালান করে দিল মুখের ভেতর। চোখ বন্ধ করে চিবোতে লাগল।

‘বুঝেছি।’ থিক থিক করে হাসল শর্টি। ‘সেলুনের কানা মৌলির মত একটা বউ দরকার তোমার। ওরকম মোটাসোটা...’

‘আরে না না। ওরকম কিছু নয়।’ কাপে কফি ঢালল বাকশট।

‘সত্যিকারের বউ । বিয়ে করা ।’

অন্য কাউবয়রা খাওয়া খামিয়ে চাইল বাকশটের দিকে ।
‘সত্যিকারের বউ?’ প্রায় একসঙ্গেই জানতে চাইল ওরা ।

‘এই আউটফিটের লোকগুলোর সমস্যা হলো, এরা সোজা কথাটা সহজভাবে বুঝতে চায় না ।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাকশট । বাঁ হাতের বাহুতে মুখ মুছল প্রচলিত সামাজিক কায়দায় ।

বাবুটি সবার কাপে কফি ঢেলে দিল ফের । তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘মেয়েলোক’ মানেই ঝামেলা!’ শিউরে উঠল সে, যেন কেউ ওর গায়ে ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা মেরেছে । কিন্তু সময়টা এখন শীতকাল নয়, গরমকাল । এই সকাল বেলাতেই ঘামের ভাব ফুটতে শুরু করেছে সবার শরীরে ।

‘মেয়েরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় পরতে চায়, বাচ্চাদের জন্যে নতুন নতুন পোশাক কিনতে বলে । রোববার দিন চার্চে যাওয়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান জুড়ে দেয়,’ বউ থাকলে কী-কী অসুবিধে, তার একটা ফিরিস্তি দিল বাবুটি । মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘উঁহু । বউ মানেই ঝামেলা ।’

‘ওরা তোমাকে,’ আরেক দলা খুতু ফেলল শটি, ‘যেখানে ইচ্ছে সেখানে খুতু ফেলতে দেবে না ।’

‘ওদের সঙ্গে ওদের আত্মীয়স্বজন আসবে । তোমার ছোট নিরিবিলি ঘরটায় বাজার বসিয়ে দেবে । প্রতি রোববার তোমার বিশ্রামের সময়টাতে চার্চে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে দেবে ।’ বুকফাটা এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বুড়ো । ‘এভাবে ওরা পাগল করে ছেড়ে দেয় একজন পুরুষকে ।’

ষাট বছরের পুরানো লিকলিকে বেতো পায়ে হেঁটে স্টোভের কাছে গেল লিম্পি । ‘বুঝলে, এমন কোনও মেয়েলোক দেখলাম না, যার কাছে একটা গেল্ডিং ছুরি ছিল না ।’

‘৭৯ সালে বউয়ের ভয়ে পালিয়ে টেক্সাস চলে এসেছিলাম,’

নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল শর্টি। ‘সারাক্ষণ ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানঘ্যান। পারেও বাবা। মাঝখানে বসানো জিভটার যেন দু’দিকেই ছিল ধার।’

স্বপ্নময় দু’চোখ বাকশটের। কারও কথায় কান না দিয়ে পকেট থেকে একটা ক্যাটালগ বের করে বিছাল টেবিলের ওপর। পাতা উল্টে বের করল একটা মেয়ের ছবি। সুন্দর, মনোরম চেহারার এক তরুণী মেয়ে।

ছবি দেখে মুখ ঝুলে পড়ল শর্টির। ‘আরে সুন্দর তো!’ বিড়বিড় করল। তারপর পকেট থেকে মোটা ফ্রেমের চশমাজোড়া বের করে নাকে সাঁটল। ‘ভারী সুন্দর কিন্তু। দেখলেই...’

‘বিয়ে করতে ইচ্ছে করে?’ সমস্বরে প্রশ্ন করল বাকশট ছাড়া বাকিরা। ‘কই দেখি?’ একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ল সবাই ছবিটার ওপর।

বেডরোল বার্নস একটু বেশি ঝুঁকল। সবার আগে মাথা তুলল ও। তারপর ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলল, ‘যা বুঝলাম...মেয়েটা বিয়ে করতে চায়। তাই স্বামী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে ক্যাটালগে।’

ওর কাঁধের ওপর ঘাড় লম্বা করে দিয়ে ক্যাটালগে চোখ রাখার চেষ্টা করছে লিম্পি। পড়ল, ‘আনটাচড, ইগার-টু-প্লিজ ফিমেলস সিক হাসবেও...’

‘ইগার-টু-প্লিজ? হাহ!’ বিড়বিড় করতে করতে চুলোর কাছে ফিরে গেল লিম্পি।

লিম্পি যেটুকু পড়েছিল, তার পর থেকে পড়তে শুরু করল বেডরোল। ‘কেবল সৎ, পরিশ্রমী ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্নরাই আবেদন করুন।’

নাস্তার টেবিল থেকে উঠে পড়ল বাকশট। গম্ভীর স্বরে বলল, ‘সমস্যা নেই। আমি মাসে বিশ ডলার কামাই। সারা সপ্তাহ

অনেক কাজ করি, রোববার বিশ্রাম নিই। আমার একটা নিজস্ব ঘোড়া আর একটা স্যাডল আছে...

‘মানে! শটগান-কে তুমি ঘোড়া বলতে চাও নাকি?’

তীব্র চোখে তাকাল বাকশট বেডরোলের দিকে। শটগান তার ঘোড়ার নাম। বহু বছর ধরে তার সঙ্গে আছে। বলতে গেলে তার সবচেয়ে ভাল বন্ধু ওই ঘোড়াটাই। শটগানকে নিয়ে কোনও হাসিঠাট্টা ওর পছন্দ নয়।

‘আমার দেখা সবচেয়ে সেরা বুড়ো ঘোড়া হলো শটগান।’ পেট দুলিয়ে হাসতে লাগল বেডরোল।

‘ইস!’ ক্যাটালগের আরেকটা পাতা ওল্টাল শটি। ‘আমি যদি একটু পড়তে পারতাম তোমাদের মত!’ টেকো মাথায় জমে ওঠা ঘাম মুছতে মুছতে বলল। তারপর আচমকা চোঁচিয়ে উঠল, ‘উরিব্বাস! এটা দেখি আরও সুন্দর!’

‘মেয়েলোক! উঁহু,’ কিছুতেই একমত হতে পারছে না লিম্পি। ‘বিয়ে করার আগে তারা হলো ফাঁদ। আর বিয়ে হয়ে গেলে তুমি হলে গিয়ে ভেড়া।’

‘কী-ই-ই! ভেড়া!’ সবাই এক যোগে চোঁচিয়ে উঠল।

‘ওরা ধুরন্ধর, বুঝলে?’ বাকশটের দিকে হাতে করে নিয়ে আসা হাতাটা উঁচাল গুঁতানোর ভঙ্গিতে। ‘ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা পুরুষের কম্মো নয়।’

‘কিন্তু ওরা কী মিষ্টি করে কথা বলে বলো তো!’ আবার স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল বাকশটের চোখ। ‘যেন মধু ঝরে পড়ে। তাই না?’

‘প্রথম প্রথম।’ মুখ বেঁকাল লিম্পি। ‘তখন তাদের মুখটাকে মনে হবে সাজানো-গোছানো একটা বাগানের মত। কিন্তু কিছুদিন গেলেই মনে হবে স্রেফ মরুভূমি। মরীচিকাটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না।’ বিরক্তমুখে বাকশটের কাপে আবার কফি ঢেলে দিল।

টেবিলে বিছানো ক্যাটালগটা টেনে নিল বাকশট। একটা ছবির ওপর আঙুল রাখল। ‘এই মেয়েটা সুন্দর। নাম ক্লেমেন্টাইন বেলোজ। আমি এর কাছে জবাব পাঠাব।’

লম্বা ছিপছিপে মেয়েটা। মাথায় সোনালি রঙের চুল। চোখ দুটো সরল আর সজীব। ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসি। শিস দিল শর্টি।

বেডরোল বার্নস ছবির নীচের ক্যাপশন পড়ল: ভালবাসে বাচ্চাকাচ্চা, ঘোড়া, রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

‘আহ! সত্যিই যদি পড়তে পারতাম!’ আবার শোনা গেল শর্টির আক্ষেপ।

‘আচ্ছা...স্বামীর হুকুম মেনে চলবে তো?’ বেডরোলের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

লিম্পি ফের মুখ বেঁকাল। ‘কেউই মেয়েদের আদেশ দিতে পারে না। আদেশ করবে কেবল ওরাই। পুরুষের কাজ তাদের আদেশমত চলা।’

‘আমার বউ বান্ধহাউসে ঘুমাবে ন্না,’ জানিয়ে দিল বাকশট।

‘তার দরকারই বা কী? গোবরের গাদা আছে না?’ শর্টি পরামর্শ দিল।

‘হ্যা! থোঃ!’ বেডরোলের পর্যন্ত পছন্দ হলো না পরামর্শটা। ‘আমাদের বাকশট কি না শেষে গোবরের গাদায় ঠেক দিয়ে বসে বউয়ের সঙ্গে প্রেম করবে!’

‘আচ্ছা...তা হলে ধোকড়ি ঘরটায়...মানে যেখানে পুরনো আর অকেজো মালপত্র রাখা হয় আর কী? ভাল জায়গা কিন্তু, ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি, পুরনো বিছানাপত্রও আছে, সেখানে...’

‘ইয়ে...আচ্ছা প্রিভি, মানে পায়খা...না, মানে ওটাও একটা ঘরের মত কি না দেখতে,’ আরেকজন বলল।

‘হ্যাঁ, সেখানে বুনোফুলের গন্ধও পাওয়া যাবে,’ সমর্থন জানাল

বেডরোল ।

‘আর ইয়ে...মানে ইয়ে, মানে ইয়ে আর কী?’

‘কী? বলে ফেলো । ইয়ে ইয়ে করছ কেন?’

‘তোমাদের মাঝখানে ইঁদুরের বাচ্চার মত তুলতুলে একটা বাচ্চা । সারাক্ষণ চিকন সুরে বাঁশি বাজাবে...মোআঁও মোআঁও...’
অভিনয় করে শোনাল শর্টি ।

‘এক ঘণ্টা বা দু’ঘণ্টা পর পর বাচ্চার জন্যে খাবার তৈরি করো...’ যোগ করল লিম্পি ।

‘একটার পর একটা ভিজে তোয়ালে পাল্টে দাও,’ সাবধান করল বেডরোল । হাসি দু’কান ছুঁয়েছে ওর ।

নাক কুঁচকাল-শর্টি । ‘বাকশট তোমার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে । রাতভর আরাম করে নাক ডাকানোর দিন শেষ ।’

কারও কথায় কান দিল না বাকশট । সঙ্গীদের সে চেনে ভাল করে । এরা সবাই ভবঘুরে । ঘোড়ার পিঠেই দিন, পারলে রাতটাও কাটিয়ে দিতে চায় । সংসারের মানে এরা কী বুঝবে? এরা শুধু লম্বা লম্বা কথা বলে । যা নয়, তার চেয়ে তিনগুণ বাড়িয়ে ।

ম্যারিজ অ্যাপ্লিকেশন লিখে পাঠিয়ে দিল সে । সঙ্গে একশ’ ডলারের মানিঅর্ডার । ক্রেমেন্টাইন বেলোজের আসার ভাডাসহ অন্যান্য খরচ ।

দুই

তা মুখে যা-ই বলুক, রানিং আয়রন কাউবয়রা কিন্তু ঠিকই কাজে লেগে পড়ল। পুরানো জঞ্জাল রাখার ধোকড়ি ঘরটা পরিষ্কার করল। ছাদ মেরামত করল, দেয়ালের ফুটোগুলো বন্ধ করে দিল। ভেতরে দুটো র‍্যাটল সাপ সংসার পেতে বসেছিল। আগুবাচ্চাসহ দুটোকেই মেরে একদম দূরে ফেলে দিল। নোংরা মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার ঝকঝকে করে তুলল। পুরানো জংধরা জানালাগুলোর কজায় তেল দিয়ে মসৃণ করে দিল, যেন খুলতে আর লাগাতে বিকট শব্দ করে বাসিন্দাদের বিরক্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। পর্দা লাগিয়ে দেয়া হলো। ছাদের নীচে টাঙিয়ে দেয়া হলো ক্যানভাস। ফলে টিকটিকির ডিম কিংবা বাচ্চা পড়ে খাবার-দাবার বা বিছানাপত্র নষ্ট হওয়ার ভয় রইল না।

‘ওর জন্যে একটা নতুন বালতিও নিয়ে এসেছি।’ হাসল শর্টি। ‘হলুদ রঙের রিবন দিয়ে মুড়ে দিয়েছি হাতলটা। ক্রেমেন্টাইনের কোমল হাতে ফোসকা পড়বে না ওটা বইতে গিয়ে।’

নিজের চশমাজোড়া মুছে পরিষ্কার করে নিল শর্টি। চোখে লাগিয়ে তাকাল সামনের দিকে। ‘তোমার বউ আসলে ভাগ্যবান। ঝরনাটা মাত্র একমাইল দূরে। গরমকালে পানির জন্যে বেশিদূর যেতে হবে না। আসতে-যেতে দু’দিক থেকেই ঢালু। চড়াই ভাঙার দরকার হবে না।’

সব শেষে ‘ফিনিশিং টাচ’ হিসেবে ঘরটার ঢোকান মুখে

দরজার ওপর একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল। তাতে লেখা: হোম সুইট হোম।

মাসখানেক পর। কাছের কাউটাউন লোনসামে একটা স্টেজকোচ এল। রাস্তার সব ধূলিবাণি আকাশে উড়িয়ে দিতে দিতে আর ঘোড়ার নাদিতে বসা লাখ লাখ মাছির বিরক্তি উৎপাদন করতে করতে স্টেজকোচটা রেড ডগ সেলুনের সামনে এসে দাঁড়াল।

রানিং আয়রনের কাউবয়রা একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিল। বাকশটের হাতে ছিল এক গুচ্ছ বুনোফুল।

ধূলিধূসর সুট আর নোংরা ডার্বি হ্যাটপরা বেঁটেমত একজন লোক স্টেজকোচের দরজা খুলল। নামার উপক্রম করল। আচমকা ভেতর থেকে সাদা দস্তানাপরা একটা হাত ছোঁ মারার ভঙ্গিতে লোকটার প্যান্ট আঁকড়ে ধরল। ভেতরের দিকে হ্যাঁচকা টান দিল।

‘দাঁড়াও, হানি। আস্তে।’ ভেতর থেকে ভেসে এল একটা নারী কণ্ঠস্বর। বাচ্চা ছেলেকে বোঝাবার ঢঙে বলল, ‘আগে মহিলাদের বেরোতে দিতে হয়।’

ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল কোচ। বাররুমের পেট মোটা বিয়ারের ক্যানের মত একদিকে কাত হয়ে পড়ল। মাটিতে প্রায় ইঞ্চিখানেক দেবে গেল এর চাকা। বিশাল কোমরঅলা, লালচুলো এক মহিলাকে দেখা গেল স্টেজকোচের খোলা দরজায়।

‘মাই গড!’ আচমকা হাঁ হয়ে গেল বাকশট। বিড়বিড় করে বলল, ‘এটা নিশ্চয় ক্রেমেন্টাইন বেলোজ নন। শার্টি, তুমি কী বলো?’

‘এটা?’ বিভ্রান্ত দেখাল শার্টিকে। ‘এটা যদি সে হয়, সে তা হলে কে? তাকে তো ছবিতে এমন কলসিমার্কা মনে হয়নি।’

‘ক্যাটালগে কনে ক্রেমেন্টাইন বেলোজকে দেখা গেছে সুন্দরী

এক যুবতীর মত । কিন্তু একে তো দেখে মনে হচ্ছে...আরে! এ যে দেখি হাসছে! কিন্তু ওর মুখে দেখা যাচ্ছে গোটা কয়েক দাঁতই গায়েব ।’

‘ইয়ে...’ টোক গিলল লিম্পি । ‘এটা দেখছি ষাঁড়ের চেয়ে তাগড়া ।’

‘ওর দেখি গৌফও আছে!’ ককিয়ে উঠল বেডরোল বার্নস ।

‘হুঁ । বিশাল তাগড়া এক জোড়া গৌফ,’ যোগ করল লিম্পি ।

গৌফ এবং দাঁতের বিষয়টা এদের বানানো । চেয়ে দেখল বাকশট । নাকের নীচে গৌফের মত একটু চুল আছে বটে । অনেক মেয়েরই থাকে বটে । আর দাঁত? পড়ে যায়নি, একটু ক্ষয়াটে ।

রেড ডগের সামনে বেকুবের মত ঘুরঘুর করতে থাকা দুই কাউবয়ের দিকে তাকাল স্ত্রীলোকটি । ‘আরে! আমাকে নামিয়ে নাও না । বুঝতে পারছ না, আমি ক্রেমেন্টাইন বেলোজ । বাকশট জোসের ভাবী বধূ ।’

‘ও, মাগো!’ আত্ননাদ করে উঠল বাকশট । ‘এ যে দেখছি সত্যিই সে!’

আরেকটু হলে ঠা ঠা করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল বেডরোল । অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল ।

ক্রেমেন্টাইনের বিশাল গাবদা-গোবদা পা-দুটো ভূমিস্পর্শ করার পর সিধে হলো একদিকে কাত হয়ে যাওয়া স্টেজকোচটা । ওকে নামতে সাহায্য করতে যাওয়া রেড ডগের সামনে ঘুরঘুর করতে থাকা দুই কাউবয় আবার নিজেদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল । দু’জনই নিজেদের পিঠ ডলতে শুরু করেছে । হাঁফাচ্ছে বেচারারা ।

মার্বেলের মত গোল চোখদুটো ঘোরাল ক্রেমেন্টাইন । রেড ডগের সামনে দাঁড়ানো প্রায় জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাউবয়দের ওপর গিয়ে স্থির হলো । ‘কই? আমার হবু বর

কোথায় গেল? বাকশট জোঙ্গ, তুমি কোথায়?’

ওর গলার স্বর যেন এক ব্লক বিশিষ্ট কাউন্টাউনটার প্রতিটি মানুষের কানে গিয়ে বোমার মত বিস্ফোরিত হলো। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে বাকশট। মুখ সাপের পেটের মত সাদা।

‘শি’জ অল ইয়োরস, ক্যাসানোভা।’ তামাক খাওয়া ময়লা দাঁত বের করে এক গাল হাসল লিম্পি। শটিকে সঙ্গে নিয়ে বাকশটের পেছনে ধাক্কাতে লাগল। পা চলছে না বাকশটের। তিনবারের চেষ্টায় ওকে ওর সম্ভাব্য বধূর সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ওরা।

মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে হাতে নিল বাকশট। তারপর একটু বুকে অভিবাদন জানিয়ে জানতে চাইল, ‘মিস ক্রেমেন্টাইন?’

‘তুমি বাকশট?’

‘হ্যাঁ, ম্যাম। আমি বাকশট।’ বুনোফুলের গোছাটা বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে।

‘এই তো। আমি তোমার শ্যামা, তোমার শ্যামঘুঘু।’ বিশাল কোমরে ঢেউ তুলল ক্রেমেন্টাইন। বুকে মোচড়ের ভঙ্গি করল। তারপর গাছের গুঁড়ির মত মোটা দু’বাহু ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘এসো, হানি। তোমার হবু বউকে খুব বড় করে একটা চুমু খাও।’

বজ্রাহতের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল বাকশট। নড়াচড়া করতে পারছে না যেন। বিশাল দু’হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ক্রেমেন্টাইন বেলোজ। ওকে চুমু খেতে ডাকছে। বর হিসেবে ওর উচিত কালবিলম্ব না করে বউয়ের ডাকে সাড়া দেয়া। কিন্তু...

পেছন থেকে শর্টি ও লিম্পির ঠেলা ওকে ক্রেমেন্টাইনের বুকে নিয়ে ফেলল। বিশাল দু’হাতে আঁকড়ে ধরল ওকে ক্রেমেন্টাইন। একটার পর একটা চুমু খেল, সশব্দে।

সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করল হবু দম্পতিকে।

ডান হাতের দস্তানা খুলে ফেলল ক্রেমেন্টাইন। বাকশটের খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা লাল মুখে হাত বুলাল। ‘তুমি খুব কিউট, ডার্লিং।’

বাকশট লজ্জা পাচ্ছে। ‘আহ! কী যে বলো না।’

‘তুমি আমাকে ক্রেমেন্টাইন বলে ডাকতে পার। অথবা শ্যামঘুঘু বললেও আমি খুশি হবো। কিংবা মিসেস বাকশটেও আমার আপত্তি নেই।’ হি হি করে হাসল। ‘তবে বেশি খুশি হবো মিসেস বাকশট ক্ল্যারেন্স জোস ডাকলে।’

এক হাতে শর্টির গলা বেড় দিয়ে ধরে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল লিম্পি। ‘ক্যাটালগে যে ছবিটা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বড়, তাই না?’

‘কম পক্ষে তিরিশ বছরের বড় হবে বাকের চেয়ে। ওর দাদির বয়সী প্রায়।’

‘কিংবা দাদার। গৌফ দেখে সেরকমই লাগে।’

যেরকমই লাগুক, কিন্তু বাকশটের সাহসে কুলাল না বিয়ে করবে না বলে পিছিয়ে আসতে কিংবা টাকা ফেরত চাইতে। কারণ ভুল হোক আর না হোক, সে একটা মেয়েকে বিয়ের কথা বলে অতদূর থেকে নিয়ে এসেছে, এখন মত পাল্টালে চলবে কেন? বিয়ে করতেই হবে। সে বলতে চাইল, ‘আমার মুখের কথাই দলিল। আর এটাই হলো পশ্চিমের নিয়ম। আমি বিয়ে করছি ওকে।’ কিন্তু বলতে পারল না।

বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলল ক্রেমেন্টাইন নিজে। আগামী কাল রেড ডগে বিয়ে।

তিন

পালিশ করা বুট, টাই আর নতুন কাউবয় হ্যাট পরেছে বাকশট। বরের সাজে আরও রয়েছে দোকানে তৈরি জিন্সের প্যাট আর শার্ট। শার্ট আর লিম্পি ধার দিয়েছে তাদের ভেস্ট, সোনার ঘড়ি আর চেইন।

বিয়ের সাজ পরেছে ক্রেমেন্টাইনও। ওর গায়ে চুনটের কাজ করা লম্বা ওয়েডিং গাউন। কাঁধ থেকে নীচের দিকে ঝোলানো। তবে কোমর এবং বুকের কাছটায় মেদবহুল স্ফীতির কারণে দু'পাশের জোড়ার সেলাইয়ের মুখগুলো যে-কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

‘ওটার, গাউনটার কথা বলছি, অবস্থা দেখেছ? মনে হয় আগেও পরেছিল সে ওটা,’ ফিসফিস করল লিম্পি।

‘হুম।’ মাথা দোলাল শার্ট। ‘ওকে আমি ওর পোশাক থেকে ধান ঝাড়তে দেখেছি। অনেকগুলো। রাইসপুডিং তৈরি করা যাবে কম পক্ষে আটজনের জন্যে।’

কানা মৌলির ‘ওহ, প্রমিজ মি’ গানটা দিয়েই শুরু হলো বিয়ের অনুষ্ঠান।

শটগান বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে কী হচ্ছে, লেজ নাড়তে নাড়তে দেখছে খুব মন দিয়ে। বাকশট ঘোড়াটাকে ভেতরে নিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু ক্রেমেন্টাইন বলে দিল, তা করা যাবে না। ঘোড়া তার একদম

পছন্দ নয় ।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল । পাদ্রী বয়স্ক লোক । ঠিকমত কানে শোনে না । দুই কানে মেটাল ইয়ার লাগানো । জিরজিরে হাঁড়িসার শরীর, নাকের গোড়ায় বসানো চশমা ।

পাদ্রীর মেটাল ইয়ারের ফুটো দিয়ে ঠন করে যেন ঢুকে গেল ক্রেমেন্টাইনের বাজখাঁই গলার আওয়াজ । ‘আরে তাড়াতাড়ি করো, মিয়া । বাকশটের সময় নেই । অনেক কাজ পড়ে আছে ।’

বিয়ের কনের মুখে এসব কথা বেমানান । হতবুদ্ধি হয়ে গেল বাকশট । তবু একটুখানি হাসার চেষ্টা করল ।

বুড়ো পাদ্রীর পরনে একটা পোকায় খাওয়া ফ্রক কোট । কলার উঁচানো শার্টের সঙ্গে যত্ন করে বাঁধা টাই । সেলুনের ভেতর প্রচণ্ড গরম, লোকজনে গমগম করছে ।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল পাদ্রী । যথোচিত গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা চালাল । ‘তুমি ক্রেমেন্টাইন বেলোজ, বাকশট জোসকে আইনগত বিবাহের মাধ্যমে তো-তোমার স্বামী হিসেবে মেনে...’

পাদ্রীকে কথা শেষ করতে দিল না ক্রেমেন্টাইন, তার আগেই বলে বসল, ‘নিলাম...’

‘কী বললে?’ পাদ্রী তার লম্বা ইয়ার ট্রাম্পেটটা এগিয়ে দিল কনের দিকে ।

‘বলেছি...মেনে নিলাম!’ ট্রাম্পেটের আরেক মাথায় মুখ রেখে এবার বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠে জবাব দিল ক্রেমেন্টাইন ।

চমকে উঠল কানে খাট পাদ্রী, হাত থেকে ট্রাম্পেট ফেলে দিল ।

‘কিন্তু ইয়ে, মানে শ্যামঘুঘু,’ বলতে গেল বাকশট । ‘পাদ্রীকে তার কথাটা শেষ করতে দেয়া উচিত ।’

‘চুপ করো,’ হুকুম দিল ক্রেমেন্টাইন ।

‘কিন্তু...আমি মানে আমি...’ থেমে গেল আবার ধমক খাওয়ার

ভয়ে ।

ট্রাম্পেটটা তুলে নেয়ার জন্যে হাতের কাজ রেখে ধূলিবাণিভরা মেঝেয় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পড়ল পাদ্রী । পা দিয়ে পাদ্রীকে ঠেলা দিল সদ্য নববধূ । গুঁতো খেয়েও ট্রাম্পেটটা কুড়িয়ে নিয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এল যাজক । নিজের জন্যে তৈরি অস্থায়ী আসনটায় বসল ফের । ট্রাম্পেটটা পরে নিল ডান কানে ।

ফের শুরু করল । ‘ইয়ে, বাকশট, মানে ইয়ে তুমি এই মহিলাকে বিয়ে...’

‘ও করেছে,’ শেষ করার আগেই উপসংহার টেনে দিল ক্রেমেন্টাইন ।

‘কিন্তু ইয়ে...মানে প্রিয় শ্যামঘুঘু, কথাটা আমার মুখ থেকেই শোনা উচিত সবার,’ ঘ্যানঘ্যান জুড়ে দিল বাকশট । বেচারী বুঝতে পারছে না ঠিক কী করা উচিত । তবে বিয়ের অনুষ্ঠানটা তার কাছে হঠাৎ বিষের মত লাগছে ।

‘কী হলো, চুপ করে বসে আছ কেন, প্রিচার? চালিয়ে যাও ।’

গরমে দরদর করে ঘামছে যাজক । সে অবস্থায় বলতে লাগল, ‘এবং তুমি তুমি...ক্রেম...ক্রেমেন্টাইন, তুমি এই প্রতিজ্ঞা করো যে, বাকশটকে সব সময় ভালবাসবে...সম্মান করবে এবং...এবং তার কথা মেনে চলবে ।’

একদিকে মাথা কাত করল ক্রেমেন্টাইন, তারপর সেভাবেই রইল ।

‘কই, বলো?’ তাড়া দিল যাজক । ‘তুমি...’

‘দাঁড়াও চিন্তা করে দেখি ।’

‘তাড়াতাড়ি বলো ।’

‘আমার জবাব হলো...হ্যাঁ । হ্যাঁ এবং না,’ জবাব দিল ক্রেমেন্টাইন ।

‘ক-কিন্তু শ-শ্যামঘুঘু...’ বলেই থেমে গেল বাকশট । অবাক

হয়ে গেছে। তোতলাচ্ছে কেন সে?

ইতস্তত বোধ করছে যাজক। ওর পাঁশুটে মুখে প্রশ্নরেখা। কিন্তু সাহস করে ফের জিজ্ঞেস করতে পারছে না। নিজের দীর্ঘ যাজকজীবনে কখনও বিয়ের কনের এমন ব্যাভার দেখার অভিজ্ঞতা ওর আর কখনও হয়নি।

কাঁধ ঝাঁকাল অবশেষে। একে একে বর-কনে আর সাক্ষীদের ওপর চোখ বুলাল। ইয়ার ট্রাম্পেটটা খুলে আবার পরে নিল।

আচমকা লাথি মারল ক্রেমেন্টাইন। ককিয়ে উঠল লোকটা।
‘ক্রেমেন্টাইন গর্জে উঠল, ‘কই তোমার কাজ শেষ করো!’

এক পায়ে লাফাতে লাগল যাজক। শটির ডান হাতের বুড়ো ঠাঙুল মাড়িয়ে দিল। খিস্তি আউড়ে হাত সরিয়ে নিল শটি। ‘কী হচ্ছে এসব?’

দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে যাজকের। ভয় পেয়েছে। বিয়ের কনে যাজক পেটায়? অঁ্যা? লাথি মেরে বেইজ্জত করে? ককাতে ককাতে বলল, ‘আ-আমি ঘ-ঘোষণা করছি, তোমরা দু’জন এখন থেকে স্বামী-স্ত্রী। ব-বাকশট, তোমার স্ত্রীকে চুমু খেতে পার।’

নিজে নিয়ে আসা ওয়েডিং ব্যাণ্ডটা বাকশটের হাতে ঠেলে গুঁজে দিল ক্রেমেন্টাইন, ওর হাতে বেঁধে দেয়ার জন্যে নিয়ে আসা ব্যাণ্ডটা হ্যাঁচকা টানে শটির হাত থেকে কেড়ে নিল। টানের চোটে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাওয়া কাউবয় এক পায়ে লাফিয়ে উঠে পতন সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এই ফাঁকে বাকশটকে আঁকড়ে ধরল ক্রেমেন্টাইন। বিশাল এক চুমু খেল ওর মুখে। কাদায় আটকে যাওয়া বুট টেনে তোলার মত ‘হপ’ করে শব্দ হলো তাতে।

চার

বিয়ে শেষ। এবার মধুচন্দ্রিমা। প্রেইরির বুকে খচ্চরে টানা একটা খড়ের ওয়াগনের ভেতর মধুচন্দ্রিমা কাটাবে বর-বধূ, এমনটাই ঠিক হলো।

‘শ্যামঘুঘু,’ খড়ের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে ক্রেমেণ্টাইনের দিকে একটু ভিড়ে যেতে চাইল বাকশট। ‘আমরা কি...’

‘না, আজ রাতে নয়, প্রিয়তম।’ সরে গেল ক্রেমেণ্টাইন। ‘খচ্চরগুলো জেগে যাবে।’

‘হাহ্!’ হাসল বাকশট। ‘ভালই বলেছ।’ অগত্যা ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হলো ক্রেমেণ্টাইনের একের পর এক অভিযোগ। এক সময় বাকশটের মনে হলো, ওর বউয়ের অভিযোগের স্টক অফুরন্ত। কখনও শেষ হবে না। প্রথমেই শটগানকে নিয়ে পড়ল ক্রেমেণ্টাইন। ‘এই বুড়ো ঘোড়াটাকে কেন রেখেছ? এরকম বিশ্রী একটা ঘোড়া কারও থাকতে পারে, বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার।’

শটগানকে নিয়ে এরকম মন্তব্যে মনে কষ্ট পেল বাকশট। আর কেউ হলে এতক্ষণে ঝগড়া বাধিয়ে দিত। কিন্তু তা করতে গেলে বউয়ের চেয়ে ঘোড়াকেই বেশি দাম দেয়া হবে মনে করে চুপ করে রইল।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে প্লেটের দিকে তাকাতে মুখ

ঝুলে পড়ল ওর। ‘আমার শ্যামঘুঘু, আমি ভেবেছিলাম আজ ভাল কিছু খাব। তুমি তো রাঁধতে জানো, তাই না?’

‘জানি। ওটমিল। আমি ওটমিল রাঁধতে পারি।’

‘আমি ওটমিল খাই না। ভীষণ ঘেন্না লাগে।’ প্লেটটা ঠেলে দিল। তারপর কফির মগ হাতে নিল। চুমুক দিয়েই কোনোমতে বমি করার ঝাঁকটা সামলাল। ক্রেমেণ্টাইন দেখতে পেলে নির্ঘাত কেলেক্কারি বাধিয়ে দেবে। কফিটা, ওর মতে ঘোড়ার মূতটা, কোনোমতে গলা দিয়ে চালান করে দিল সে।

পরদিন ফুরফুরে মেজাজে র‍্যাঞ্জে ফিরে এল বাকশট। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মদির চোখে ওর দিকে চাইল ক্রেমেণ্টাইন। ‘বাক, প্রিয়তম, তুমি কি আমাকে কোলে করে ঘরে ঢোকাবে না?’

ভারী জিনিস বয়ে নেয়ার অভ্যাস বাকশটের নেই, এমন নয়। অনেক ভারী জিনিসই নিজের চেষ্টায় কাঁধে তুলে নিতে পারে ও। কিন্তু ক্রেমেণ্টাইনের প্রস্তাব শুনে প্রথমে একটু ভড়কে গেল। বাচ্চা-টাচ্চা হলে কথা ছিল, কিন্তু অমন বুড়ো ধাড়ি একজনকে কোলে নিয়ে হাঁটার ব্যাপারটা ভাবতে যেন কেমন লাগে। ওর হাতের বেড়ে আসবে কি ক্রেমেণ্টাইনের বিশাল শরীর?

তবে পিছিয়ে যেতে মন চাইল না ওর। নতুন বউ একটা আদার করেছে। দায়িত্বশীল পুরুষের উচিত সেটা পূরণ করা।

ক্রেমেণ্টাইনের চারদিকে বার-দুয়েক ঘুরল। কোন্‌খান দিয়ে ধরলে ওকে তুলতে সুবিধে হবে দেখছে।

গড, যিশু, মেরি—শক্তি জোগাবার জন্যে সবাইকে একসঙ্গে ডাকল বাকশট। ক্রেমেণ্টাইনের পিঠে এক হাত রাখল। তারপর নিচু হয়ে ওর পায়ের হাঁটুর নীচ দিয়ে আরেক হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তৈরি হলো তোলার জন্যে। ওকে সাহায্য করার জন্যে হাঁটু মুড়ে ঘাড় নিচু করল ক্রেমেণ্টাইন।

হ্যাঁচকা টানে তোলার চেষ্টা করল বাকশট। পরক্ষণে অবাক হয়ে ছেড়ে দিল। এটা কী রে, বাবা! পাথরের বস্তু নাকি!

কোলে ওঠার জন্যে ঢিলে করে দেয়া শরীরটাকে অতি কষ্টে সামলে নিল ক্লেমেন্টাইন। আরেকটু হলেই ধপপাস করে বসে পড়ত। ‘আহ, ডার্লিং!’ খসখসে মদির গলায় অনুযোগ করল। ‘কী করছ? আরেকটু হলেই তো...দেখি, আবার চেষ্টা করো। সাবধানে তুলবে কিন্তু।’

আবার চেষ্টা করতে গেল বাকশট। লজ্জা পাচ্ছে মনে মনে। সে একটা জোয়ান ছেলে। একজন মহিলাকে অনায়াসে তুলতে পারা উচিত। এবার আর হ্যাঁচকা টান দেবে না। ধীরে ধীরে তোলার চেষ্টা করবে।

মেরিদের মা-ছেলে আর ঈশ্বরকে ফের ডাকল বাকশট। ক্লেমেন্টাইনের পিঠ আর উরুর নীচে হাত গলাল। আবার নিজেকে ঢিলে করল ক্লেমেন্টাইন। প্রাণপণ চেষ্টায় ওকে তোলার চেষ্টা চালাল বাকশট। এক ইঞ্চি...দুই ইঞ্চি...তিন...

‘হ্যাঁ, এভাবে, এভাবে, প্রিয়তম। এবার এগোও। সাবধানে সামনে...’

এক পা...দু’পা...হাঁফাচ্ছে বাকশট। তি...ন পা-আ...

চৌকাঠে পা রাখতে গিয়ে আর পারল না। হাঁটু ভেঙে ধপপাস করে নিজে বসে পড়ল। ক্লেমেন্টাইনের পুরো শরীরের ভর পড়ল ওর গায়ের ওপর। ধাক্কার চোটে চিৎ হয়ে গেল।

বিশাল শরীরের নীচে পড়ে হাঁসফাঁস করছে বাকশট। হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে বসল ক্লেমেন্টাইন। হাঁফাচ্ছে। মুখ রাগে লাল।

‘ক্লেমেন্টাইন,’ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল বাকশট। ‘ইয়ে তুমি...তুমি একটু বেশি ভাবী...’

সঙ্গে সঙ্গে ভারী শরীর নিয়েও লাফিয়ে উঠল বধূ। লাথি

হাঁকাল বরের গায়ে। কিছু বোঝার আগেই ছিটকে পড়ল বাকশট।
থপ থপ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ক্রেমেন্টাইন। ভেতর থেকে
দরজা আটকে দিল। বাকি রাতটা দোরগোড়ায় বসেই কাটাল
বাকশট।

পরদিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল শর্টি।
‘হানিমুন শেষ?’

‘আরে না!’ মুখ বেঁকাল বাকশট। ‘ওটা তো শুরুই হয়নি।’

এদিকে পুকুর শুকিয়ে গেছে। এক মাইল দূরের ঝরনা থেকে পানি
আনতে হবে। ক্রেমেন্টাইন বলে দিল, অতদূর থেকে সে পানি
বয়ে আনতে পারবে না।

বাকশটকে তাই ঝরনা থেকে পানি আনতে হয়।

ক্রেমেন্টাইন কাপড়চোপড় ধুতে পারবে না, বাকশটকে তা-ই
করতে হচ্ছে।

ক্রেমেন্টাইন থালা-বাটি ধুতে পারবে না। বাকশটকেই ওগুলো
ধুয়ে মুছে রাখতে হয়।

ক্রেমেন্টাইন লাকড়ি ফাড়তে পরে না। বাকশটকে হাত
লাগাতে হয়।

ক্রেমেন্টাইন ঘর পরিষ্কার করে না। বাকশটকে করে দিতে
হয়।

ক্রেমেন্টাইন খাটে ঘুমায় আর বাকশটকে ঘুমাতে হয় মেঝেয়।
ও কাজ করে টাকা রোজগার করে আর ওগুলো এনে দিতে হয়
ক্রেমেন্টাইনের হাতে। প্রথম দিন টাকা হাতে পেয়ে চোখ পাকিয়ে
জিঞ্জের করল, ‘কই? আর টাকা কই?’

‘ওটাই।’ নিজের পকেট উন্টিয়ে দেখাল বাকশট।

‘আমি ভেবেছিলাম, তোমরা ক্যাটলম্যানরা অনেক টাকার
মালিক।’

‘আমরা ক্যাটলম্যান নই, কাউবয়। আমি রানিং আয়রনের মালিক নই। এখানে চাকরি করি মাত্র।’

দুই বেলায়ই কেবল ওটমিল রাঁধে ক্রেমেন্টাইন। আর কিছু রাঁধে না। বাকশট আপত্তি জানায়। ‘ওটা ঘোড়াদের খাদ্য। মানুষ ওট খায় না।’

‘আরে খাও তো।’ আরেক চামচ ওট এনে বাকশটের নাকের কাছে দোলাতে শুরু করল ক্রেমেন্টাইন।

‘আরে না।’ চমকে উঠে প্লেট সরিয়ে নিল বাকশট। ‘বললাম না আমি খাই না।’

এরপর থেকে সে লিম্পির রান্নাঘরে খেতে লাগল।

‘ও কি বিস্কুট বানাতে পারে না?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল শর্টি।

বাকশট মাথা নাড়ল।

‘কেক?’ বেডরোলের প্রশ্ন।

‘জানি না।’

‘গরুর মাংস? মুরগির মাংস কিংবা মাংসের চাটনি?’ লিম্পি জানতে চাইল।

‘না। শুধু ঘ্যানঘ্যান করা ছাড়া আর কিস্যু পারে না সে। আর...আর খেতে পারে। আর ওটমিল রাঁধতে পারে। শুধু ওটমিল!’ খেপে উঠল বাকশট। ‘আর কোনও কোনও সময় খালি ঘ্যানঘ্যান আর ঘ্যানঘ্যান।’

‘এহেম!’ কেশে গলা পরিষ্কার নিল বেডরোল। তারপর সাবধানে জিজ্ঞেস করল, ‘বাকশট, ইয়ে, মানে ইয়ে, মানে তুমি...তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাইছি।’

‘বুঝতে পারছি না। কী বলছ তুমি?’

‘মানে...ইয়ে আর কী!’ ঝুঁকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল বেডরোল। ‘তোমরা বিছানায়...একসঙ্গে...’

লাল হয়ে উঠল বাকশটের মুখ। লজ্জায় না রাগে, কে জানে?
'ওটা...কখনও হয়নি আমাদের মধ্যে।'

'কী!' আঁতকে উঠল শর্টি।

'মানুষ বিয়ে করে কেন? রান্নাবান্না আর এ-জন্যেই তো?
নাকি?' অবাক বেডরোল নিজেও।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বাকশট। কিন্তু এসময় ডাকল
ওকে ক্রেমেন্টাইন। ওর বাজখাঁই গলার ডাকে বাকশটের জবাব
চাপা পড়ে গেল। আঁতকে উঠল ও। 'ডাকছে। আমি যাই। মনে
হয় খেপে গেছে কোনও কারণে। ...আসছি, শ্যামঘুঘু।'

'তাড়াতাড়ি এসো। শিগগির। ডাকছি কানে যায় না?'

সে রাতেই 'হোম সুইট হোম' সাইনবোর্ডটা উধাও হয়ে গেল।

পাঁচ

দিন কয়েক পরে গ্রেফতার হয়ে গেল বাকশটের বউ ক্রেমেন্টাইন
বেলোজ। গ্রেফতার হওয়ার আগে মার্শাল আর তার দুই
ডেপুটিকে আঁচড়ে কামড়ে আর গালাগালির চোটে কিছুক্ষণের
জন্যে তাদের বাপের নাম ভুলে যেতে বাধ্য করল মহিলা। অবশ্য
তরতাজা দুই জওয়ান ডেপুটির সঙ্গে পেরে উঠল না। মাটিতে
ফেড়ে ফেলে তার হাতে কড়া পরিয়ে দিল তারা। তারপর তাদের
ঘোড়ায় টানা জেলের ভেতর নিয়ে ঢোকাল।

বার্নের ভেতর বাকশট আর শর্টি স্টল পরিষ্কার করছিল।

হুড়োহুড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এল ওরা।

যতই হোক নিজের বিয়ে করা বউ। হাতে কড়া লাগানো অবস্থায় তাকে বন্দি দেখতে পেয়ে বাকশট জিজ্ঞেস করল, ‘ওকে কেন খেঁফতার করেছ, মার্শাল? কী করেছে ও?’

ধস্তাধস্তির সময় কাপড়চোপড়ে লাগা ধুলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বিশালদেহী মার্শাল পাল্টা প্রশ্ন করল, ‘ক্লেমেন্টাইন কি কখনও তার চারজন ধনী স্বামীর গল্প করেছিল তোমার কাছে?’

‘কী? না তো।’ মুখ ঝুলে পড়ল বাকশটের। ‘কিন্তু...তাতে কী? আগে বিয়ে করা কি অপরাধ নাকি?’

‘না। মোটেই না,’ জবাব দিল মার্শাল। পকেট থেকে একটা পোস্টার বের করে ধরিয়ে দিল বাকশটের হাতে। ‘কিন্তু তাদের সবাই যদি বিষমেশানো ওটমিল খেয়ে মারা যায়, সেটা কী?’

পোস্টারে লেখা: ওয়াণ্টেড ফর মার্ডার।

একপাশে ক্লেমেন্টাইনের ছবি। ওর হাতে একটা ওটমিলের পাত্র।

‘বেশ। কিন্তু সে তা হলে আমাকে কেন বিয়ে করল? আমার তো অত টাকা নেই যে, মেরে ফেলে টাকাগুলো হাতড়ে নেবে?’

‘ও আসলে তোমাকে রানিং আয়রন র‍্যাঞ্জেস মালিক ভেবে বসেছিল,’ ব্যাখ্যা করল মার্শাল। ‘ও লোনসামে আসার পর ওকে দেখে আমার কাছে পরিচিত ঠেকেছিল। ওর অনেক বছরের জেল হয়েছে। কিন্তু সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।’

হাসবে নাকি কাঁদবে, বুঝতে পারছে না বাকশট। ‘কিন্তু ও তো আমার বিয়ে করা বউ, তাই না?’

‘মোটেই না।’ এবার হো হো করে হেসে উঠল মার্শাল। ‘তোমাদের বিয়েই হয়নি। তুমি আসলে এই বিয়ের একজন সাক্ষী মাত্র।’ অনেক কষ্টে হাসি চাপল মার্শাল। ‘শিটি তো পড়তে পারে না। কোনোমতে নামটা সই করতে পারে মাত্র। সাক্ষী হিসেবে

সই করতে গিয়ে বেচারা বরের ঘরে সই করে ফেলেছে। আর তুমি বর স্বাক্ষর করেছ সাক্ষীর ঘরে।’

‘তা হলে এখন কী দাঁড়াল, মার্শাল?’ বাজপড়া তালগাছের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বাকশট।

শটির দিকে চাইল মার্শাল। ‘হ্যাঁ, শটি। ক্রেমেন্টাইন বাকশটের নয়, তোমার বউ। তুমি ওকে বিয়ে করেছ বরের ঘরে সই করে।’

শটি ছাড়া এক যোগে হাসিতে ভেঙে পড়ল বাকিরা।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল ক্রেমেন্টাইনের।

পরিত্যক্ত ঘরটা আবার র্যাটল সাপের জন্যে ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যাচেলর জীবনে ফিরে এল বাকশট। শুতে লাগল বন্ধুদের সঙ্গে বান্ধহাউসে। বুড়ো শটগানের পিঠে চড়ে ল্যাসো ছুঁড়ে গরু ধরা আর সেগুলোকে ব্র্যাণ্ডিং-এর কাজ শুরু করল শটি আর বেডরোলের সঙ্গে। লিম্পির রান্নাঘরে নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগল।

তবে দুটো জিনিসকে এরপর থেকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলত সে। এক হলো প্লেটভর্তি ওটমিল, অন্যটা...মেইল-অর্ডার-ক্যাটালগ।

শান্তি

লোকটা যুবক। কিন্তু যৌবনের যে সজীবতা ও উচ্ছ্বাস, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই শরীরে। ভাঙা গাল আর বিশীর্ণ হাত-পা। মাত্রাছাড়া মদ খাওয়ার কুফল। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে দড়াম করে পড়ে যাওয়ার মত করে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। কর্কশ, ফ্যাসফেসে গলায়-প্রায় ফিসফিস করে বলল, ‘আমি ওকে খুন করেছি...আমি আমার বউকে খুন করেছি...’

‘না, তুমি ওকে খুন করোনি,’ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল তামাটে মুখের ডাক্তার। ‘কিন্তু তুমি যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাও, তু হলে সূর্যাস্তের আগেই ওরা তোমাকে ধরে এনে মণ্টানার টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোর যে-কোনও একটা থেকে ঝুলিয়ে দেবে।’

‘কেবল মাতালরাই ঘটাতে পারে এমন কাণ্ড,’ ফুঁপিয়ে উঠল যুবক। হতাশায় কাঁধ ঝুলে পড়েছে ওর। বোঝা যাচ্ছে, ওর মনের যে অবস্থা, তা সহ্য করা ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

‘মাতাল মানে? অন্য মাতাল আর পাচ্ছ কোথায় তুমি? কাউন্টির সবগুলো সেলুনে তো মাতাল হিসেবে লোকে তোমাকেই চেনে।’

‘অ্যাটাই এর জন্যে দায়ী। ও আমাকে সেধে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, আমি অনেকদিন পান করি না। প্রতিদিন কিছু কিছু পান করা আমার জন্যে ভালো।’ এরপর সে ওটা দেয়। এরপর আরেকটা।’

‘ও-ই দিল তোমাকে?’

‘হ্যাঁ, দিলই তো। এরপর আমি মাতাল হয়ে গেলাম। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি বাড়ি গেলাম। দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় লাথি মেরে ভেঙে ঘরে ঢুকলাম। এরপর ওর মাথায় আঘাত করলাম...’

থামল ডাক্তার। যুবক খুব মারাত্মকভাবে মেরেছে মেয়েটাকে। তাই খুব সাবধানে দেখতে হচ্ছে। একটু ভুলচুক হলে আরও ক্ষতি হতে পারে মেয়েটার। ছেলেটার দিকে চাইল ও। তারপর বলল, ‘এখান থেকে পালিয়ে যাবার কথা না ভেবে এখনই নিজের ঘোড়ায় চড়ে মণ্টানায় চলে যাও। ওখানে গিয়ে দেখা করো আইনজীবী স্যাগার্সের সঙ্গে। লোকটা মাতালদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সাহায্য করতে পারে তোমাকে। বছর পাঁচেক আগে সে-ও এখানে, এই স্যাগা সিটিতেই ছিল। খুব মদ খেত সে-ও। তবে মদ খেয়ে খেয়ে তুমি যেমন নিজের শরীরটাকে শেষ করে দিয়েছ, ও সেরকম করেনি। তখনও অ্যাট ওর পেছনে লেগেছিল। তবে স্যাগার্সের পরিবার-পরিজনের সৌভাগ্য যে, অ্যাট ওকে কজা করতে পারেনি। যা হোক, এটা হলো আইন-আদালতের ব্যাপার। তুমি এম্ফুনি, লোকজন লিঞ্চ পার্টি নিয়ে ছুটে আসার আগে, ওর কাছে চলে যাও। এর মধ্যে তোমার বউকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে যা-যা করার আমি করব।’

মণ্টানার সে পুরানো দিন এখন নেই। আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে উঠছে। আর আধুনিক মণ্টানার একটা আধুনিক অফিসের মতই সাজানো-গোছানো হেনরি স্যাগার্সের চেম্বার। সুদর্শন লোকটা ভুরু কুঁচকে তাকাল ছেলেটার দিকে। ‘অ্যাট তোমাকে মদ দেয়ার সময় কেউ কি দেখেছে?’

‘না। মনে হয় না কেউ দেখেছে।’

‘আমিও তেমনটাই ভেবেছি,’ মাথা দুলিয়ে সায় দিল

আইনজীবী। ‘এটাই ওর কৌশল। যারা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চায় কিংবা মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে চায়, তাদের সে এভাবেই কজা করে।’

‘আমিও নিজেকে শক্ত করতে চেয়েছি!’ স্কোভ ঝরল ছেলেটার গলা থেকে। ‘বারবার চেষ্টা করেছি...’

এখানে অবশ্য একটা দীর্ঘ লেকচার দেয়া যায়। অথবা অতিরিক্ত মদপানের কুফল সম্পর্কে শ’দেড়েক শব্দের একটা সংক্ষিপ্ত বাণী। কিন্তু এর কোনোটাই করল না স্যাগার্স। এই ছেলেটার জায়গায়, যার নাম কি না জিমি ব্র্যাগস, সে নিজে হলেও ওসব লেকচার কানে তুলত না। আসলে বক্তৃতায় কখনও ভাল কিছু হয় না। তার বদলে নিজের কোমরে হাত দিয়ে চমৎকার একটা অস্ত্র বের করল সে। ওটা হাতে নিয়ে ডেস্কের এক প্রান্তে বসল।

‘এটা দেখো,’ হাতের অস্ত্রটা দেখাল সে। ‘আমার কাছে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য অস্ত্র। কেন জান? এটাই আমাকে শেষ পর্যন্ত মদ খাওয়ার মারাত্মক নেশা থেকে বাঁচিয়েছিল। পশ্চিমে আসার আগে আমি খুব বেশি মদ খেতাম। এত বেশি যে, আমার বন্ধুরা আমার নাম দিয়েছিল হিউম্যান স্পঞ্জ। খুব বেশি মদ খেতে পারতাম বলে নয়, সারাক্ষণ মদে ডুবে থাকতে চাইতাম বলেই ওরা ওই নামে ডাকতে শুরু করেছিল। ওরা কখনও কখনও গুঁড়িখানায় এসে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে যেত। ঠাট্টা করছি না, বাছা, আমার অবস্থা আসলে অতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।’

‘শেষ পর্যন্ত আমি একটা মানুষকে প্রায় খুনই করে ফেলেছিলাম। ফলে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। আমার আত্মীয়-স্বজন পশ্চিমে পাঠিয়ে দিল আমাকে। পালিয়ে এসে মাথা একটু ঠাণ্ডা হতেই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম।’

বুঝতে পারলাম, পশ্চিমের এই বৈরী পরিবেশে আমাকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হওয়ার মূল কারণ হলো এই মদই। একমাত্র মদের কারণেই আমাকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে এই নির্বাসিত পরিবেশে চলে আসতে হয়েছে। ইতোমধ্যে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। বুড়ো লোকটা আমাকে শোনাল পশ্চিমের পুরনো দিনের কথা। বৈরী পশ্চিমে একজন মানুষকে টিকে থাকতে হলে ভরসা করতে হত অস্ত্রের ওপর। আর যে অস্ত্রে যত বেশি তুখোড় হত, তারই এখানে টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকত।

‘ওর গল্প আমার মনে এক ধরনের উচ্চাশা জাগাল। আমি একটা অস্ত্র কিনলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বন্দুক হাতে আমাকে পশ্চিমের সেরাদের একজন হতেই হবে।

‘উচ্চাশাটা আমার মনে শেষ পর্যন্ত নেশা হয়ে দাঁড়াল। আমি মূল রাস্তার ওপারে ফুটহিলসে ঢুকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে শুরু করলাম। কাজটা অনেকটা লোকচক্ষুর আড়ালেই করতে হত। কারণ গোলাগুলির জন্যে সেজব্রশ কাণ্ডিটা তখন আর খুব বেশি অনুকূল ছিল না। মানুষ গোলাগুলির চেয়ে শান্তিময় দৈনন্দিন জীবন পছন্দ করতে শুরু করেছিল।

‘সে যা-ই হোক, আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থেকে নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম। সেরা হওয়ার নেশাটা মনের ভেতর এমনভাবে গেড়ে বসল যে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই একঘেয়ে কাজ খুব আগ্রহ নিয়ে চালিয়ে যেতে লাগলাম। একসময় দেখা গেল, মদের নেশার কথা আর মনেই থাকে না। কোনও সময় আচমকা জেগে উঠলেও তা মিলিয়ে যেতেও খুব বেশিক্ষণ লাগত না। এভাবে একদিন দেখা গেল, মদের কথা মনে হলেও তার প্রতি কোনও আকর্ষণ পাচ্ছি না। তার মানে হলো, মদপানের নেশা ছেড়ে দেয়ার ওপর ফ্রান্সিস উইলার্ডের বক্তৃতা না শুনেও

আমি নেশামুক্ত হয়ে গেলাম। এভাবেই, জিমি, প্রত্যেকের উচিত, নিজেকে নিজেই সুস্থ করে তোলা। বাইরে থেকে হাজার চেষ্টা করেও যা হয় না, নিজের ভেতর থেকে একবার জাগিয়ে তুলতে পারলে তা কখন হয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না।’

অস্ত্রটার ওপর সযত্নে হাত বুলাল স্যাগার্স।

‘আমি জানি, অস্ত্রে তুমি মন্টানায় সবার সেরা,’ স্বীকার করল ছেলেটি।

‘পরিস্থিতি যখন আমার নিয়ন্ত্রণে চলে এল,’ বলে চলল স্যাগার্স। ‘আমি আইন ব্যবসা শুরু করলাম। আমার পসার বাড়ল। মোটামুটি একটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলাম। কিন্তু অ্যাট আমার পেছনে লেগে আছে এখনও। সে শপথ করেছে, আমাকে সে কজা করবেই। মদ একসময় আমাকে তোমার মতই পাগল করে ছেড়েছিল। সুতরাং তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি। তাই এটা আমি হাতে নিলাম। পরোক্ষভাবে এটা আমারই মামলা।’

স্যাগা সিটি। বেলা ১১টা বেজে ২০। দড়াম করে খুলে গেল শেরিফের অফিসের দরজা। একটা যুবক এসে ঢুকল তারস্বরে চোঁচাতে চোঁচাতে, ‘অ্যাটের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। গুলি খেয়েছে ও। স্যাগার্সের কাজ।’

যুবকটির মাথায় টুপি নেই। উত্তেজনায় মুখের রক্ত সরে গেছে। হাঁফাচ্ছে সে।

বাইরে তীব্র রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। তার মধ্যে একটা ভোঁতা গর্জন ভেসে এল। অনেক লোকের একসঙ্গে চিৎকারের শব্দ। একই সঙ্গে গুলিরও।

এই প্রথম কিছুটা চঞ্চলতা দেখা গেল শেরিফের মধ্যে। উৎসুক চোখে চাইল খোলা দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে। তারপর ডেস্কের ড্রয়ার খুলে কদাকার দুটো রিভলবার বের করল। আগের

দিনে এরকম অস্ত্র ব্যবহার করা হত। এখন এগুলোর চল নেই বললেই চলে। শেরিফের অস্ত্র দুটো দেখে মনে হচ্ছে, অনেক কাল আগে হয়তো ওগুলোর ভয়ালদর্শন মাযলদুটো কারও বুক বরাবর তাক করা হয়েছিল।

সাইড রোড থেকে মেইন রোডে আসার পথটায় অসংখ্য মানুষের চলাচল। রীতিমত ভিড় বলা যায়। এখন যদিও আইন-কানুন মানার দিকে মানুষের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তবু কিছু মানুষ আছে ওসব কিছুর তোয়াক্কা রাখে না। রাস্তায় নেমেও তাদের মুখের লাগাম নেই। খিস্তি-খেউড় ভেসে আসছে সারাক্ষণ।

রাস্তার মাঝখানে আচমকা একজন চিৎকার করে উঠল। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন গলা মেলাল। বুকের ভেতর ধক ক'রে উঠল শেরিফের। স্যাগার্স কি অ্যাটকে খুন করে ফেলেছে?

রাস্তার শেষ মাথায় একটা খোলা চত্বর। চত্বরের বাম দিকে সেলুন। সেলুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শেরিফ। ভেতর ভাঙাচোরা বাসন-কোসন আর পানির জগ-গ্লাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। খোলা নিচু দরজা দিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া। দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে থেমে গেল শেরিফ। ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে আসছে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। ভেতর আরও বারদুয়েক গুলির শব্দ হলো। একটা দীর্ঘ আতঁচিৎকার কেউ একজন যেন মাফ চাইছে, করুণা ভিক্ষা করছে। আরেকটা গুলির শব্দ। কাচের গ্লাস ভাঙার ঝন ঝন শব্দ। চিৎকারটা এবা অবোধ্য কান্নায় পরিণত হলো।

ভেতর থেকে থেকে বেরিয়ে আসা লোকটা নাপিত। শেরিফকে দেখে আঁউ আঁউ করে বলল, 'স্যাগার্স একটা মামলার ব্যাপারে অ্যাটর্নের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমার এক লোক ওখানে ড্রিঙ্ক করতে গিয়ে সব কিছু নিজের চোখে ঘটতে দেখেছে। অ্যাট পানীয়ের সঙ্গে কিছু একটা মেশাচ্ছিল। স্যাগার্স ওয়াগন

থেকে নেমে এসে বসতে তাকে পরিবেশন করেছিল ওই ড্রিঙ্ক। স্যাগার্স ওটা খেয়েছে। যতই চুমুক দিচ্ছিল, ততই ওর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দিচ্ছিল। একটু পরেই লোকটা যেন পাগল হয়ে যায়। আচমকা অ্যাটকে গুলি করে বসে।’

স্যাগা সিটি এখন চরম উত্তাল। দোকানপাট সব বন্ধ। দোকান মালিকরা সবাই ডিপোর ওখানে গিয়ে জমা হয়েছে। উত্তেজিত জনতা গলা ফাটিয়ে হৈ চৈ আর চিৎকার-চৈচামেচি করছে। সব কিছু ছাপিয়ে সেলুনের ভেতর থেকে আবার কয়েকবার গুলির শব্দ শোনা গেল। একটা গুলি এসে লাগল সেলুনে ঢোকান পথে খিলানের সঙ্গে ঝোলানো ল্যাম্পের ওপর। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বাতিটা। সিলভার আর অ্যাসফল্টের অগণিত টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে। আরেকটা গুলি এসে জানালার কাচ উড়িয়ে দিল।

একটা চিৎকারের মত শোনা গেল। আর সেটাই যেন সচকিত করে তুলল শেরিফকে। এখানে এখন কী ঘটছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে তার। মদের দোকানদার অ্যাট লোকটা জঘন্য। খদ্দের ধরে রাখার জন্যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কেউ যদি মদ ছেড়ে দিতে চায়, ওর দোকানে যাওয়া-আসা কমিয়ে দেয়, ওর পেছনে লেগে যায় সে। যেভাবে হোক, খদ্দেরকে নিজের কজায় রাখতে চেষ্টা চালায়। স্যাগার্স নিজেও তার ভুক্তভোগী। লোকটার সর্বশেষ শিকার জিমি ব্র্যাগস নামের ছেলেটা। কারও কাছ থেকে বাধা না পেয়ে দিনে দিনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে অ্যাট। আর আইন দিয়ে লোকটাকে কজা করার মত সুযোগও নেই। মদ বেচার ওপর তো কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তো এখন স্যাগার্স যদি অ্যাটের ওপর প্রতিশোধ নিতে যায়, নৈতিকভাবে সেটাকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু আইনত

স্যাগুর্সকেও তা করতে দেয়া যায় না। মনে মনে স্যাগুর্সকে বাহবা দিলেও আইনের লোক হিসেবে শেরিফকে তাকে বাধা দেয়ার কাজটাও করতে হবে। এটা তার কর্তব্য। এজন্য তাকে সরকার থেকে বেতন দেয়া হয়।

এগিয়ে গেল ও ভিড় জমানো লোকগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে। দোরগোড়ায় পৌঁছতে ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে এক যুবক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। ওর একটা হাত কাঁধ থেকে ঝুলছে ল্যাগব্যাগ করে। আরেকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে শেরিফের পথ আটকাল সে। ‘না, তুমি ভেতরে ঢুকতে পারবে না!’ ফ্যাসফেসে গলায় বলল।

‘আমি একজন ল-অফিসার,’ গম্ভীর গলায় বলল শেরিফ। ‘আমাকে রাখা হয়েছে খুন-জখম, মারামারি থামানোর জন্যে। আমি তাই করব।’

বাধাদানকারীর দিকে একবার তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে শেরিফ। ছেলেটা জিমি ব্র্যাগস। হিস্টরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এখন।

‘সেটা মন্টানার আইন!’ খেঁকিয়ে উঠল জিমি। ‘সে আইন এখানে যে অনাচার চলছে, তার কিছুই করতে পারবে না। অ্যাট ওকে ‘মিশ্রিত’ পানীয় দিয়েছে, যেটা সে আমাকেও দিয়েছিল। এখন সে তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে। ওটা ওকে ভোগ করতে দাও।’

থামল শেরিফ। চিন্তা করছে। এক হিসেবে ভুল বলছে না ছেলেটা। অ্যাটকে এপর্যন্ত কিছুই করা যায়নি। সে বেআইনি কিছু করছে না। লোকদের স্রেফ ড্রিঙ্ক পরিবেশন করছে। ওর এখানে ড্রিঙ্ক করে এমন অনেক লোক আছে, ওর বিরুদ্ধে যাদের কোনও অভিযোগ নেই। ‘হুঁ,’ অন্যমনস্কভাবে মাথা দোলাল সে। ‘কিন্তু আমাকে আমার কাজ করতে হবে।’ বলে ফের পা বাড়াল ও

ভেতরে ঢোকার জন্যে ।

‘না,’ রুখে উঠল জিমি । আচমকা ওর হাতে অস্ত্র দেখা গেল ।
‘ভেতরে ঢুকতে পারবে না তুমি ।’

‘স্যাগার্স ছাড়া ওখানে আর কেউ আছে?’ জানতে চাইল ও ।
‘না ।’

আর কিছু বলল না শেরিফ । পিছিয়ে এল ।

উপস্থিত জনগণ এক আশ্চর্য কাণ্ড দেখল । পশ্চিমের সবচেয়ে সাহসী শেরিফ কিং কোল ওর তুলনায় নেহাত বাচ্চা এক ছেলের ভয়ে পিছিয়ে এসে স্যাগা সিটি পুলিশ অফিসের দিকে রওনা দিয়েছে ।

কিন্তু শেরিফ জানে, ছেলেটার হাতে অস্ত্র দেখে পিছিয়ে আসেনি সে ।

পুলিশ অফিসারকে নিয়ে এবার সেলুনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শেরিফ । ভেতর থেকে রক্তাক্ত পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে এল বারকিপার অ্যাট ডিগনার । শেরিফকে দেখেই ওর পায়ের ওপর এসে পড়ল প্রায় । ককিয়ে উঠল, ‘আমাকে বাঁচাও । আমি মারা যাচ্ছি ।’

‘তুমি মরবে না!’ ঘোঁৎ করে উঠল শেরিফ । ‘তুমি যমেরও অখাদ্য ।’

এসময় দোরপথে দেখা গেল স্যাগার্সকে । ছিটকে বেরিয়ে এল আইনজীবী । হাতে বিকট দর্শন একটা অস্ত্র ।

দেখামাত্র গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে । কেউ কেউ প্রবল আতঙ্কে হুড়াহুড়ি করে পালাতে গিয়ে অন্যের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল ।

‘অস্ত্র রিলোড করতে করতে গর্জে উঠল স্যাগার্স, ‘মন্টানায় সবচেয়ে চালু হাত আমার । শালা নোংরা সাপ! কোথায় গেছে শুয়োরটা? কোথায়? শালা জিমির মত একটা বাচ্চা ছেলেকে পর্যন্ত

ড্রিঙ্কের নামে ওই বিষ খাইয়ে দিয়েছে। শালা এখন আমাকেও...।
কোথায় নোংরা শেয়ালটা? ওকে আজ শেষ করে ফেলব!’

একতাল মাংসের মত জবুথুবু হয়ে পড়ে আছে অ্যাট ডিগনার,
শেরিফের পায়ের কাছে। এরার আতঙ্কে ককিয়ে উঠল।

‘আচ্ছা, তুমি তা হলে ওখানে? শালা, তোমাকে আমি খুন
করে ফেলব।’ অস্ত্র উঁচাল আইনজীবী।

হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল জিমির, ‘না, স্যাগার্স! তুমি ওকাজ
করতে যেয়ো না। ওটা হবে খুন, পরিষ্কার খুন।’

পরক্ষণেই লাফ দিল ও, শেরিফের পায়ের কাছে আহত
ইঁদুরের মত নির্জীব হয়ে পড়ে থাকা অ্যাটের গায়ের ওপর গিয়ে
পড়ল।

শেষ মুহূর্তে ট্রিগারের ওপর থেকে আঙুল সরিয়ে নিতে পারল
স্যাগার্স। ধীরে ধীরে অস্ত্রটা নামিয়ে নিল।

সেদিন সন্ধ্যায় ফুটহিলস সদ্যওঠা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত প্রচণ্ড
মারে আহত বউয়ের পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলাচ্ছে জিমি
ব্র্যাগস। পুরো ঘটনাটা শুনিয়েছে বউকে। শেষে কিছুটা গর্বের
সুরে বলল, ‘জানো, মি. স্যাগার্স ওর অস্ত্রটা আমাকে দিয়ে
দিয়েছে। বলেছে, আমি ওকে একটা খুন করা থেকে বিরত
রাখতে পেরেছি। অ্যাট আমাদের সবার শত্রু। কিন্তু আসলে আমি
চাইনি স্যাগার্স একটা পরাজিত অসহায় শত্রুকে খুন করে বদনাম
কিনুক আর আইনের চোখেও অপরাধী সাব্যস্ত হোক।’

ওরা দু’জন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে
উবু হয়ে বসল জিমি। ‘ও আমাকে পিস্তলটা দেয়ার সময় বলেছে,
ও যেরকম এটা দিয়ে ড্র করা প্র্যাকটিস করতে করতে মদের
নেশা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছে, নিজেকে সারিয়ে তোলার জন্যে
আমিও যেন ঠিক তাই করি।’

‘আচ্ছা,’ শীর্ণ একটা হাত তুলে স্বামীর মাথার চুল নেড়ে দিল মেয়েটি। ‘তুমি বাধা না দিলে মি. স্যাগার্স কি সত্যি সত্যি খুন করত অ্যাটর্কে?’

একটু ভাবল জিমি। তারপর মাথা নাড়ল। ‘তখন মনে হয়েছিল, তাই করবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। খুন করতে চাইলে লোকটাকে প্রথমেই খুন করে ফেলতে পারত মি. স্যাগার্স। কিন্তু ও আসলে ওকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। স্যাগা সিটির আইনে অ্যাটর্কে কজা করার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু মি. স্যাগার্স লোকটাকে পায়ে গুলি করে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছে। ও আর বদমায়েশি করার সাহস পাবে না।’ নিচু হয়ে স্ত্রীর কপালে চুমু খেল জিমি। তারপর ফিসফিস করে বলল, ‘এটা আসলে খুব ভাল একটা কাজ হয়েছে। আমাদের সবার জন্যে।’ একটু হাসল। ‘তোমার পেটে আমাদের যে নতুন অতিথি আসছে, বিশেষ করে তার জন্যে। কারণ তার বেঁচে থাকার জন্যে একটা সুন্দর পরিবেশ চাই যে!’

ঝামেলা

এক

দুপুরের কড়া রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে ছোট্ট শহর ওয়েস্ট উড। খান দুয়েক সেলুন, চার-পাঁচটা মুদি দোকান, একজন নাপিত আর কামার। ছোট্ট একটা শেরিফ অফিস, তার লাগোয়া ফাটক আর টিমে তেতালা চালে চলা একটা ডাক্তারখানা। বাকি সব ঘর-বাড়ি। সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন একটা স্টেজকোচ আসা-যাওয়া করে দূরের ডজ সিটি থেকে।

শহরটা বছর কয়েক আগে গড়ে উঠেছে। অধিবাসীরা সৎ ও কর্মঠ। জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ব্যবসা-বাণিজ্য আর ছোটখাট র‍্যাঞ্চিং। শহরে একটা গির্জা আছে, আছে একটা স্কুলও। একজন শেরিফও আছে। তবে শান্তিশিষ্ট ওয়েস্ট উড শহরে শেরিফের করার মত তেমন কোনও কাজ থাকে না। অধিবাসীরা আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত। বুট ঝামেলায় পারতে জড়ায় না। গির্জার পাদ্রী মি. রেভারেণ্ড উইলিয়াম ক্র্যাবার্টি রোববার দিন সমবেত প্রার্থনার আগে সে-উপদেশই দিয়ে থাকেন। স্কুলে পড়ায় মিস ওয়েবসন নামের এক সুন্দরী মেয়ে। তেজী। শহরের উঠতি যুবকদের আকর্ষণ আর মনোযোগের পাত্রী। তবে মিস ওয়েবসন তাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে কি না, সে-খবর এখনও পাওয়া হয়নি কারও। শহরে মাঝে মধ্যে নাচ-টাচের আসর বসলে আগ্রহী প্রায় সবার সঙ্গেই হাসিমুখে

দু'এক পাক নেচে নেয় মিস ওয়েবসন ।

কমফোর্ট সেলুনের বারকিপার ন্যাট চ্যাপলিনের দোকানে সকাল থেকে বেচা-কেনায় কিছুটা ঝিমুনি ভাব ছিল । তবে দুপুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ জমজমাট হতে শুরু করেছে ।

দিনটা শনিবার । পরদিন সাপ্তাহিক ছুটি । বিকেল থেকেই কাউবয়রা শহরে আসতে শুরু করবে । ন্যাট জানে, শুধু মদই নয়, জুয়ার দিকেও আগ্রহ থাকে কাউবয়দের । তাই ছোটখাট কিছু ব্যবস্থা আছে কমফোর্টে । অন্য সেলুনটাতেও আছে অবশ্য । তবে তা কোনোভাবেই বড় দানের জুয়া নয় । দু'এক পয়সায় মামলা খতম । শেরিফ হ্যাম সিংগার জানে, বড় দানের জুয়ায় যেমন টাকা বেশি, তেমনি ঝামেলাও কম নয় । সে শান্তিপ্রিয় মানুষ, ছোট শহরটায় ঝামেলা চায় না সে । তাই তার কড়া নির্দেশ, বড় দানের জুয়া খেলতে চাইলে ওয়েস্ট উড ছেড়ে বাইরে গিয়ে খেলতে হবে ।

সপ্তাহের প্রতিদিনই যে জুয়া খেলা যাবে, তাও কিম্বদন্তি নয় । মাত্র দু'দিন । শনিবার বিকেল থেকে রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত । বাকি দিনগুলোর জন্যে রয়েছে এক অলিখিত নিষেধাজ্ঞা ।

দুপুরের পরেই ওয়েস্ট উডে একজন ভবঘুরে এসে হাজির হলো । বিশাল শরীর লোকটার । চুল সোনালি । চৌকো মুখে কঠিন ভাব । চোখের কোণে লাল আভা । লম্বায় ছ'ফুটের কম হবে না ।

খুব বেশি অতিথি আসে না ওয়েস্ট উডে । মাঝে মধ্যে কেউ আসে-টাসে । ভাল লাগলে শহরের ভেতরে কিংবা র‍্যাঞ্জে কাজ নিয়ে থেকে যায় । নয়তো 'দু'একদিন বেড়িয়ে-টেড়িয়ে যেমন নিঃশব্দে আসে, তেমনি চুপচাপ চলে যায় ।

বেচা-কেনার ফাঁকে ফাঁকে মানুষজন দেখা ন্যাট চ্যাপলিনের প্রিয় অভ্যাস । মানুষ দেখতে তার কখনও ক্লান্তি আসে না । প্রতিদিন দেখা পরিচিত মানুষগুলোকেও দেখতে থাকে সে সমান

আগ্রহ নিয়ে। গতকাল দেখা হাসিখুশি মুখের জর্জকে তার পরদিন দেখে ওর মনের ভাব আঁচ করার চেষ্টা করে। সূক্ষ্মতম পরিবর্তনটাও চোখ এড়ায় না। আর নতুন মানুষ হলে তো কথাই নেই। ন্যাট চ্যাপলিনের কাছে বিশাল এক গবেষণার বিষয় হলো যে-কোনও নতুন মানুষ।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা শহরটায় যে আসুক, প্রথমে ন্যাট চ্যাপলিনের চোখে পড়বেই। কারণ শহরে ঢোকান মুখে প্রথম সেলুনটা তার। বিশাল এক ঘোড়ার পিঠে চড়া সেরকমই বিশাল লোকটাকে প্রায় আধা মাইল দূর থেকে খেয়াল করল ন্যাট চ্যাপলিন। পিঠ সোজা আর মুখ উঁচু করে বসে আছে আরোহী। পায়ে অনবরত স্পার দাবাচ্ছে বাহনের পেটে, পাঁজরায়। দেখতে না দেখতে শুকনো পাথুরে মাটিতে খটাখট শব্দ তুলে কমফোর্ট সেলুনের হিচরেইলের পাশে এসে দাঁড়াল রোনটা। বিশাল শরীর নিয়েও অবলীলায় দোল খেয়ে নামল লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে। হিচরেইলে ওটাকে বেঁধে সোজা হলো। উরুর সঙ্গে বাঁধা হোলস্টারটা আলাগা করে দেখে নিল ওটার অস্তিত্ব।

ক্যাশবাক্সের সামনে তটস্থ হয়ে বসল ন্যাট। লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না। দীর্ঘদিনের লোকচরিত্র পর্যবেক্ষণের ফলেই কি না কে জানে, একটা অস্বস্তি ভর করেছে তার মনে। বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী, উদ্ধত আর গোঁয়ার মনে হচ্ছে আগন্তুককে। আর যা-ই হোক, লোকটা যে নিরীহ-শান্তিপ্রিয় কেউ নয়, সেটা বলে দিচ্ছে ওর হাঁটাচলা, চোখের চাউনি, ভাবভঙ্গি আর কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা।

ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল আগন্তুক। নিজের চেহারাসুরত আর ভাবভঙ্গির সঙ্গে যায় না, এমন ভাবে হেসে উঠল। বারকিপারের দিকে চেয়ে নড় করল, ‘হাউডি!’ বারটেবিলের পাশে সাজিয়ে রাখা বিয়ার আর হুইস্কির ক্যানগুলোর দিকে চোখ

রেখে বলল, 'তোমার এসব নোংরা পানীয় ছাড়া যদি ভাল কিছু থাকে, বের করতে পার। আমি আবার যা-তা ড্রিন্ক করি না।'

'আমরা শ্যাম্পেন সার্ভ করি না,' তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল ন্যাট। লোকটার হাসি পছন্দ হলেও কথাগুলো ওর গায়ে হুলের মত লেগেছে। 'তুমি ক্যালিফোর্নিয়া কিংবা নিউ ইয়র্কে গিয়ে খুঁজে দেখতে পার।'

চোখের পলক ফেলার আগে পিস্তল হাতে উঠে এল লোকটার। পরমুহূর্তে চার-পাঁচটা গুলি গিয়ে বিঁধল ক্যানগুলোয়। ফুটো ক্যান থেকে মদ ছিটকে পড়তে শুরু করল চারদিকে।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ন্যাট চ্যাপলিন। মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'বেয়াদবিটা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।' পিস্তল খাপে ঢোকাল। চোখ তুলল সেলুনে বসা লোকগুলোর দিকে। 'তো ভাইয়েরা...পুরো ব্যাপারটা তোমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। কারও কিছু বলার আছে?' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। 'থাকলে উঠে দাঁড়াও। এখুনি ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভাল।'

যারা দুপুরের অলস সময়টা সেলুনে বসে মদ খেয়ে পার করছিল, তারা সবাই নিরীহ খেটে খাওয়া শহরবাসী। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে। আচমকা সেলুনে ঢুকে কেউ একজন বিনা নোটিশে গুলি চালাতে পারে, এটা তাদের চিন্তারও বাইরে। ওয়েস্ট উডে মাঝে মধ্যে হাতাহাতি হয়; হাতাহাতি কোনও কোনও সময়ে বড় জোর মারপিট পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু সেটা যে একদম গোলাগুলি तक যেতে পারে, এমনটা কখনও চোখে দেখেনি। সুতরাং ফয়সালার প্রস্তাবে যে তাদের মারপিট বা গোলাগুলির দিকে ডাকা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরে স্রেফ চুপ হয়ে গেল তারা।

এমন সময় আরেকজন ঢুকল দোর ঠেলে। সরাসরি

বারটেগারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ‘গুলির আওয়াজ শুনলাম যেন।’ সেলুনে চোখ বুলাল। আগন্তুককে দেখল। চোখ আটকে গেল কোমরে বাঁধা ওর পিস্তলের দিকে। ‘কী হচ্ছে এখানে? কে তুমি?’

‘তুমি কে?’ পাল্টা প্রশ্ন করল আগন্তুক। ‘আচ্ছা আচ্ছা। শেরিফ। তারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তোমার শহরের লোকগুলো এমন কেন? কথা বলতে পর্যন্ত জানে না?’

লোকটার কোমরে ঝোলানো অস্ত্র, ফুটো হয়ে যাওয়া বিয়ারের ক্যান আর ন্যাট চ্যাপলিনের ভয়াবহ মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল শেরিফ।

‘এ শহরের সব লোক শান্তিপ্রিয়, আইন মেনে চলে। অস্ত্র বহন করার দরকার মনে করে না। তোমার গানবেল্ট খুলে ফেল। যদিও এখানে থাকবে, ওটা শেরিফের অফিসে জমা থাকবে। চলে যাওয়ার সময় ফে...’

টিটকারি মারার ভঙ্গিতে হেসে উঠল অস্ত্রধারী। ‘না খুললে কী করবে, শেরিফ?’

‘আইন অমান্যের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হব।’

‘তা-ই?’ এক পা এগিয়ে এল শেরিফের দিকে। ‘বেশ, আমি আইন অমান্য করলাম। আইনের লোককে একটা ঘুসি মারলাম।’ বলতে না বলতে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। পর পর দুটো ঘুসি হাঁকাল শেরিফের মুখে। পরমুহূর্তে পাঁজরের দু’পাশে দুটো ঘুসি খেয়ে বেঁকে গেল শেরিফ। বাতাসের অভাবে খাবি খাওয়ার মত অবস্থা হলো ওর।

এমন আচমকা আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না ওয়েস্ট উডের মত শান্ত, নিস্তরঙ্গ শহরের শেরিফ হ্যাম সিংগার। বিস্ময়ের ধকল কাটিয়ে উঠে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার আগেই আরেক প্রস্থ

মারের বন্যা বয়ে গেল দশাসই শরীরের লোকটার তুলনায় ওর দুর্বল শরীরের ওপর দিয়ে। মার যখন থামল তখন শেরিফের মুখ রক্তাক্ত, ডান চোখ ফুলে উঠেছে, একটা দাঁত ভেঙে পড়ে গেছে সেলুনের মেঝের ওপর। প্রায় অচেতন শেরিফের কোমর থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে নিজের কাছে রাখল লোকটা। একটা চেয়ার দখল করে বসল।

সেলুনে উপস্থিত হতাশ ও বিপন্ন লোকগুলোর দিকে চেয়ে হাসল। ‘মিস্টার!’ হাঁক দিল বারকিপারের দিকে চেয়ে। ‘শ্যাম্পেন যখন নেই বলছ, তখন আর কী করা! ঠিক আছে...বিয়ার অথবা হুইস্কি, এর মধ্যে যেটা ভাল, সেটাই দাও। সবাইকে।’ লোকগুলোর দিকে ফিরল ফের। ‘তো, ভায়েরা? ঘটনা কী দাঁড়াল? এমন অপদার্থ শেরিফ দিয়ে যে একটা শহরের শান্তিরক্ষা হয় না, নিজের চোখেই তো দেখলে। কী বলো?’

চুপ করে রইল লোকগুলো। শেরিফের দুর্দশা দেখে মুখ দিয়ে কথা সরছে না কারও।

হাসল লোকটা। বিয়ারের গ্লাসটা মুখে নিয়ে চুমুক দিল। ‘আমি ব্ল্যাক হাণ্টার। বন্ধুরা ব্ল্যাক বলে ডাকে। এখানে কোনও বন্ধু নেই। তবে আশা করছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমার প্রথম নাম ধরে ডাকতে চাইবে। এখন,’ মেঝেয় পড়ে থাকা শেরিফের দিকে চাইল, ‘ওকে ডাক্তারের হাওলা করে দেয়া উচিত। দেখি, তোমাদের মধ্যে সবার আগে কে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসতে পার? ভাল কথা। এটাকে শেরিফের হুকুম বলে ধরে নিতে পার। এই মুহূর্তে ওয়েস্ট উডের শেরিফ পাল্টে গেছে। আগের শেরিফ শান্তিরক্ষার কাজে ব্যর্থ। তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে এ মুহূর্তে আমি ওই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলাম। কই, ডাক্তার ডাকতে কে যেতে চাও? কুইক।’

দুই

বিকেল চারটা। একটা বাকবোর্ড এসে থামল ন্যাট চ্যাপলিনের কমফোর্ট সেলুনের সামনে। ভেতর থেকে নেমে এল বছর পঞ্চাশেক বয়সের এক লোক। রোদে পোড়া তামাটে মুখ। দু'চোখের কোণে ভাঁজ চুলে ধূসর ছোপ। ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল বারকিপার। 'আসুন, মি. ক্রেমন্ট, স্যর। আজ একটু আগেভাগে চলে এলেন, মনে হচ্ছে।'

দরজা দিয়ে আরও চার-পাঁচজন ঢুকল। সবার পরনে কাউবয়ের পোশাক। ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মি. ক্রেমন্ট। 'আজ আসার ইচ্ছেও ছিল না, ন্যাট। কিন্তু এদের যন্ত্রণায় র‍্যাঞ্জে একা থাকার উপায় নেই। বসকে নিয়ে শহরে না-আসলে নাকি ওদের বেড়ানো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শহরের খবর বলো।'

'শহরে এখন নতুন শেরিফ,' তেতো স্বরে বলল ন্যাট। 'হ্যাম অসুস্থ। শীঘ্রি দায়িত্ব নিতে পারবে বলেও মনে হচ্ছে না।'

'কেন, কী হয়েছে হ্যামের? আর নতুন শেরিফটা আবার কে হলো? কে নিয়োগ দিল? আমরা জানলাম না কেন?'

'কেউ নিয়োগ দেয়নি। স্ব-নিয়োজিত লোকটা দুপুরে এসে দোকানে ভাঙচুর চালায়। গুলি করে ফুটো করে দেয় আবার।'

সবগুলো বিয়ারের ক্যান। হ্যাম এসে এর কারণ জানতে চাইলে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে ওকে। তারপর ঘোষণা দেয় সেই নাকি নতুন শেরিফ।’

ব্যাটউইং ডোরে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হতে ওদিকে চাইল মি. ক্রেমন্ট। প্রায় ছয় ফুট লম্বা লোকটার ওপর চোখ পড়ল। গলা নিচু করে বলল বারকিপার, ‘ওই তো। নতুন শেরিফ।’

চোখ পাকিয়ে লোকটার দিকে তাকাল ক্রেমন্ট। ‘তুমি নতুন শেরিফ?’

‘দায়িত্বটা কাঁধে এসে পড়ল, মি. ক্রেমন্ট। অযোগ্য শেরিফ যখন শান্তিরক্ষা করতে পারে না, তখন তাকে সরিয়ে দেয়াই তো উচিত।’ হাসল। ‘আজ দুপুরে শহরে এসে একটা লোক উৎপাত শুরু করল...’

‘সে লোকটা নিশ্চয় তুমি?’

‘তাতে কিছু আসে-যায় না। শেরিফ তাকে সামলাতে পারেনি। উল্টো মার খেয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে। দায়িত্বটা তাই নিতেই হলো।’

‘দায়িত্বটা তাই নিতেই হলো!’ মুখ ভেঙচাল ক্রেমন্ট। ‘মিস্টার, ওসব ফেরেববাজি ছাড়া। নতুন শেরিফ নিয়োগ করতে হলে শহরে নিয়োগ কমিটি আছে। তারা নতুন শেরিফ ঠিক করবে। বাইরের কোনও উটকো লোক এসে নিজের খুশিমত ভেস্টের ওপর তারা বুলালেই তাকে কেউ শেরিফ মেনে নেবে না।’

‘আমি শান্তিপ্রিয় লোক, মি. ক্রেমন্ট। তুমি অনেক আপত্তিকর কথা বলে ফেলেছ। কিন্তু আমি যতদূর জেনেছি, তুমি এখানকার সম্মানিত নাগরিক। তাই কিছু মনে করছি না। ঠিক আছে, তোমাদের কমিটির অনুমোদন নিয়েই নতুন শেরিফ তার দায়িত্ব পালন করবে।’

আনাড়ী লোক নয় মি. ক্রেমন্ট। পরিস্থিতি বুঝতে খুব বেশি সময় লাগল না তার। নতুন লোকটার জাত চিনতেও ভুল হলো না। বুঝতে পারছে, লোকটা দুর্ধর্ষ ও হিংস্র হলেও নিতান্ত গোয়ারগোবিন্দ নয়। এখানে এসে হঠাৎ উৎপাত শুরু করেনি সে। সম্ভবত কোনও একটা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ওয়েস্ট উডে তার আগমন। আর সে পরিকল্পনার মূল যতদূর মনে হয় এখানেই।

এ মুহূর্তে মাথা গরম করে কোনও ফায়দা হবে না, নিজেকে বোঝাল ক্রেমন্ট। তার চেয়ে বরং চুপচাপ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাই ভাল। ওয়েস্ট উড শহরটা প্রত্যন্ত এলাকায় হলেও মোটামুটি নিরুপদ্রব। গোলাগুলি, খুনোখুনির ঘটনা ঘটে না বললেই চলে। প্রায় গুরুত্বহীন এই শহরে উচ্চাভিলাষী মানুষের তেমন একটা আসা-যাওয়া হয় না বলে ওয়েস্ট উডের খেটে খাওয়া মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনে শান্তি ব্যাহত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে না।

কিন্তু শহর থেকে মাইল বিশেক দূরের ক্রস বিসি র‍্যাঞ্জেস মালিক বেরি ক্রেমন্টের মনে হলো, ওয়েস্ট উডের সুখের দিন শেষ হতে চলল বলে। ব্ল্যাক হাণ্টারের মত ভবঘুরে লোক এখানে এসে শুধু শুধু শহরের শেরিফকে পিটিয়ে আহত করছে না। এটা হলো খুব বড় একটা পরিকল্পনার সামান্য একটি অংশের বাস্তবায়ন মাত্র। যেভাবেই হোক, পরিকল্পনাটার শুরু এখানেই। কিন্তু কার পরিকল্পনা? সেটাই আগে বুঝতে হবে। ব্ল্যাক হাণ্টার এখানে নিঃসঙ্গ ভবঘুরে হিসেবে এলেও আদতেই সে একা নয়। কিন্তু কে বা কারা ওর পেছনে?

“ঠিক আছে কি না, সেটা আমি একা বলতে পারব না,” জবাব দিল সে। “তবে তুমি যদি এখানে শেরিফ হিসেবে কাজ করতে চাও, তা হলে অবশ্যই তোমাকে এখানকার শহর কমিটির

অনুমোদন নিতে হবে। শুধু কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে অচেনা শহরে এসে শেরিফগিরি করার সুযোগ তোমাকে দেয়া হবে না।’

পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ক্রেমন্ট হাণ্টারের দিকে। ‘আমি কী বলেছি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়। এখনও তুমি এখানকার শেরিফ নও। হ্যাম সিটিগারের সঙ্গে বিরোধটা আমি তোমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে ধরে নিচ্ছি। আর...’ একটু থামল। নিজের লোকজনের দিকে চাইল। ‘পিস্তলে তুমি যতই চালু হও, এখানে তোমার খুব একটা সুবিধে হবে না। আমি পিস্তল ঝুলাই না। আর আমার ওপর যদি হ্যামের ট্রিটমেন্ট চালাতে চাও, আমার সঙ্গে লোকগুলোর দিকে খেয়াল রেখো। ওরা আমাকে ওদের নিজেদের চেয়ে বেশি ভালবাসে।’

দোকানদার ন্যাট চ্যাপলিনের দিকে চাইল এবার। ‘ন্যাট, শহর কমিটির মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করো। তুমি, আমি, বব, জুলিয়ান, ম্যাকবেথ আর ফিলমেট আগামী পরশু শেরিফ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সভায় বসব। ভাল কথা, হ্যামের খবর কী? চোট বেশি?’

‘ডাক্তার পেসো এক সপ্তাহ সময় নিয়েছে। এর মধ্যে খাড়া করে দেবে বলেছে।’

‘অনেক লম্বা সময়। এতদিন শেরিফ ছাড়া চলবে না। আগামী পরশুর বৈঠকে নতুন শেরিফ পাবে ওয়েস্ট উড।’

দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্রেমন্ট। বাকবোর্ডে গিয়ে উঠল।

‘কী বলেছে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, মি. হাণ্টার,’ বলল চ্যাপলিন। ‘বুড়ো ক্রেমন্ট লোকটা এরকমই। নিজে কাজের লোক কাজের লোক ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করে না। এই দু’দিন নিজেকে সামলে চুপ মেরে থাকো। এর মধ্যে কোনও অঘটন না ঘটালে শেরিফের কাজটা হয়তো তুমিই পাচ্ছ।’

এক মুহূর্ত তীব্র চোখে বারটেগারের দিকে চেয়ে রইল

হাণ্টার। তারপর হঠাৎ পাল্টে ফেলল মুখের ভাব। হেসে উঠল। ‘জাহান্নামে যাও তুমি। লোকটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। এখন তোমার ওই পচা বিয়ার থাকলে দাঁও দেখি এক গ্লাস। ওয়েস্ট উডের ভারী শেরিফ এখন থেকে এই বিয়ারই খাবে।’ একটা চেয়ার টেনে বসল সে।

পরদিন সকাল বেলা। বব রায়ানের মুদি দোকান থেকে বেরোল মেয়েটা। কমফোর্ট সেলুনে ঢোকান মুখে ফুটপাতে ওর মুখোমুখি হলো ব্ল্যাক হাণ্টার। টুপি খুলে মাথা নোয়ালা ‘হাউডি, ম্যাম। আমি ব্ল্যাক হাণ্টার। গতকাল থেকে এ শহরে আছি। যেচে আলাপ করার মত একজন মানুষ এই মাত্র খুঁজে পেলাম।’ আমুদে গলায় হাসল। ‘আমি নিশ্চয় তোমার সময় নষ্ট করছি না?’

দু’চোখ তুলল মেয়েটা। নীল। সরাসরি তাকাল হাণ্টারের চোখে। একটা হার্টবিট মিস করল হাণ্টার। এভাবে তাকায় কেন এ মেয়ে? সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, এ মেয়েকে তার চাই। অপাঙ্গে তাকাল পুরো শরীরে। মুখ, বুক, কোমর, পা...দারুণ চমৎকার।

‘শুধু আমার না, নিজেরও সময় নষ্ট করছ, মিস্টার। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনও ভবঘুরের সঙ্গে আলাপ করার মত সময় আমার নেই। ...ভাল কথা। আমি ওয়েবসন, মেরি ওয়েবসন। এখানকার স্কুলে পড়াই। তুমি সম্ভবত সে উটকো লোকটা, যে গায়ের জোরে এখানকার চমৎকার শেরিফকে মেরে আহত করে নিজেকে শেরিফ বলে পরিচিত করার চেষ্টা করছে। ওকে, বাই।’ পাশ কাটিয়ে হাঁটতে শুরু করল মেরি ওয়েবসন।

পাক্কা ত্রিশ সেকেণ্ড হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল হাণ্টার। মেয়েটা রীতিমত অপমান করে গেল ওকে। আশ্চর্য তো! কীসের এত অহঙ্কার এই মেয়ের?

‘স্কুলে পড়াও! মাস্টারনী!’ পেছন থেকে ওকে দেখতে দেখতে
বিড়বিড় করল হান্টার। ‘ফুহ! দাঁড়াও, তোমার তেজ ভাঙছি
আমি। কার সঙ্গে কথা বলছ, দাঁড়ি-কমাসহ বুঝিয়ে দেব। উটকো
লোক, না?’

তিন

ব্ল্যাক হান্টার সে-ধরনের লোক, যে তার পথের কাঁটা হয়ে
দাঁড়ানো যে-কোনও লোককেই দাঁড়ি-কমাসমেত সব কিছু বুঝিয়ে
দিতে চায়। মেরি ওয়েবসন যে-কোনও যুবকের মনে ও শরীরে
কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার মত সুন্দরী। ওকে দেখামাত্র
বুকের ভেতর প্রবল কামনার সে জ্বালাটা টের পেতে শুরু করেছিল
হান্টার। মেয়েটা যদি তার আবেগে সাড়া দিত, তা হলে ওকে
নিয়ে হয়তো ঘর বাঁধার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করত। ওর
মত শক্ত-সমর্থ পুরুষের জন্যে আসলে এমন একজন নারীরই
দরকার, যে তার শক্তিতে মুগ্ধ আর সাহসিকতায় প্রলুব্ধ হয়ে
নিজেকে নিঃসঙ্কোচে সমর্পণ করে দেবে। সারা জীবন তার
অনুগত হয়ে থাকবে।

কিন্তু মেরি ওয়েবসন নামের মেয়েটা তাকে পরিষ্কার উপেক্ষা
করে গেল। তার শক্তি-সামর্থ্যকে সামান্যতম সমীহও করল না।

তবে ব্ল্যাক হান্টার তাতে দমে যাবে না। সে যে বিরাট
কাজের পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছে, তার তুলনায় মেরি

ওয়েবসন কিছুই না। তবে এটাও ঠিক মেরি ওয়েবসনও এখন থেকে তার পরিকল্পনার একটা অংশ হয়ে গেল। সে-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি এই মেয়েকে নিজের করে পাওয়াটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

গতকাল বিকেলের কথা ভাবছে সে। বেরি ক্লেমন্ট লোকটা তার মুখোমুখি দাঁড়ায়নি, তাকে পরিষ্কার এড়িয়ে গেছে। লোকটার মনে সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি সে। বরঞ্চ লোকটা তাকে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়ে গেছে। এটা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, ওয়েস্ট উডের শেরিফকে হেনস্থা করে সে নিজের যে দুর্ধর্ষতার বার্তা শহরের লোকদের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছে, সেটা সফল হয়নি। মুখোমুখি না হয়েও লোকটা তাকে মানতে বাধ্য করেছে যে, নিজেকে শহরের শেরিফ বলে দাবি করলেও শহরের লোক তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং আগামীকাল শহর কমিটির মিটিং-এ তাকে একজন প্রার্থী হিসেবে থাকতে বলেছে। অর্থাৎ ওয়েস্ট উডের শেরিফ হতে পারা না পারাটা নির্ভর করছে কমিটির মর্জির ওপর। জোর-জবরদস্তি করতে গেলে, ক্লেমন্ট বলে গেছে, ওর লোকেরা তাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসে। তার মানে হলো, ব্ল্যাক হাণ্টার যত বড় শক্তিশালী আর দক্ষ পিস্তলবাজই হোক, সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে তাকে পিছু হটতেই হবে।

মার খেয়ে আহত হয়ে পড়ে থাকলেও হ্যাম স্টিগার এখনও এ-শহরের বৈধ শেরিফ। তবে ওর পায়ের তলার মাটি যে আগের মত শক্ত নয়, সেটা বেরি ক্লেমন্টের বক্তব্যে পরিষ্কার। এর মানে হলো, আগামীকাল বৈঠকে নতুন শেরিফ নিয়োগ দেয়া হবে এবং আপাতত শহরে শেরিফ হতে আগ্রহী লোক নেই। এদিক থেকে ব্ল্যাক হাণ্টারের শেরিফ হওয়ার পথ প্রায় পরিষ্কার। হ্যাম স্টিগারকে পিটিয়ে নাস্তানাবুদ করার জন্যে কেউ ওকে দুষবে বলে

মনে হয় না। কারণ শেরিফ থাকে শহরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখার জন্যে। যে শেরিফ তা পারে না, তাকে বহাল রাখার কোনও যুক্তি কেউ খুঁজে পাবে না। শেরিফের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কেউ বৈঠকে থাকলেও সুবিধা করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ, ওই বৈঠকে ব্ল্যাক হান্টারকে সমর্থন করার মত লোকও থাকবে।

তবে সেটা অতি গোপনীয় বিষয়। কাউকে টের পেতে দেয়া যাবে না। আর যখন সেটা প্রকাশ পাবে, তখন ওয়েস্ট উডে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে।

আজ রোববারটায় কিছু করার নেই ওর। বিকেলটা কাটাল কমফোর্টে মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে। গতকালের সে রগচটা মানুষটার কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। বারকিপার ন্যাট চ্যাপলিনের সঙ্গেও মোটামুটি খাতির জমিয়ে ফেলল। এমনকী গতকালের ভাঙচুরের জন্যে দুঃখপ্রকাশও করে ফেলল এক ফাঁকে। মেরি ওয়েবসনকে নিয়ে নিজের আগ্রহের কথাটাও জানাল ন্যাটকে।

‘সে বড় কঠিন ঠাই, মিস্টার।’ মুচকি হাসল ন্যাট। ‘দেখা হয়েছে বললে না? হ্যাঁ, যেরকমটা দেখেছ, ঠিক সেরকমই। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর মত পুরুষ ওয়েস্ট উডে এখন পর্যন্ত নেই।’

বারকিপারের কথায় প্রতিবাদ করল না হান্টার। মেয়েটাকে নিয়ে সে যে-পরিকল্পনা করতে চলেছে, সেটা বাস্তবায়ন করতে হলে ওর সম্পর্কে ভালভাবে জানা দরকার।

‘কে ও? কী করছে এখানে? বাবা-মা...’

‘নেই। মা যখন গেছে, তখন নেহাত বালিকা। বাবার একটা মুদি দোকান ছিল। বছর পাঁচেক আগে সে-ও গেছে। মেরি পুবে মামার কাছে থেকে লেখাপড়া করত। মামা মারা যাওয়ার পর মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাবার কাছে

চলে এসেছিল। এখন দোকান নেই। কিছু টাকা ছিল, ওগুলো খাটছে ক্লেমন্টের ব্যবসায়। আর স্কুলের চাকরিতে যা পায়, তা দিয়ে বিয়ের আগে পর্যন্ত সময় কাটাচ্ছে প্রায় নিশ্চিত্তেই।’

এটা একটা ভাল তথ্য। ক্লেমন্টের ব্যবসায় টাকা খাটছে মেরি ওয়েবসনের। টাকাটা নিশ্চয় খুব কম হওয়ার কথা নয়। মেরি ওয়েবসনকে বিয়ে করলে টাকাটা নিজের পকেটে এসে যাবে, এটা প্রায় নিশ্চিত। নাহ, সমঝে চলতে হবে মেয়েটাকে। সম্ভব হলে ওর মন জয় করতে হবে। ওয়েস্ট উডের মত মৃতের শহরে এরকম তেজস্বিনী মেয়েকে জাগানোর মত পুরুষ কই? হান্টারের জন্যে এটা নিশ্চয় খুব ভাল একটা সুযোগ। মেয়েটাকে আকৃষ্ট করতে হবে নিজের দিকে। ওর মত সুদর্শন পুরুষের জন্যে সেটা মোটেই কঠিন হওয়ার কথা নয়। তবে কাজটা আবার কঠিনও বটে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষক হিসেবে শহরবাসী স্বভাবতই ভালবাসে তাকে। সুতরাং আকৃষ্ট করার নামে এমন কিছু করা চলবে না, যা তার ছাত্রদের মা-বাবাকে বিরক্ত করে।

কিন্তু প্রথম দর্শনেই বড় কঠিন ঠাই মনে হয়েছে মেরিকে। শেরিফকে পেটানোর ব্যাপারটাকে মোটেই ভাল চোখে দেখছে না মেয়েটা। তার মানে তার বীরত্বকে স্বীকার করছে না সে।

মদ খেতে খেতে মেরি ওয়েবসনকে একপাশে সরিয়ে রাখল হান্টার। তার আগে আরও কিছু জরুরি বিষয় চিন্তা করার আছে। আগামীকাল শহরে নতুন শেরিফ নিয়োগ দেয়ার কথা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন শেরিফ হিসেবে শপথ নেবে সে-ই। পুরানো শেরিফ যে তার চাকরি হারাতে যাচ্ছে, বেরি ক্লেমন্টের কথাতে তা অনেকটা পরিস্কার হয়ে গেছে। শেরিফ হিসেবে নিয়োগ পেলে পরিকল্পনার কাজটা কীভাবে এগিয়ে নেয়া হবে, তা নিয়ে নতুন করে ফের চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে চাইছে সে। এই মুহূর্তে আসলে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তার সামনে।

চার

ওয়েস্ট উড থেকে পুবে ডজ সিটিতে বছরে একবার গরুর চালান যায়। সব র‍্যাঞ্জেয়র গরু মিলিয়ে বিশাল এক চালান তৈরি করা হয়। তারপর বাছা বাছা কাউবয়দের নিয়ে পাঠানো হয় সে চালান। রেললাইন ডজ সিটিতে এসে শেষ হয়েছে। তার পশ্চিমে আর আসেনি। বছর দশেক আগে ডজ সিটির আশপাশের গরু চালান হত ডজ সিটি থেকে। তখনও ওয়েস্ট উড শহর হয়ে ওঠেনি কিংবা ডজ সিটি থেকে আরও পশ্চিমে অতগুলো র‍্যাঞ্জেয়র পত্তনও হয়নি। পশ্চিমে অবশ্য রেললাইন আরও সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে, বছর কয়েক আগে থেকে হালকা-পাতলা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত গুজব গুজবই থেকে গেছে।

ওয়াশিংটনে অনেক আইন হয়, অনেক পরিকল্পনাও পাস হয়। পশ্চিমে সেসব পরিকল্পনার খবর যখন নিশ্চিত সত্য খবর হয়ে আসে, ততদিনে প্রায় সবাই জেনে যায় ওয়াশিংটনে থাকা বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিচিতদের মারফত। অবশ্য টাকা খেয়ে অগ্রিম খবর বের করার লোকও থাকে। তবে পশ্চিমের র‍্যাঞ্জেয়রদের মধ্যে খবর কিনতে আগ্রহী উচ্চাভিলাষী লোকের সংখ্যা খুব বেশি নেই। অতটা বিশাল পরিকল্পনার কথা ভাবেও না গরিব কৃষক আর গরুমাালিকরা। ওয়েস্ট উডের ছোটখাট র‍্যাঞ্জেয়মাালিকরাও সে খবর রাখে না।

ক্রস বিসি ওয়েস্ট উডের পুরানো ও বড় র‍্যাঞ্চগুলোর একটি। আরেকটা র‍্যাঞ্চ আছে ক্রস বিসির মতই বড়। সেটা জ্যাক ফিলমেটের বার-টি। ওয়েস্ট উড থেকে সোজা পশ্চিমে র‍্যাঞ্চটা। জ্যাক ফিলমেট লোক খারাপ নয়। শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী, চুপচাপ ও আত্মমগ্ন ধরনের। দেখে মনেই হয় না, নিজের মনে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া আশপাশের আর কারও দিকে তাকানোর সময় কিংবা ইচ্ছে তার আছে।

র‍্যাঞ্চ থেকে খুব কমই বের হয় ফিলমেট। বিয়ে করেনি এখনও। বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ। বন্ধুবান্ধব বিশেষ নেই। তবে শহরে কালে ভদ্রে এলে বিসি র‍্যাঞ্চের বেরি ক্রেমন্টের সঙ্গে একত্রে বসে সেলুনে সময় কাটাতে দেখা যায়। বয়সে প্রায় ১২/১৩ বছরের পার্থক্য তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ব্যাপারে খুব একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ফিলমেটের একটা দুর্বলতার কথা জানে বেরি ক্রেমন্ট। সেটা মেরিকে নিয়ে। মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায় র‍্যাঞ্চার। কিন্তু মেরি ওয়েবসনকে কখনও ফিলমেটের ব্যাপারে সামান্যতম আগ্রহ দেখাতে দেখেনি বলে ব্যাপারটা নিয়ে এগোয়নি সে। তবে এটা বোঝে যে, ফিলমেটের ইচ্ছে, ক্রেমন্ট মেরির সঙ্গে তার হয়ে কথা বলুক।

সন্দের সময় নিজের র‍্যাঞ্চে বসে কাগজপত্র দেখছিল ফিলমেট। দিনকয়েক আগে ওয়াশিংটন থেকে এগুলো খুব গোপনে পাঠানো হয়েছে তার কাছে। ওয়েস্ট উড ছোট্ট শহর হলেও ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসেবে নজর কেড়েছে কর্তৃপক্ষের। ডজ সিটি থেকে পশ্চিমে রেললাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে ওয়েস্ট উডের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু সুপারিশ ও তদন্তের ওপর ভিত্তি করে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে রেল কোম্পানি। তবে সেটা গোপন রাখতে চাইছে তারা। জনসাধারণের কাছে এ-খবর পৌছানোর

আগে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর যাচাই-বাছাইয়ের কাজ বাকি রয়েছে তাদের ।

কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে মনে মনে হাসছে জ্যাক ফিলমেট । গোপনীয় এ খবরটা আগাম বের করতে গিয়ে টাকা খরচ করতে হয়েছে ওকে । ভালই টাকা খাওয়াতে হয়েছে ওয়াশিংটনে । তবে তাতে খুব একটা আফসোসে ভুগছে না ফিলমেট । জানে, ঠিকমত ফায়দা তুলতে পারলে বিশাল এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে ওর সামনে । তবে সেটার জন্যে একটা পরিকল্পনা আছে ওর নিজেরও । পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করতে গেলে বেরি ক্রেমন্টকে সরিয়ে দিতে হবে ওয়েস্ট উড থেকে । ওর র‍্যাঞ্ছের পরে ক্রেমন্টের র‍্যাঞ্ছটাই বড় এখানে । ক্রেমন্টের র‍্যাঞ্ছের মালিকানাটা নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারলে ফিলমেটই হবে এ এলাকার বিশাল ক্যাটল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক । বাকি যে ছোটখাট র‍্যাঞ্ছগুলো থাকবে, সেগুলো হবে ওর আজ্ঞাবহ ।

কিন্তু সেটা ক্রেমন্টকে সরিয়ে দিতে পারলেই । এই সরিয়ে দেয়ার কাজটা কীভাবে করা যাবে, সেটা নিয়ে ভাবছে এখন সে ।

তবে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করছে না ফিলমেট । পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত নেয়াটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ । শুরু থেকেই সে আর ক্রেমন্ট আছে এখানে । গরু পালছে, চালান দিচ্ছে । পারস্পরিক জানাশোনার মধ্য দিয়ে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে । বন্ধুত্বও বলা যায় । সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়াটা কঠিন কাজই ছিল বৈকি । কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার পর সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব শেষ ।

ফিলমেট বেশ চিন্তা-ভাবনা করেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে চাইছে । তার প্রথম অংশ হিসেবে ব্ল্যাক হাণ্টারকে ওয়েস্ট উডে নিয়ে এসেছে । বেরি ক্রেমন্টকে সরিয়ে দেয়ার কাজটা ওকে দিয়ে করাতে চাইছে সে । কিন্তু প্রথম দিন ওয়েস্ট উডে এসেই

গোলমাল পাকিয়ে বসেছে হাণ্টার। ওর প্রতি নির্দেশ ছিল শহরে বসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে সে। দু'হাতে টাকা ওড়াবে। শহরের লোকদের সঙ্গে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে। খরচাপাতির টাকা জোগাবে ফিলমেট নিজেই। কিন্তু শহরে এসেই ভাঙচুর আর শেরিফকে মারধর করে নিজেকেই শেরিফ ঘোষণা করে বসেছে লোকটা। ফিলমেটের পরিকল্পনায় এসব কিছুই ছিল না। বোঝা যাচ্ছে, নিজের প্রথম চালেই ভুল করেছে ফিলমেট। যাকে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে এনেছে, তার নিজেরই যেন আলাদা একটা পরিকল্পনা আছে। আর শুরুতেই সেটা বাস্তবায়নে তাড়াহুড়ো শুরু করেছে লোকটা।

মেরি ওয়েবসনকে বিয়ে করার ইচ্ছেটা ফিলমেটের প্রথম থেকেই। মেয়েটা এখানকার স্কুলে পড়ায়। বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। পুবে মামার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। কিন্তু বছর কয়েক আগে সেখান থেকে চলে আসে ওয়েস্ট উডে। বাবা-মা মারা যাওয়ার পরেও এখানে রয়ে গেছে। শহরে একটা বাড়িতে থাকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। নিজের মাস্টারি ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও ব্যাপারে ওর আগ্রহ আছে কি না বোঝা যায় না।

প্রথম থেকেই ওর পেছনে খুব আগ্রহের সঙ্গে লেগে ছিল ফিলমেট। নিজে সুদর্শন, তার ওপর বিশাল এক র‍্যাঞ্জেস মালিক হিসেবে টাকা-পয়সারও অভাব নেই। একটা মেয়ের বর হওয়ার জন্যে এর চেয়ে বেশি আর কী চাই?

কিন্তু মেরি ওয়েবসন পাত্তাই দিচ্ছে না ওকে। বেশ কয়েকবার ওর মুখোমুখি হয়েছে ফিলমেট। প্রথম দিনই প্রস্তাবটা দিয়েছে ওকে র‍্যাঞ্জেস মালিক। ধারণা ছিল, প্রস্তাবটা পেয়ে প্রথমে অবাক হয়ে যাবে মেরি। তারপর হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবে। এটাই স্বাভাবিক। একদম নিঃস্ব অবস্থা থেকে একেবারে রাজরানি

হওয়ার প্রস্তাব পেলে কে না খুশি হয়!

কিন্তু এই মেয়ের ধাত ভিন্ন। ওর উষ্ণ প্রস্তাবে নেহাত শীতল হাসি হেসে বলেছে, ‘কোনও র্যাঞ্চারের বউ হওয়ার কথা আমি ভাবছি না। আমি মাস্টারি নিয়ে বেশ আছি।’

উদ্ধত জবাব। কষে একটা চড় লাগানোর ইচ্ছে হয়েছিল ফিলমেটের। কিন্তু একটা মেয়ের গায়ে হাত তোলার সাহস হয়নি। মানুষ শুনতে পেলে খেপে যাবে।

অগত্যা অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। এরপরেও বারদুয়েক ওর সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু মেয়েটার ওই একই জবাব। সে মাস্টারনী হয়ে থাকবে, কখনও বিয়ে করবে না।

মেয়েটার খুঁটির জোর কোথায়, তা ভাল করেই জানে ফিলমেট। ওর পেছনে আছে বুড়ো ক্রেমন্ট। বাবা মারা যাওয়ার সময় কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল। সে-টাকাটা বসে বসে খরচ না করে ক্রেমন্টকে দিয়েছে মেরি। ওর টাকা খাটছে বিসি র্যাঞ্চে। বেরি ক্রেমন্ট সৎ লোক। মেরির টাকা বাড়ছে আস্তে আস্তে ওর তত্ত্বাবধানে।

মেরির কাছে পাত্তা না পেয়ে ন্যাটের বারে বসে পান করতে করতে নিজের মনের কথাটা বেরিকে জানিয়েছিল ফিলমেট। চুপচাপ ওর কথা শুনে গেছে ক্রেমন্ট। তারপর মৃদু হেসে বলেছে, মেরি যদি ফিলমেটকে বিয়ে করতে রাজি হয়, ওর কোনও আপত্তি নেই। মেরি ওর সম্মতি জানতে চাইলে আনন্দের সঙ্গেই সায় দেবে।

কিন্তু মেরি যে তাকে না করে দিয়েছে, সেটা ক্রেমন্টকে কী করে বলে ফিলমেট? সে একজন বিত্তবান র্যাঞ্চমালিক। টাকা-পয়সার অভাব নেই। বয়সও এমন বেশি কিছু হয়নি যে, বিয়ে বা প্রেমের প্রস্তাব দিলে মেয়েরা পত্রপাঠ বিদায় করে দেবে। তার ওপর সুদর্শনও বটে। এই ওয়েস্ট উডে এমন অনেক মেয়ে আছে,

ফিলমেট একবার চোখ তুলে চাইলে লাইন ধরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইবে। কিন্তু এই মেয়েটি তার ব্যতিক্রম। অহঙ্কারী, হয়তো বোকাও। নইলে জ্যাক ফিলমেটকে ‘না’ বলার সাহস কী করে হয়?

মেরির প্রত্যাখ্যানে ভালই অপমান বোধ করেছে ফিলমেট। রোখ চেপে গেছে ওর। মেয়েটাকে বিয়ে করে তার অহঙ্কার সে ভাঙবেই। ক্রেমন্ট ওর বন্ধু। দু’জনেই সমমানের র‍্যাঞ্চার। মেয়েটা ওকে প্রায় বাবার মতই সম্মান করে। ও চাইলে মেরিকে রাজি করাতে পারত। কিন্তু ওর তরফ থেকে তেমন কোনও উদ্যোগ দেখতে পায়নি ফিলমেট। ওর মনে হয় মেরিকে নিয়ে ক্রেমন্টের নিজেরই কোনও আলাদা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেটা কী বোঝা যাচ্ছে না। তবে উদ্দেশ্যটা নির্ঘাত খারাপ।

ক্রেমন্টকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে এই যুক্তিটাও কাজ করেছে। ক্রেমন্টের কিছু হয়ে গেলে মেরির আর দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। সব তেজ হারিয়ে ফিলমেটের নিরাপদ আশ্রয়ে যে সুড়সুড় করে চলে আসবে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

পাঁচ

প্রথম দিন ন্যাট চ্যাপলিনের বারে ভাঙচুর চালাবার পর হাণ্টার বলেছিল, যারা ওকে বন্ধু হিসেবে নিতে চায়, তারা যেন ওকে ওর প্রথম নাম ধরেই ডাকে। দু’দিনের মধ্যেই দেখা গেল ব্ল্যাক

হাণ্টার ওয়েস্ট উডে কিছু লোক জোগাড় করে ফেলেছে, যারা ওকে ব্ল্যাক বলে ডাকছে।

আজ ওয়েস্ট উডে নতুন শেরিফ নির্বাচনের কথা। সকাল থেকে দলবল নিয়ে ন্যাট চ্যাপলিনের সেলুনে গিয়ে বসেছে হাণ্টার। বোতলের পর বোতল সাবাড় করছে তাঁর সঙ্গীরা। আজকের শেরিফ নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে। কান পেতে ওদের কথা শুনছে বারটেগার ন্যাট চ্যাপলিন। বাট র্যাংস নামের একজন টেকুর তুলতে তুলতে বলল, ‘ওয়েস্ট উডের সুদিনের প্রত্যাশায়।’ ন্যাটের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। ‘ন্যাট, তোমার আজকের বিয়ারের স্বাদটা যেন একটু অন্যরকম ঠেকছে। কী মিশিয়েছ এতে? শূকরের চর্বি নাকি?’

বক্তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল আরও কয়েকজন। ‘খচ্চরের মূতও হতে পারে,’ ফোড়ন কাটল আরেকজন। ‘আমি অবাক হব না। দেখছ না কেমন বিচ্ছিরি গন্ধ!’

চুপচাপ শুনে যাচ্ছে ন্যাট চ্যাপলিন। অন্য সময় হলে কথাগুলোকে ঠাট্টা হিসেবে মেনে নিত। সমান তালে জবাব দিত সে-ও। কিন্তু আজ কথা বলছে না।

ব্ল্যাক হাণ্টারের এভাবে দলবল নিয়ে জাঁকিয়ে বসাটা ভাল লাগছে না ওর। মাত্র দিন তিনেক আগে একটা শহরে এসে সে শহরের লোকদের নিয়ে দল পাকানোর ব্যাপারটা আর যা-ই হোক, ভাল উদ্দেশ্যে যে নয়, সেটা না বোঝার মত কিছু নয়। তা ছাড়া ওয়েস্ট উডের এরা, যারা ব্ল্যাক হাণ্টারের পয়সায় মদ গিলছে, এদের সম্পর্কেও শহরের কেউ তেমন ভাল ধারণা পোষণ করে না। এদের কোনও নির্দিষ্ট পেশা নেই। নেই শহরের উন্নয়নমূলক কোনও কাজে অংশগ্রহণ।

ব্ল্যাক হাণ্টারের ধারণা, আজকের সভায় ওকেই শেষ পর্যন্ত শেরিফ মনোনীত করা হবে। কারণ এখনও ওর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী

দেখছে না সে। তবে ওর সঙ্গে একমত হতে পারছে না বারকিপার। পুরো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বেরি ক্রেমন্ট আর জ্যাক ফিলমেটের ইচ্ছের ওপরই নির্ভরশীল। বার্ট র্যাংসের মত মানুষদের সঙ্গে র‍্যাকের মাখামাখিকে ভাল চোখে দেখবে না তারা। আর তাদের দু'জনকে ডিঙিয়ে নির্দিষ্ট কাউকে শেরিফ হিসেবে নির্বাচন করা বাকিদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ব্যাপার ভাল ঠেকছে না চ্যাপলিনের চোখে। র‍্যাক হাণ্টার নিজের পক্ষে লোক জুটিয়ে ফেলেছে। এর মানে হলো, ওকে শেরিফ নির্বাচন করা না হলে গোলমাল পাকাবে সে। ও নিজে পিস্তলবাজ। ওয়েস্ট উডে ওর সমান দক্ষ তো দূরের কথা, কাছে আসার মতও কেউ নেই। শহর কমিটি ওর মতের বাইরে কাজ করতে চাইলে সবাইকে চ্যালেঞ্জ করে বসবে সে। গায়ের জোরে শেরিফ হয়ে বসবে। আর এর মানে হলো, শহর চালাবে ওর নিজের ইচ্ছেমত। সেটা যে শহরবাসীর জন্যে সুখকর হবে না, সেটা প্রথম দিনের ভাঙচুর আর মারপিট দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছে।

তবে একটা ব্যাপারে বিশ্বাস আছে ন্যাট চ্যাপলিনের। শেরিফ নির্বাচনের ব্যাপারটা দেখছে বেরি ক্রেমন্ট। ওর ধারণা, পরিস্থিতি যে-রকমেরই হোক, সেটা সামাল দেয়ার ক্ষমতা ক্রেমন্টের আছেই। তবে র‍্যাক হাণ্টারও মনে হয় না পিছু হটার লোক। কোনও একটা পরিকল্পনা নিয়েই সে ওয়েস্ট উডে এসেছে। শহরবাসী তাকে শেরিফ হিসেবে নিয়োগ না দিলেই যে ভাল মানুষের মত চুপচাপ মেনে নেবে, এটা মনে করা ভুল হবে। শহরের ভাগ্যে একটা দুর্ভাগ্য নেমে আসছে, দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে ন্যাট।

দুপুরের পরে কমফোর্ট সেলুনেই কমিটির শেরিফ নির্বাচনী সভা বসল। বেরি ক্রেমন্ট এসেছে, সঙ্গে তার লোকজন। এসেছে জ্যাক

ফিলমেট। বেরির পাশের চেয়ারে বসেছে। কমিটির 'অন্যান্য সদস্য হলো বব, জুলিয়ান, ম্যাকবেথ এবং বারকিপার ন্যাট।

কথা তুলল ন্যাট চ্যাপলিন। শেরিফ হ্যাম স্টিগার আহত, কখন সুস্থ হয়ে ফের দায়িত্ব নিতে পারে, সেটা এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। সুতরাং নতুন শেরিফ নিয়োগ করা দরকার। আর নতুন শেরিফ হিসেবে দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ব্ল্যাক হাণ্টারের কথাও বলল সে। এ-পর্যন্ত সে ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায়নি প্রার্থী হিসেবে।

বব, জুলিয়ান, ম্যাকবেথরা এই প্রথম দেখছে ব্ল্যাক হাণ্টারকে। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে নির্বিকার বসে রইল হাণ্টার। ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তল কারও নজর এড়াচ্ছে না।

‘হ্যাম কখনও পিস্তল ঝোলাত না,’ বব এই বলল প্রথমে।

‘এবং সেটা যে শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি, সেটার প্রমাণও নিজেই। উটকো লোকের হাতে মার খেয়ে পড়ে আছে ডাক্তারের হাওলায়,’ এই মন্তব্য ক্রেমন্টের। ‘যিশুর অনুসারীরা সবাই তাঁর মত শান্তিপ্রিয় না। ন্যাট চ্যাপলিনের ফুটো হয়ে যাওয়া বিয়ারের ক্যান আর প্রাক্তন শেরিফের ভাঙা দাঁতের কথা শুনেই আমরা বুঝতে পারছি। হ্যাম স্টিগার সৎ ও দায়িত্ববান, কিন্তু দায়িত্বপালনের যোগ্যতা যে তার নেই, সেটা আমাদের বোঝা উচিত ছিল।’

ববের মন্তব্যে যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে নতুন শেরিফ পদপ্রার্থীর প্রতি, এটা পরিষ্কার। তবে তাতে বিচলিত বোধ করছে না হাণ্টার। কিন্তু ক্রেমন্টের কথা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে। ধুরন্ধর লোকটা, মহা ফেরেববাজ। এতগুলো কথা বলেও ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছে, সেটা এখনও বলেনি।

নির্বিকার মুখে বসে আছে জ্যাক ফিলমেট। হাণ্টার বারবার

ওর দিকে চাইছে। জানে, ওয়েস্ট উডের শেরিফ হিসেবে ওর নিয়োগের ব্যাপারটা নিশ্চিত করবে সে-ই। ওকে ওইরকমই বলা হয়েছে। ফিলমেট নিজেও সেটা জানে। এদিকে রেললাইন বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্তটা খুব কম লোকই জানে। ওয়াশিংটনে ফিলমেটের বন্ধুরা আগেভাগে সে খবর বের করে নিয়েছে। আর ফিলমেটের অনুরোধেই তাকে পাঠানো হয়েছে। তবে বলে দেয়া হয়েছে, এ মুহূর্তে ফিলমেটের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথাটা যথাসম্ভব গোপন রাখতে হবে। ব্ল্যাক হাণ্টার নিজেই নিজের অবস্থান তৈরি করে নেবে ওয়েস্ট উডে।

কিন্তু পরের কাজ হাসিল করে দেয়ার জন্যে পৃথিবীতে আসেনি হাণ্টার। করার মত ওর নিজেরও অনেক কাজ আছে। জ্যাক ফিলমেটকে সাহায্য করার জন্যে আসার আগে নিজের কিছু হিসেব মিলিয়ে নিয়েছে সে। যেমন, জ্যাক ফিলমেট নিজেই যদি না থাকে ওয়েস্ট উডে? রেললাইন আসার আগে হাণ্টার নিজেই যদি এখানে গুছিয়ে বসতে পারে? হিসাব, ব্যাপারটা স্রেফ হিসাব-কিতাবের। ঠিকমত হিসেব করতে পারলে আকাশের তারা আর পাতালের বালিও গোনা যায়। দু'একটা ফিলমেটকে এদিক-ওদিক করে দেয়া আর এমন কী ব্যাপার?

তবে সেজন্যে চাই কিছু ক্ষমতা, দাঁড়াবার জন্যে একটা শক্ত ভিত্তি। ওয়েস্ট উডের শেরিফের পদটা পেতে হবে তাকে সে জন্যে।

‘কিন্তু আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি শেরিফ নিয়োগ করার জন্যে। নতুন শেরিফ হিসেবে কাকে নেয়া যায়?’ প্রশ্ন করল জুলিয়ান। কম কথার মানুষ সে। কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারলেই র‍্যাঞ্জে ফিরে যাবে। ওর চোখ গিয়ে স্থির হলো ব্ল্যাক হাণ্টারের ওপর। ‘তুমি?’

নড়েচড়ে বসল ব্ল্যাক হাণ্টার। হাসার ভঙ্গি করল। ‘আর

কোনও প্রার্থী যদি না থাকে...' ফিলমেটের দিকে চাইল। কাঁধ ঝাঁকাল। লোকটা এখনও একবারও তাকায়নি তার দিকে।

মুখ তুলল ফিলমেট। 'বেরি, আমরা কিন্তু এখনও প্রার্থীর পরিচয় পাইনি।'

উঠে দাঁড়াল হাণ্টার। কেশে গলা সাফ করে নিল। তারপর ফিলমেটের দিকে তাকাল। 'মি. ফিলমেট, আমি ব্ল্যাক হাণ্টার। এটা যদি শেরিফ নির্বাচনী সভা হয়ে থাকে, তা হলে আমিই প্রার্থী। একটা শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার মত ক্ষমতা আমার আছে। কথা দিতে পারি, বাইরের কোনও গুপ্তা-বদমাশ এসে শহরের শান্তিভঙ্গ করতে পারবে না।'

'হুম,' ওর দিকে চেয়ে মাথা দোলাল ফিলমেট। 'কিন্তু বেরি, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। আমাদের শহরে এখনও শেরিফ পদে হ্যাম সিটগার বহাল আছে। আমার জানা মতে, লোকটা মারা যায়নি, পদত্যাগ করেনি, কিংবা তাকে বরখাস্তও করা হয়নি। সুতরাং নতুন শেরিফ নিয়োগের প্রশ্ন আসছে কীভাবে?'

'তা ছাড়া,' খেই ধরল ফিলমেট। 'প্রার্থী ব্ল্যাক হাণ্টার শহরে এসেই প্রথমে গোলমাল পাকিয়েছে, এরপর শেরিফকে আচমকা আক্রমণ করে আহত করেছে। মারপিট করার সামান্য সুযোগও পায়নি বেচারী। এদিকে হাণ্টার নিজের ইচ্ছেমত নিজেকে শেরিফ দাবি করে বসেছে। এর কোনোটাই একজন নীতিবান মানুষের গুণ হিসেবে পরিচিত নয়। সুতরাং এমন গোলমালে লোককে শেরিফের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে কীভাবে নেয়া যায়? আমাদের কি আরেকটু সময় নেয়া উচিত নয়?'

হাঁ করে ফিলমেটের দিকে তাকিয়ে রইল হাণ্টার। যেন বুঝতে পারেনি ও কোন্ ভাষায় কথা বলেছে। ফিলমেট কি জানে না ও কে? না জানার কোনও কারণ নেই। ওর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে

সাহায্য করার জন্যেই তো ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে। সেজন্যে ব্ল্যাক হাণ্টারের দরকার এখানে একটা শক্ত অবস্থান। ফিলমেটের উচিত তাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করা। ও যদি এখানে শেরিফের দায়িত্বটা পেয়ে যায়, তা হলে প্রায় অর্ধেক কাজই হয়ে যায় তাদের। বাকিটা ধীরে সুস্থে করা যাবে। কিন্তু ফিলমেট এসব বলছে কী? লোকটা গাধা-নাকি ছাগল?

‘না।’ মাথা নাড়ল ক্লেমেন্ট। ‘ওয়েস্ট উডের শেরিফ পদে হ্যাম স্টিগার আর বহাল নেই।’ পকেটে হাত দিয়ে একটা কাগজ বের করল। ‘অন্তত এ কাগজটায় কমিটির বেশিরভাগ সদস্য সই করার পর। এটা হ্যাম স্টিগারকে দেয়া অব্যাহতি পত্র। আশা করছি, সবাই এতে সই করবে।’

‘হ্যাম স্টিগারকে কেন বরখাস্ত করা হবে জানতে পারি কি?’ এই প্রথম মুখ খুলল ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথ দশাসই চেহারার লোক। বয়স চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ। চৌকো মুখে সারাক্ষণ একটা রুম্ফতার আবরণ। ‘তোমার ওই কাগজটায় নিশ্চয় তার ব্যাখ্যা দেয়া আছে, বেরি?’

‘আছে। আমি নিশ্চিত,’ সবার জন্যে এক গ্লাস করে পরিবেশন করতে করতে বলল ন্যাট চ্যাপলিন। ‘ব্যাখ্যাটা বরং আমি মুখে মুখেই দিচ্ছি। হ্যাম স্টিগার চমৎকার লোক। সবাই ওকে পছন্দ করে। ওয়েস্ট উড সে ভালই চালাচ্ছিল। কিন্তু ওয়েস্ট উডে এ পর্যন্ত চোখে পড়ার মত তেমন কোনও খারাপ লোক আসেনি। শক্ত কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি শেরিফকে।’

চেয়ারে বসে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল। ‘কিন্তু সব দিন সমান যায় না। কোথেকে ছুট করে মি. ব্ল্যাক হাণ্টার এসে হাজির হলো। বেয়াড়া মানুষ। ওকে সামলানোর দায়িত্ব ছিল হ্যামের। কিন্তু সে পারেনি। এটাকে তার অক্ষমতা কিংবা অযোগ্যতা

হিসেবে দেখছেন মি. ক্লেমন্ট। তাই না, মি. ক্লেমন্ট, স্যর? আপনার কাগজে নিশ্চয় এমনটাই লেখা আছে। তাই যদি হয়, তা হলে হ্যাম স্টিগারকে অব্যাহতি দেয়ার পক্ষে আমি প্রথমে সই করব। তবে নতুন শেরিফ কে হবে, তা নিয়ে আমি ভোটদানে বিরত থাকব।’

ফিলমেটের অসন্তোষের মুখে গৃহীত হয়ে গেল হ্যাম স্টিগারের অব্যাহতি পত্র। আর নতুন শেরিফ হিসেবে দ্বিতীয় প্রার্থী না থাকায় ব্ল্যাক হান্টারের আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল।

ছয়

শেরিফ হিসেবে ব্ল্যাক হান্টারকে নিয়োগ দিয়ে যে ওয়েস্ট উডের শহর কমিটি ভুল করেনি, দিন তিনেক বাদেই সেটা হাতেনাতে প্রমাণ করে দিল সে। ন্যাট চ্যাপলিনের সেলুনে জনাতিত্বকে ভবঘুরেকে মদ খেয়ে মাতলামি করার দায়ে পিটিয়ে সাইজ করে দিল নতুন শেরিফ। তারপর নিজের অফিসের ঠাঙ্গে লাগোয়া জেলে নিয়ে ঢোকাল। ভবঘুরেদের একজন পিস্তল বের করতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর হাত পিস্তলের বাটের কাছে পৌঁছানোর আগেই ওর বুক সই করে স্থির হলো শেরিফের পিস্তল। জায়গায় জমে গেল লোকটা। তারপর শেরিফের নির্দেশে কোমর থেকে হোলস্টার খুলে ওর দিকে আঁস্টে করে ছুঁড়ে দিতে বাধ্য হলো। পরে তিনজনকে গরাদে নিয়ে ঢোকায় হান্টার।

বারটেগার হলেও পিস্তলবাজ অনেক দেখেছে ন্যাট চ্যাপলিন। ভবঘুরের পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানো আর শেরিফের চোখের পলকে পিস্তল বের করে ওর বুক সহি করা—দুটোই চমৎকৃত করেছে ওকে। মনে মনে স্বীকার করেছে, আগের শেরিফ হ্যাম স্টিগার হলে কখনও পারত না এমন নিখুঁতভাবে পরিস্থিতির সামাল দিতে। হ্যাম স্টিগারকে অবশ্য এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে দেখেওনি ন্যাট। শহরের ছোটখাট গোলমাল সামাল দিতেই হিমশিম খেত বেচার। আর যখন ব্ল্যাক হান্টারের মত মূর্তিমান ঝামেলা এসে সামনে দাঁড়াল, কিছুই করতে পারেনি। নির্বিবাদে মার খেয়ে ধরাশায়ী হয়েছে।

পরদিন সকাল বেলা তিন মূর্তিকে ধরতে গেলে ঝাঁটিয়েই শহর থেকে বের করে দিল হান্টার। বলে দিল, এ তল্লাটে তাদের চেহারাও যেন আর না দেখা যায়। তা হলে কিন্তু ওটা আর আস্ত থাকবে না।

শুধু আইনশৃঙ্খলাই নয়, শহরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে ওঠার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগল নতুন শেরিফ। রোববার দিন গির্জায় গিয়ে সবার সঙ্গে প্রার্থনা করল। তারপর ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান যে তার প্রতিবেশীদের প্রতিও কতটা সহানুভূতিপরায়ণ, সে ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে রেভারেণ্ড উইলিয়াম ক্র্যাভাটিকে প্রার্থনার পরে ছোটখাট বক্তৃতা দেয়ার জন্যেও রাজি করিয়ে ফেলল। পাদ্রী তার বক্তৃতায় শহরবাসীদের পারস্পরিক মতবিরোধ ও ঝগড়াফ্যাসাদ নিজেদের মধ্যে আপসে মিটিয়ে ফেলার তাগিদ দিলেন।

ওদিকে শহরবাসীর স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকেও বেশ নজর দেখা গেল শেরিফের। হ্যারি ফাইনম্যানকে তার বাসার সামনে জমে ওঠা ময়লার পাহাড় এক সপ্তাহের মধ্যে পরিষ্কার করে ফেলার জোর তাগিদ দেয়া হলো। হিচরেইলের কাছে জমে ওঠা ঘোড়ার

নাদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষ্কার করার কথা বলে দিল ন্যাট চ্যাপলিনকেও ।

‘এটা কিন্তু ভাল কাজ,’ দুপুরের পর গলা ভেজাতে আসা শেরিফকে বলল ন্যাট । ‘মানুষকে সামাজিক দায়বোধে উদ্বুদ্ধকরণের কাজটার জন্যে তুমি প্রশংসা পাবে ।’

‘কাজটা তোমাদের আগের শেরিফও করতে পারত । সেজন্যে পিস্তল চালানো কিংবা মারপিটে দক্ষ হওয়ার দরকার পড়ে না ।’

‘ঠিক বলেছ,’ মাথা দোলাল বার মালিক ।

শেরিফ হওয়ার দিন কয়েক পরে মেরি ওয়েবসনের স্কুল দেখতে গেল হান্টার । গির্জার সঙ্গে লাগোয়া বড়সড় একটা ঘরে বিশ থেকে পঁচিশজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে মেরির স্কুল । শেরিফকে দেখে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল মেরি । মুখে আন্তরিক হাসি । একটু অবাক হলো হান্টার । এতটা সে আশা করেনি । বরং একটু আশঙ্কা নিয়ে এসেছিল সে । মেরি ওয়েবসন যে শান্ত, সুবোধ মেয়ে নয়, ইচ্ছে করলেই ফুঁসে উঠতে পারে, সেটা সেদিনের প্রথম সাক্ষাতেই টের পেয়েছিল । শেরিফের ব্যাজ লাগিয়ে ওর আসান উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েটিকে নিজের ওজন কতটা তা চোখে আঙুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়া । কিন্তু মেরির ভাবভঙ্গি দেখে মত পালটাতে হলো ওকে হেসে বলল, নিশ্চয় আজ বলবে না যে, আমি নিজের সময় নষ্ট করতে এসেছি । ওয়েস্ট উডের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা কীভাবে মানুষ হয়ে উঠছে, এটা দেখতে আসাটাও অনেক বড় কাজ বলে মনে করছি আমি ।’

‘অবশ্যই না, শেরিফ ।’ উচ্ছল হাসি মেরির মুখেও । ‘ওয়েস্ট উডের ভাবী নাগরিকরা তাদের শেরিফের এ মহানুভবতাকে অবশ্যই নিজেদের জন্যে সৌভাগ্য হিসেবে ভাববে । কিন্তু তোমাকে বসাব কোথায় বুঝতে পারছি না ।’

‘তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার সামান্য সুযোগ পেলেও যে-কোনও পুরুষ সেটাকে অসামান্য সৌভাগ্য বলে মানবে। আমার কোনও সমস্যা হচ্ছে না।’

‘হুম।’ গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল মেরি। ‘শুধু শেরিফ হিসেবে নয়, বক্তা হিসেবেও তোমার দক্ষতা আছে দেখা যাচ্ছে। অনেক মেয়ে আছে, যারা এ-ধরনের কথা শুনতে পেলে বর্তে যায়।’

‘তাই?’ হেসে উঠল শেরিফ নিজেও। ‘তুমি যাও না?’

‘না। কারণ নিজের সম্পর্কে আমার ধারণা পরিষ্কার। আমি ধৃতের বাইরে তাকাই না।’

থমকে গেল হাণ্টার। এমন জবাব সে আশাও করেনি। মেয়েটি দেখছি দারুণ ভোগাবে। কিন্তু ওর নামও ব্ল্যাক হাণ্টার। জানে কোন্ শিকারকে কীভাবে আটকাতে হয়। এ মেয়ে পাহাড়ি সিংহী। এক বশ করতে হবে আস্তে আস্তে খেলিয়ে খেলিয়ে। জোর করা যাবে না।

জোর করার দরকার নেই, ভাবল হাণ্টার। ওয়েস্ট উডের শেরিফের হাতে অফুরন্ত সময় এখন।

‘সাধারণত কেউই তাকায় না, ম্যাম,’ ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলল শেরিফ। কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন বাইরের দৃশ্যটা ভেতরের ঘটনার চেয়ে সত্যি হয়ে ওঠে।’

‘বুঝলাম না।’

হেসে উঠল শেরিফ। ‘থাক না এখন। সব সময় সব কিছু বোঝারই বা দরকার কী? যা হোক, তোমার স্কুল দেখি ভালই চলছে। যে-কোনও সময় যে-কোনও প্রয়োজনে চাইলে শেরিফের সহায়তা পাবে, ম্যাম।’

স্কুল পরিদর্শন শেষ করে নিজের অফিসে এসে বসল হাণ্টার। ভাবছে। ওয়েস্ট উড শহরে সে এসেছিল অনেকটা ঝঞ্ঝার মত।

প্রথম দিনই কাঁপিয়ে দিয়েছে সবাইকে। ওটাই চেয়েছিল সে। ওয়াশিংটন থেকে যে-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সে এসেছিল, সে-পরিকল্পনার আরেকটা অংশ জ্যাক ফিলমেট। সে এসেছিল জ্যাক ফিলমেটের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্যে। তবে এর মধ্যে নিজেরও একটা পরিকল্পনা ছিল ওর। সেটা হলো, ফিলমেটের ওপর টেকা দেয়া। ওয়েস্ট উডের ধারে-কাছে একটা বড় র‍্যাঞ্চার মালিকানা থাকলে রেললাইন আসার পরে টাকা-পয়সা আর গুনে কূল পাওয়া যাবে না।

নিজের তেত্রিশ বছরের জীবনটা নিয়ে ভাবছে সে। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে টাকা রোজগারের ধাক্কায় অনেক কাজ করতে হয়েছে। কেরানিগিরি থেকে গরুচুরি পর্যন্ত। যেদিন থেকে পিস্তলে নিজের সহজাত দক্ষতার পরিচয় পেল, সেদিন থেকে আর টাকা রোজগারের জন্যে উজ্জ্বলতার দরকার হয়নি। রেঞ্জ ওয়ার থেকে শুরু করে ভীরা দাঙ্গাবাজের হয়ে লড়াই করেছে, প্রচুর টাকা কামিয়েছে।

ওয়েস্ট উডের র‍্যাঞ্চার জ্যাক ফিলমেটকে সাহায্য করার প্রস্তাবটা যখন পেল, তখনই সুযোগটা চিনতে পারল ব্ল্যাক। একজন র‍্যাঞ্চার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনাটা মাথায় এল তার। ওয়েস্ট উডে এসে শেরিফের মত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে চাকরি বাগাতে হলে সাবেক শেরিফকে আক্রমণ করা ছাড়া ওর আর উপায় ছিল না। ব্যাপারটা ছিল অনেকটা জুয়া খেলার মত। ওর পরিকল্পনা কাজে না-ও আসতে পারত। মূল পরিকল্পনায় যাকে সরিয়ে এখানে ফিলমেটকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা, সে ক্লেমেন্টই কী বুঝে যেন তার কাজটা সহজ করে দিল। তাকেই দিয়ে দিল শেরিফের কাজটা।

সেদিনের সে নিয়োগ কমিটির বৈঠকেই ফিলমেটকে প্রথম দেখেছে ব্ল্যাক। লোকটাকে দেখে হতাশ হয়েছে সে। হালকা

মনের মানুষ ফিলমেট। চোখদুটো ভোঁতা, তাতে বুদ্ধির গভীরতা নেই। মনের ভাব লুকিয়ে রাখার কৌশলটা রপ্ত করতে পারেনি। ওয়াশিংটনের ওই লোকগুলো কী বুঝে তার ওপর অতবড় দায়িত্ব দিল বুঝতে পারছে না সে। তবে একটা ব্যাপারে অবাক হয়েছে ব্ল্যাক। ফিলমেট তাকে শেরিফ হিসেবে নিতে চায়নি। অথচ বাকিদের তরফ থেকে বাধা এলে ওর কাছ থেকেই সাহায্য পাবার আশা করেছিল ব্ল্যাক। এই ব্যাপারটাই শেষ পর্যন্ত ফিলমেটের প্রতি আগ্রহ হারাতে দেয়নি ওকে। ওদিকে ক্লেমন্টের সমর্থনে শেরিফ হয়ে আরেক দ্বন্দ্ব পড়ে গেছে ও। দু'জনের একজনকেও শেষ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছে না।

আর এই মাস্টারনী, মানে মেরি ওয়েবসন। এই মেয়েও আজ আবার ঘোল খাইয়ে দিয়েছে ওকে। প্রথম দিনের তিজু পরিচয়ের পর আজ কিন্তু এই মেয়ের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করেনি সে। আজকের আচরণটা যেন একটা প্রহেলিকা। এতটা ভাল ব্যবহার অন্তত আশা করেনি ব্ল্যাক। প্রথম দিন মেয়েটার অবহেলায় ওর ভেতরে যে জেদটা জেগে উঠেছিল, এখনও সেটা আছে, তবে তার সঙ্গে ক্রোধের মিশেলটা আর টের পাচ্ছে না। মেরি ওয়েবসন নামটা এখন তার মনের ভেতর একটা অনুভূতির নামান্তর হয়ে কাজ করছে যেন। এমন হলো কেন বুঝতে পারছে না সে। তবে ওর কথা ভাবতে গিয়ে একটা স্নিগ্ধ ভাবে আবিষ্ট হচ্ছে। আশ্চর্য তো!

সাত

বেরি ক্রেমণ্টকে খুন করার আরেকটা জোরালো কারণ খুঁজে পেয়েছে জ্যাক ফিলমেট। তার অমতেই ব্ল্যাক হাণ্টারকে শহরের শেরিফ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেদিনের ভোটাভুটিতে নিজের ভোট ছাড়া আর কারও ভোট পায়নি সে। বব, জুলিয়ান, ম্যাকবেথ আর ন্যাট সবাই ক্রেমণ্টের কথায় সায় দিয়েছে। ব্যাপারটাকে নিজের জন্যে চূড়ান্ত অপমান হিসেবে ধরে নিয়েছে ফিলমেট।

সেদিন সন্দের দিকে তিনজন অতিথি এল বার-টি র‍্যাঞ্জে। তিনজন নিজেদের পরিচয় দিল যথাক্রমে ফিক ক্যাবেট, সিম লেইরি আর জব জ্যাকসন নামে। আধ ঘণ্টা পরে জ্যাক ফিলমেট মিলিত হলো ওদের সঙ্গে। তিনজনকেই খুঁটিয়ে দেখল। ভবঘুরে টাইপের। নিরীহ কাউবয় নয়। কাজ করে টাকার বিনিময়ে। দু'জনের বয়স বছর ত্রিশেক, আরেকজন ফিলমেটেরই সমবয়সী। তিনজনকেই গোলমেলে লোক মনে হলো ওর।

বড় জনই মুখ খুলল প্রথমে। কাঁধ ডলতে ডলতে বলল, 'ব্ল্যাক ভালই মারতে পারে। এখন বুঝতে পারছি ওয়েস্ট উডের প্রাক্তন শেরিফ শুধু শুধু বিছানায় শুয়ে নেই। তবে সেলুনে মারপিটের অভিনয়টা ভালই হয়েছে। এটা যে আসলে পাতানো মারামারি ছিল, আমরা নিজেরাই ভুলে গেছি।' হাসল সে। 'কী

বলো, সিম? ব্যথা টের পাচ্ছ এখনও?’

সরাসরি কাজের কথায় চলে এল ফিলমেট। ‘তোমাদের কে পাঠিয়েছে?’

‘সে কী?’ গাছ থেকে পড়ল যেন জব জ্যাকসন। ‘হাণ্টার তোমাকে কিছুই বলেনি?’

কথা ঘোরাল ফিলমেট। ‘হাণ্টার যা-ই বলুক, তোমাদের মারপিটের নাটকের কথা বলেনি।’

‘অ।’ হাসল ফিক ক্যাবেট। ‘ওটা আসলেই নাটক। নিজের যোগ্যতা দেখানোর সুযোগটা হাতছাড়া করল না আর কী। বুঝলে না?’

মাথা দোলাল ফিলমেট। ভাবছে। হাণ্টার তা হলে গুছিয়েই বসতে চাইছে ওয়েস্ট উডে। এ লোকগুলো ওর নিজের। কিন্তু শহরের মানুষদের বুঝিয়েছে, ওর কাছে কোনও গোলমালে লোক প্রশ্রয় পাবে না। মারধর করে শহর থেকে বের করে দিয়েছে তিন ভবঘুরেকে। শহরবাসী নিশ্চয় ওর কর্মতৎপরতায় খুশি। এদিকে লোকগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওর কাছে। ভালই হয়েছে। ওর লোক দরকার।

আপন মনে হাসল ফিলমেট। ‘ঠিক আছে। তোমরা র‍্যাঞ্জে থাকো। খাও-দাও, তাস খেলো। কিন্তু শহরে যাওয়ার নামও মুখে আনবে না। সময় হলেই জানবে তোমাদের কার কী কাজ। ভাল কথা, তিনজনেই দেখি পিস্তল ঝুলিয়েছ। আশা করি, ওগুলো কী করে চালাতে হয় বলে দিতে হবে না?’

পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ। খেপে উঠতে গেল ফিক ক্যাবেট। ‘তার মানে...’

ওকে থামাল জব। ‘কী বলতে চাও বুঝতে পারছি। তোমার কাজের ধরনটা বোঝা গেল।’

তিনজনকে বিদেয় করে দিয়ে নিজের অফিসে গিয়ে বসল

ফিলমেট। ভাবছে। ব্ল্যাক হাণ্টারের পরিকল্পনাটা বোঝার চেষ্টা করছে। বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা শুধু যে মারকুটে তা নয়। মাথায় বুদ্ধিও ধরে। ওয়েস্ট উডে নিজের জায়গা করে নিয়েছে কৌশলে। ওয়াশিংটনে যারা তার হয়ে কাজ করছে, তারাই এখানে কী ঘটবে, তা ঠিক করে দিচ্ছে। ব্ল্যাক হাণ্টারের এখানে আসার কথা ছিল তার হুকুমে কাজ করার জন্যে। লোকটা পরিকল্পনামাফিক এসেছে ঠিকই, কিন্তু তার হুকুমবরদার হয়ে নয়। ফিলমেট চাইলেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এদিকে যে লোকগুলোকে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের ওপরও রয়েছে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ। এ লোকগুলো কাজ করবে বার-টি র‍্যাঞ্জেস টাকা খেয়ে, কিন্তু তাদের আসল আনুগত্য থাকবে হাণ্টারের প্রতি। তার মানে হলো, ফিলমেটের প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল বেরি ক্রেমন্ট নয়, হাণ্টারও। একটা চোখ সব সময় রাখতে হবে ওর তথাকথিত সহযোগীর ওপর।

বুদ্ধির খেলা খেলতে ভাল লাগে ওর। ওয়েস্ট উডে এখন বুদ্ধির খেলা শুরু হয়ে গেছে। তবে একটাই মুশকিল দেখছে ফিলমেট। ওর আসল প্রতিদ্বন্দ্বী বেরি ক্রেমন্টকে ঠিকমত বুঝে ওঠা খোদ শয়তানেরও অসাধ্য। ভীষণ ধুরন্ধর কম কথা বলা এই লোক। এতদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও লোকটা কী ভাবে, আর কীভাবে চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারেনি ফিলমেট।

এদিকে রেললাইনের কাজ শুরু করার নীতিগত সিদ্ধান্তের কথাটা কি জানে ক্রেমন্ট? এ কথাটা আগেও ভেবেছে ও। কিন্তু বেরি ক্রেমন্টের মুখে কখনও এ বিষয়ে সামান্যতম আলাপও শুনেছে কি না মনে করতে পারছে না। লোকটা সারাক্ষণ 'র‍্যাঞ্জেস সময় কাটায়। শহরে এলে কখনও একা আসে না। নিজের বাছা বাছা লোকদের দু'চারজনকে সঙ্গে নিয়েই আসে। আর এলেও বেশিক্ষণ শহরে থাকার অভ্যাস নেই। ন্যাট চ্যাপলিনের বারে বসে

দু'চার ঢোক পান করে। তারপর দরকারি কাজ থাকলে তা সে-
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব র‍্যাঞ্চের পথ ধরে। বউ মারা গেছে।
একমাত্র ছেলে পুত্র থেকে লেখাপড়া শেষ করে ওখানেই থাকে।
বাবার কাছে কখনও এসেছে, এমনটা দেখা যায়নি।

টম ওয়েবসনের বন্ধু ছিল লোকটা। যতদিন টম বেঁচে ছিল,
ওর দোকানের নিয়মিত খদ্দের ছিল বিসি র‍্যাঞ্চ। টম মারা
যাওয়ার পর ওর দোকান উঠে যায়। মিসেস ওয়েবসন আরও
আগে মারা গিয়েছিল। একমাত্র মেয়ে মেরি ওয়েবসন থেকে যায়
ওয়েস্ট উডে। সে সময় শহর কমিটি বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্যে
স্কুল বসায়। স্কুলের দায়িত্ব তুলে দেয় মেরির ওপর।

সাঁইত্রিশ বছর বয়সে নিজেকে প্রায় সব দিকেই একজন
পরিপূর্ণ সুখী মানুষ মনে করে ফিলমেট। বিশ বছরের ভবঘুরে
এক তরুণ হিসেবে পশ্চিমে এসে অনেক ঘাটের পানি খেয়েছে।
তারপর থিতু হয়েছে একজন র‍্যাঞ্চার হিসেবে। কপর্দকহীন এক
তরুণের জন্যে পরিণত যৌবনে তার বিবেচনায় এটাও কম কথা
নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যেভাবেই হোক, ওয়াশিংটনে কিছু
শুভার্থী জোগাড় করে ফেলেছে ও। নগদ টাকার চেয়ে অনেক
দামি এই সম্পর্ক।

কিন্তু একটা জায়গায় এসে নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে বাধ্য হচ্ছে
ফিলমেট। তা হলো মেরি ওয়েবসন। পুত্র মামার কাছে থেকে
পড়াশোনা শেষ করার পর বাবার কাছে চলে আসে মেরি। ওর
চলনবলনে পুত্রের আভিজাত্য সম্পূর্ণ আলাদা ঠেকে ফিলমেটের
কাছে। মেয়েটার প্রতি নিজের অজান্তেই দুর্বল হয়ে পড়ে সে।

চমৎকার মেয়ে মেরি। শহরের সবাই চেনে ওকে। ওর
কোমল আর সাবলীল ব্যবহারে ছেলে-বুড়ো সবাই ওর প্রতি
অন্যরকম এক আকর্ষণ অনুভব করে। উঠতি তরুণ বর্তে যায় ওর
সঙ্গে কথা বলার একটু সুযোগ পেলে।

পরিচয়ের পর দ্বিতীয় দেখায় মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল ফিলমেট। ওর ধারণা ছিল, প্রস্তাবটা বিনীতভাবেই গ্রহণ করবে বাপ-মা মরা মেয়েটা। নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে মেরির মত যে-কোনও মেয়েরই তা করার কথা। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়েই ওর প্রস্তাব নাকচ করে দেয় সে। অবশ্য খুব বিনীতভাবেই। মেরি জানায়, সে এখন তার নতুন দায়িত্ব মানে মাস্টারি ছাড়া আর কোনও কিছু নিয়ে ভাবছে না।

এটা যে সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান, সেটা বুঝিয়ে বলার দরকার হয়নি ফিলমেটকে। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েও হাল ছাড়েনি সে। বরং আগের চেয়ে বেশি আকর্ষণ বোধ করেছে মেয়েটার প্রতি। প্রস্তাবটা শেষে মেরির লোকাল গার্জেন হিসেবে বেরি ক্রেমন্টের কানেও তুলেছে। কিন্তু ক্রেমন্ট ওর কথা চুপচাপ শুনে গেছে শুধু। আশ্বাস দেয়ার মত কোনও কিছু বলেনি কখনও। ক্রেমন্ট যুবক হলে ফিলমেট ওর নীরবতাকে অন্যভাবে নিতে পারত। ভাবত, ক্রেমন্ট নিজেই মেরিকে পেতে চায়। তাই ফিলমেটের আবেদনে সাড়া দিতে চাইছে না। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণই ভিন্ন। মেরিকে, যতদূর জানে ও, নিজের মেয়ের মতই দেখে লোকটা। তা হলে কি ছেলের বউ করবে? সেটার সম্ভাবনাও দেখছে না। সে উদ্দেশ্য থাকলে বিয়ে অনেক আগেই হয়ে যেতে পারত। ছেলেও বাবার কাছে না থেকে পুবে পড়ে থাকত না।

এই হিসেবটাও মেলাতে পারছে না ফিলমেট। মেরি শেষ পর্যন্ত কী করবে? কাকে বিয়ে করবে? যাকেই করুক, সে লোকটা নিজে না হলে আর কাউকেই মেনে নেবে না ফিলমেট।

আট

বেরি ক্লেমন্ট আনাড়ি লোক নয়। বুদ্ধিসুদ্ধি যেটুকু না থাকলে নয়, সেটুকু অন্তত আছে। আর আছে প্রচুর কল্পনাশক্তি। যুক্তি এবং কল্পনার সমন্বয়ে নিজের চারদিকটাকে দেখতে অভ্যস্ত সে। নিজের ব্যবসাটা ভালই বোঝে। সৎপথে থেকে যেটুকু আয় করা যায়, তাতে খুশি। বেশি আশা করে না। তবে সুযোগ দেখতে পেলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেটা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে জন্যে কারও মাথায় মারার ইচ্ছে নেই।

ওয়েস্ট উড শহরটার পত্তন ধরতে গেলে তারই হাতে। শহরটা অবশ্য আরও আগে থেকেই ছিল। তবে এদিকটায় ইণ্ডিয়ানদের উপদ্রবে শ্বেতান্ধরা তখনও ভাল করে থিতু হতে পারেনি। একসময় পিছু হটে ডজ সিটির দিকে চলে যায় তারা। ওয়েস্ট উড মরে যায়।

কিন্তু প্রায় বছর দশেক পরে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ইণ্ডিয়ানদের রিজার্ভেশনে ঠাঁই করে দেয়া হলে ওরা সেখানে চলে যায়। ঠিক সে সময় এখানে এসে ক্লেইম ফাইল করে ক্লেমন্ট। এর বছর কয়েক পরে ফিলমেট আসে। এরপর থেকে আস্তে আস্তে জেগে উঠতে থাকে শহরটা। আগের সে ওয়েস্ট উড নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে ফের। ইণ্ডিয়ানদের ভয় কেটে যাওয়ায় লোকজন এসে নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্য আর কাজকর্ম শুরু করে

দেয়।

নিজের র‍্যাঞ্জে একা সময় কাটায় ক্রেমন্ট। তবে লোকজন ভালবাসে। নিজের কর্মচারীদের প্রতি ওর স্নেহ-মমতার শেষ নেই। ওদের সামান্যতম সমস্যাকেও প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে দেখে। কর্মচারীরাও তেমনি মনিব বলতে অজ্ঞান। ফোরম্যান আর্নেস্ট মেরিংটনের নেতৃত্বে ক্রস বিসিকে নিজেদের র‍্যাঞ্জ বলেই ভাবে ওরা। আর মালিক বুড়োর সামান্যতম ইঙ্গিতে নিজেদের উজাড় করে দিতে তৈরি যে-কোনও কাজে।

বউ নেই ক্রেমন্টের। একমাত্র ছেলেকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করার আগ্রহ পায়নি ক্রেমন্ট। তখনও থিতু হয়ে বসেনি সে। নিজের ভবঘুরে জীবনের সঙ্গে তাই ছেলেকে জড়াতে চায়নি। পূবে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বড় হয়েছে ছেলে ডিক ক্রেমন্ট। ওয়াশিংটনে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছে। তারপর বিয়ে-থা করে ওখানেই রয়ে গেছে।

তাতে কোনও ক্ষোভ নেই ক্রেমন্টের। বরং খুশিই হয়েছে। নিয়মিত টাকা-পয়সা পাঠিয়ে ছেলের ভরণপোষণ আর লেখাপড়ার খরচ মেটাতে পেরেছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবানই মনে করে। ছেলে এখন প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং বাবার দায়িত্ব শেষ। ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। তবে ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে আসার আগ্রহ কোনোদিন দেখায়নি। তেমনি নিজেকে ছেলের বোঝা করে তোলার চিন্তা কখনও করেনি। তার চেয়ে বড় কথা হলো, পশ্চিমের এই জীবন ছেড়ে পূবের জীবনে নিজেকে ফের অভ্যস্ত করে তুলতে পারবে, এমনটা ভরসা করে উঠতে পারে না ক্রেমন্ট। পশ্চিমের এই জীবনে বেঁচে থাকাটা এখন তার কাছে নেশার মত। বাকি জীবন এখানেই কাটাবে, এমনটাই আশা ওর।

এখানে অবশ্য আরেকটা বাঁধনে জড়িয়েছে ক্রেমন্ট। বাঁধনের নাম মেরি ওয়েবসন। এই মেয়েটাই এখন ওর জীবনের অনেক

কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। মেয়েটাকে ভালবাসে সে। মেরির বাবা টম ওয়েবসনের মৃত্যুর পর থেকে নিজের মেয়ের মতই দেখছে ক্রেমন্ট ওকে। একসময় একটা পরিকল্পনা ছিল মনে মনে। ছেলে ডিকের বউ হিসেবে চমৎকার মানাত মেয়েটাকে। সে পরিকল্পনা নিয়ে এগোতেও শুরু করেছিল। কিন্তু পুঁব থেকে ছেলের বিয়ের খবর শোনার পর সে পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। তবে মেয়েটার প্রতি আকর্ষণ আর দায়িত্ববোধ যেন আরও বেড়ে যায়। ওর এখন একমাত্র চিন্তা, মেরির একটা ভাল বিয়ে হোক। কিন্তু ওয়েস্ট উডে ওর যোগ্য পাত্র কোথায়? মেরি যে কাউকে এখনও পছন্দ করেছে, এমন কোনও আঁচ পায়নি ক্রেমন্ট।

ফিলমেট মেরিকে বিয়ে করতে চায়, জানে সে। ফিলমেট তার মনের ভাব গোপন করেনি। পাত্র হিসেবে অবশ্য মেরির জন্যে ফিলমেটকে অযোগ্যও বলা যাবে না। কিন্তু মেয়েটির মন জয় করতে পারেনি ফিলমেট। সেটা মেরিকে সরাসরি জিজ্ঞেস না করেও বুঝে গেছে ক্রেমন্ট। তেমন হলে তার কাছে ধর্না দিত না সাঁইত্রিশ বছর বয়সী ঝানু র্যাঞ্চার। মেরির বয়স এখন পঁচিশ চলছে। সম্ভবত বয়সের পার্থক্যের কারণেই সায় দেয়নি মেয়েটা। তবে এটা এত বেশি পার্থক্য নয় যে, বিয়ে হতে পারে না। এটার কারণ হতে পারে ক্রেমন্টের সঙ্গে ফিলমেটের বন্ধুত্ব। বাবার বয়সী একজনের বন্ধুকে বিয়ে করার রুচি মেরির না হলে তাকে খুব বেশি দোষও দেয়া যাবে না।

ফিলমেট চাইছে, ক্রেমন্ট ওর হয়ে মেরিকে চাপ দিক। কিন্তু সেটা করবে না ক্রেমন্ট। নিজের ভাল-মন্দ নিজেরই বোঝার অধিকার থাকা উচিত মেরির। ক্রেমন্ট তার সে অধিকারে হাত দিতে যাবে কোন্ যুক্তিতে?

ওয়েস্ট উডে এখন কিছু ঘটনা ঘটছে। এরকম কিছু ঘটনা যে ঘটবে, এটা আরও আগে থেকে আঁচ করতে পেরেছে ক্রেমন্ট।

ওয়াশিংটনে বিভিন্ন পরিকল্পনা হয়, সেটার দিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি থাকলে অনেক ঘটনারই অগ্রিম খবর পাওয়া যায়। আর কারও যদি থাকে সেসব খবর বিশ্লেষণের মত যুক্তিবোধ ও অভিজ্ঞতা, সেটা থেকে নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কাজটাও অনেক সহজ হয়ে যায়। ক্রেমন্ট জানে, ওয়েস্ট উডের ভবিষ্যৎ কী হতে যাচ্ছে। এখন সপ্তাহে দু'দিন একটা কোচ মালপত্র নিয়ে আসা-যাওয়া করে। রেললাইন যখন আসবে, তখন মানুষ বাড়বে, বাড়বে এর আয়-উন্নতিও।

ওয়েস্ট উডের ভবিষ্যৎ ভাল হোক, সেটাই চায় বেরি ক্রেমন্ট। চায় সবাই মিলে এখানে ভাল থাকুক।

ওয়েস্ট উডে এখন নতুন শেরিফ। প্রাক্তন শেরিফ এখনও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। লোকটা সৎ, সাহসীও। শহরটা ভালই চালিয়েছিল। বড় ধরনের কোনও গোলমাল তার সময়ে হয়নি। সবাই আইন মেনে চলেছে। কিন্তু সত্যিকারের গোলমাল যখন এসে পড়েছে, তখন আর তা মেটানোর ব্যাপারে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। তবে লোকটা প্রাণে বেঁচে গেছে এটা তার ভাগ্য।

ব্ল্যাক হাণ্টার একটা শহরের শেরিফকে পিটিয়ে নাস্তানাবুদ করে নিজেকে সে শহরের শেরিফ ঘোষণা করে বসেছে। সাধারণ কোনও আউট-ল কিংবা ভবঘুরে হলে ওই কাজটা করার কথা ভাবত না। কিংবা ঝাঁকের বশে করে ফেললেও পরে নিজের পথে চলে যেত। শহরে জাঁকিয়ে বসতে চাইত না। কিন্তু হাণ্টার তা করেনি। লোকটাকে নিয়ে ক্রেমন্টের খটকাটা এখানেই। ওয়েস্ট উড শহরের শেরিফ হতে চায় কেন ও? কী লাভ? এটা ঠিক কোনও চাকরিপ্রার্থীর কাজ নয়। এই বিষয়টা চিন্তা করতে গিয়ে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার আভাস পায় ক্রেমন্ট। ব্ল্যাক হাণ্টারের এই উৎপাত পুরোটাই উদ্দেশ্যমূলক।

ওয়েস্ট উডে রেললাইন আসার খবর শুধু জ্যাক ফিলমেটই আগেভাগে পেয়েছে, তা নয়। বেরি ক্রেমন্টের মত প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চারেরও তা পাওয়াটা স্বাভাবিক। ক্রেমন্ট এতে খুব খুশি। ওয়েস্ট উড আরও সমৃদ্ধ শহর হয়ে উঠুক, এটা সে চায়। এখানে ছোট-বড় র‍্যাঞ্চার যারা আছে, সবাইকে নিয়ে থাকতে চায় ও। ওর ইচ্ছে, সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপার্জন করুক। কিন্তু জ্যাক ফিলমেটের মতলব যে ভিন্ন, সেটা সে অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছে। তবে নিজের মনের ভাব কখনও বুঝতে দেয়নি ওকে।

ব্ল্যাক হাণ্টারকে ওয়েস্ট উডে কে স্বাগত জানাতে পরে, সেটা বোঝার জন্যে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনাও করতে হয়নি ক্রেমন্টকে। এখানে রেললাইন এলে বড় র‍্যাঞ্চারদেরই বেশি লাভ। আর কেউ যদি হতে পারে একক গরু চালানদাতা, দিনে দিনে ফুলে উঠবে সে। জ্যাক ফিলমেট সেটা বোঝে। বোঝে বলেই এখানকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার হওয়ার চেষ্টা সে করতেই পারে। আর সেটা করতে গেলে কিন্তু সোজা পথ নেই। ব্ল্যাক হাণ্টারের মত ষণ্ডা-গুণ্ডাদের সহায়তা লাগবেই। সুতরাং ক্রেমন্ট যদি এটা ধরে নেয় যে, হাণ্টারকে ফিলমেটই আমন্ত্রণ জানাতে পারে, তা হলে সেটা খুব বেশি কষ্ট কল্পনা হওয়ার কারণ নেই।

কিন্তু সেজন্যে ভাঙচুর, শেরিফকে মারধর এসব করে নিজেকে জানান দেয়ার দরকার পড়ল কেন হাণ্টারের? স্বাভাবিক যেটা সেটা হলো, ঘাপটি মেরে থাকা। সুযোগের অপেক্ষা করা এবং সময়মত কাজে নেমে পড়া। কিন্তু হাণ্টার এসব হাঙ্গামা চালিয়েছে নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্যে। তার মানে হলো, সে যদি ফিলমেটের হয়ে কাজ করতে আসেও, তার নিজেরও কিছু আলাদা মতলব আছে। পঞ্চাশ বছরের ঘাপ্টা র‍্যাঞ্চার বেরি ক্রেমন্টকে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে তাই খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি।

হাণ্টারকে প্রথম দিন দেখে এবং তার উদ্দেশ্যের কথা শুনে এটুকুই আঁচ করেছিল ক্রেমন্ট। কিন্তু শেরিফ নির্বাচনের দিনে ফিলমেট ও হাণ্টারের নীরব স্নায়ুযুদ্ধ বিষয়টাকে স্পষ্ট করে তোলে তার কাছে। এরপর ব্ল্যাক হাণ্টারকে শেরিফ নির্বাচনে ফিলমেটের মতের বিরোধিতা করে সে। ব্যক্তিভেদের কারণে বাকিদেরও নিয়ে আসে নিজের মতে। দুই মূর্তিমান বিপদকে প্রথমেই বিভক্ত করে দেয় বুদ্ধিমান র‍্যাঞ্চার।

বুদ্ধির খেলা খেলতে ভালবাসে বেরি ক্রেমন্ট। দেখা যাক, জ্যাক ফিলমেট আর ব্ল্যাক হাণ্টারের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধি ধরে?

নয়

নিজের ছোট্ট মেয়ারটাকে নিয়ে বেরিয়েছে মেরি ওয়েবসন। রোববারের বিকেলটা ঘোড়ায় চড়ে কাটায় ও। ওয়েস্ট উড থেকে পশ্চিম দিকে কিছুদূর গেলে ছোট-বড় পাহাড়। একটা ছোট্ট ঝরনা নেমে এসেছে পাহাড়ের ভেতর থেকে। সমতলে এসে কিছুটা ধীর হয়ে এসেছে ওটার গতি। তবে একদম ঝুলে পড়েনি। ওটার পাড়ে নানারকম গাছ-গাছড়া আর বুনো ঝোপঝাড়। এখানে এসে ঘোড়াটাকে ঘেসো জমিতে চরতে দিয়ে ঝরনার পাড়ে বসে সময় কাটায় মেরি।

স্কুলে পড়াতে ভাল লাগে মেরির। এতগুলো বাচ্চা! কী যে চমৎকার একেকটা! তেমনি পাকা। গতকাল নেইলটনদের মেয়েটা

কথা নেই, বার্তা নেই, হুট করে প্রশ্ন করে বসল, ‘তোমার বাচ্চা নেই কেন, ম্যাম?’

‘মানে!’ অবাক হয়েছিল মেরি। তারপর মজা পেল। ‘আমার বাচ্চা থাকতে হবে, এটা তোমাকে কে বলে দিল?’

‘থাকতে হবে না কেন? বড়দেরই তো বাচ্চা থাকে। আমার মম বড়। তার বাচ্চা আছে। তার বাচ্চা তো আমি, তাই না?’

‘অবশ্যই, নেলি।’ মেয়েটার কাছে গিয়ে টুক করে তার কপালে চুমু খেল মেরি। ‘তুমি আমারও তো বাচ্চা।’ তারপর অন্য বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জানো, তোমরা সবাই আমার বাচ্চা। ঠিক আছে?’

সব বাচ্চাই একযোগে মাথা দোলাল। ‘হ্যাঁ-এ।’

বাচ্চা ভালবাসে মেরি। বাবা মারা যাওয়ার পর তাই স্কুলে পড়ানোর কাজটা নিয়েছে। নিজের কাজটা উপভোগ করে সে। একেকটা বাচ্চাকে মনে হয় যিশু খ্রিস্টের শিশু সংস্করণ।

‘তোমার বাচ্চা নেই কেন, ম্যাম?’ পিচ্চি নেইলটনের এই সরল প্রশ্ন মেরির অস্তিত্ব ধরে টান দিয়েছে। ওর বয়স এখন পঁচিশ। এই বয়সে একটা ছোট্ট তুলতুলে বাচ্চা ওর থাকতেই পারত। সে যদি পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে না আসত, তা হলে হয়তো এতদিনে বিয়ে-থা করে কারও স্ত্রী হয়ে যেত, কারও বাচ্চার মা হত। কিন্তু পূর্বে থাকা তার হয়ে ওঠেনি। মামা মারা যাওয়ার পরই বাবার কাছে চলে আসতে হয়েছে ওকে। বাবা টম ওয়েবসনের ইচ্ছে ছিল না, মেরি পশ্চিমে আসুক। কিন্তু মামাতো ভাই-বোনেরা মেরির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করলে ওখানে আর থাকা সম্ভব হলো না।

বাবার কাছে তিনটি জিনিস শিখেছে মেরি। এর একটা হলো ধৈর্য। বাবা বলত, ‘তুমি যদি সত্যি সত্যিই অপেক্ষা করো, তা হলে না পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।’

বাকি দুটো হলো সততা ও মানুষকে ভালবাসা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে ভালবাসে মেরি। সে একজন সত্যিকার পুরুষকে বিয়ে করতে চায়। তার বাবা কিংবা ক্রেমন্ট চাচার মত একজনকে, যাকে সে একই সঙ্গে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে পারবে। সে জানে, শ্রদ্ধাহীন ভালবাসা মানে স্রেফ মোহাবিষ্ট শরীর বিনিময়। একসময় মোহ চলে গেলে ভালবাসারও মৃত্যু ঘটে। মেরি একা থাকবে সারা জীবন। কিন্তু নিছক শরীরী আবেগে কখনও জড়াবে না।

ওয়েস্ট উডে ওকে বিয়ে করতে চায় এমন পুরুষ আছে বটে। কিন্তু মেরির কাউকেই পছন্দ হয়নি। এমন নয় যে, এদের মধ্যে দু'একজন সুদর্শন নয়, কিন্তু নিজের সমস্যাটা কোথায় তা জানে সে। পরিস্কারভাবেই জানে। সে পুবে লেখাপড়া করেছে, বেড়ে উঠেছে ওখানকার ধাঁচে। সেরকম রুচিশীল, ব্যক্তিত্বময়ী ও চিন্তাশীল। ওর চোখে এখানকার পুরুষকে নিজের জন্যে কোনোভাবেই যোগ্য মনে হয় না। এই চিন্তাটা যে ওর আত্মগরিমার দিক থেকে আসে, তা নয়, বরং ওর বড় হয়ে ওঠার ধারাটাই ওর সঙ্গে এদের পার্থক্যটা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

বার-টি-ব মালিক জ্যাক ফিলমেট ওকে বিয়ে করতে চায়। লোকটার সঙ্গে ওর বয়সের পার্থক্য যথেষ্ট। তবে সেটা খুব বেশি বাধা হয়ে দাঁড়াত না, যদি না লোকটা বেরি ক্রেমন্টের বন্ধু হত। এ ছাড়া মেরি যা বুঝেছে, ওকে দেয়ার মত লোকটার আর্থিক সমৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নেই। লোকটার মাঝে একই সঙ্গে কর্তৃত্বপরায়ণতা ও লোভ দুটোই কাজ করছে। ওর আচরণে মেরি তার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা সমীহ কোনোটাই দেখতে পায়নি। ফিলমেটের ভাব দেখে মনে হয়েছে, মেরি স্রেফ একজন মেয়েমানুষ এবং সুন্দরী—সুতরাং তাকে তার পেতেই হবে। এ ব্যাপারে মেরির যে নিজস্ব বক্তব্য থাকতে পারে, এটা তার

কল্পনারও বাইরে। তার বিশ্বাস, স্বামী হিসেবে টাকা-পয়সায়লা মানুষ ছাড়া একজন মেয়েমানুষের আর কী-ই বা চাওয়ার থাকতে পারে। কিন্তু মেরির আপত্তি এখানেই। নিজেকে সে কিছুতেই স্রেফ একজন মেয়েমানুষ ভাবতে পারে না। এজন্যেই জ্যাক ফিলমেটকে ওর বারবার ফিরিয়ে দিতে হয়েছে।

‘হুম, জায়গাটা চমৎকার।’ মৃদু স্বরের এ কথাগুলো যেন মেরির কানের কাছে বোমার মত বিস্ফোরিত হলো। ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে। এর পরের কথাগুলো শুনল। ‘বিশেষ করে কেউ যদি নিজের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে চায়। হাউন্ডি, ম্যাম?’ মৃদু হাসির সঙ্গে বলল লোকটা। ‘এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একজন নির্জনতাপিয়াসী চমৎকার ভদ্রমহিলাকে দেখে কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। ...আ-আমি তোমার সময় নষ্ট করছি না তো?’

‘একদম না। কিন্তু কে তুমি? এদিক দিয়ে কোথেকে আসছ? আমি টের পেলাম না কেন? নিশ্চয় পা টিপে টিপে আসোনি?’

পেছনে হাত উঁচাল লোকটা। ‘মেয়ারটা নিশ্চয় তোমার। চরতে চরতে অনেক দূর চলে গেছে। ওটাকে দেখে নিজেরটাকে থামিয়ে ওর সঙ্গী বানিয়ে দিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। ওখান থেকে মেয়ারের মালিককে খুঁজে পেতে তো অ্যাপাচি হওয়ার দরকার নেই।’

বছর ত্রিশেক হবে লোকটার বয়স। পরনে কাউবয়ের পোশাক। কোমরে ঝোলানো পিস্তল দেখে মনে হয় না, কেবল গরু সামলানোই ওর কাজ। সুদর্শন লোকটা। তবে সৌখিন নয়। জীবিকা নির্বাহের জন্যে শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত। লোকটার হাসি চমৎকার, সাবলীল; চোখ সংযত। নির্বিকার মুখে কঠিন এক প্রত্যয়ের ছাপ। কে লোকটা?

‘অ্যাপাচিদের ব্যাপারে জানো নাকি? যেভাবে বলছ, মনে

হয়...’

‘হুম। লড়াইও করতে হয়েছে বছর কয়েক। হেরে গেছি শেষ পর্যন্ত। নিজে প্রাণে বেঁচেছি, কিন্তু র‍্যাঙ্কটা বাঁচাতে পারিনি। বছরখানেক ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে-সেখানে। বেশি খিদে পেলে কাজ-কর্ম করি।’ হেসে উঠল লোকটা আবার।

‘আমি মেরি ওয়েবসন। এখানকার স্কুলে পড়াই। শহরে যাচ্ছ নিশ্চয়?’

‘আমাকে জিম বলে ডাকতে পার। জিম টার্নার।’

উঠল লোকটা। ‘সময় নষ্ট করে থাকলে দুঃখিত। শহরেই যাচ্ছি। ভাল লাগলে দু’একদিন থেকেও যেতে পারি। দেখা হতে পারে আমাদের, না?’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মেরি। নীরবে লোকটার চলে যাওয়া দেখল। একটু এগিয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

আশ্চর্য তো লোকটা! অসম্ভব সুশৃঙ্খল আর গোছানো। এমন নির্জনে একজন যুবতী মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে একজন পুরুষের মনে যে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য জেগে ওঠার কথা, তার সামান্যতম লক্ষণও দেখা গেল না ওর মধ্যে। অথচ কেমন আন্তরিকভাবে হাসল লোকটা, কথা বলল কেমন সাবলীল কণ্ঠে! ওয়েস্ট উডের কারও সঙ্গে মিল নেই।

অবাক হলো মেরি। ও কি লোকটাকে নিয়ে ভাবছে? ভাবা যেতেই পারে। তবে লোকটাকে আলাদা মনে হচ্ছে কেন? কী এমন বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে ওর মধ্যে? সেটাই ভাবছে মেরি। কীসের যেন একটা আকর্ষণ জেগেছে ওর ভেতরে। লোকটা যতক্ষণ ছিল, কোথেকে যেন একটা ভাল লাগার অনুভূতি এসে ভর করেছিল ওর মনে।

দশ

রাত আটটা। নিজের অফিসে বসে ছিল শেরিফ ব্ল্যাক হাণ্টার। আগামীকাল থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়তে যাচ্ছে ওয়েস্ট উডে তার শেরিফগিরির বয়স। ম্যাড়ম্যাড়ে শহর ওয়েস্ট উড। ঝঙ্কি-ঝামেলা তেমন নেই। সকাল-সন্ধ্যা বার-দুয়েক রাউণ্ডে বেরোলেই চলে। বাকি সময় অফিসে বসে কাটাও, নয়তো ন্যাট চ্যাপলিনের সেলুনে গিয়ে মদ খাও।

তবে খুব একটা স্বস্তিতে নেই হাণ্টার। কাজের ব্যাপারে জ্যাক ফিলমেটের সঙ্গে এখনও সত্যিকারের যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি তার। আর সেটা ঠিক কীভাবে ঘটবে, সেটাও বুঝে উঠতে পারছে না। জ্যাক ফিলমেট তাকে এড়িয়ে চলছে। ওর পরিকল্পনাটা আঁচ করতে পেরেছে কি না কে জানে?

নিজের পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাবছে শেরিফ। ওকে পাঠানো হয়েছিল জ্যাক ফিলমেট নামের এক ব্যক্তিকে সহায়তা করার জন্যে। বলে দেয়া হয়েছে, ওর নির্দেশেই কাজ করতে হবে। কিন্তু একটু খোঁজ-খবর করতেই হাণ্টারের মনে হয়েছে, ওয়েস্ট উডে একটু বুদ্ধি খাটালে সে-ও নিজের জন্যে সুযোগ খুঁজে পেয়ে যেতে পারে।

নিজের ওপর আস্থার অভাব নেই হাণ্টারের। সামান্য সুযোগ পেলে সেটাকে অসামান্য করে তুলতে পারবে সে। এখানে এসে

সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগোচ্ছে সে।

বাইরে হৈ চৈ শোনা গেল। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল এরিক নাথাল। মেরি ওয়েবসন নাথালদের সঙ্গেই থাকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। ওর দিকে তাকাল শেরিফ। গম্ভীর স্বরে বলল, 'কী হয়েছে, এরিক? বাইরে হৈ চৈ কীসের?'

'মেরির মেয়ারটা একা ফিরে এসেছে। মেরি নেই।'

'মেরি নেই মানে? কী হয়েছে ওর?'

'কী হয়েছে সেটাই যদি জানতাম। প্রতি রোববার বিকেলে মেয়ারে চড়ে বেড়াতে যায় ও। আজও গিয়েছিল। সন্দের একটু পরে মেয়ারটা ফিরেছে খালি পিঠে। ও নেই।'

'কী বলো? কোথাও আহত হয়ে পড়ে-টড়ে নেই তো? খালি ঘোড়া তাই ফিরে এসেছে। মানে ঘোড়া থেকে পড়ে-টড়ে গিয়ে...'

'তা হলে এফুনি বেরোনো উচিত আমাদের,' বলে উঠল এরিক নাথাল। 'ও সব সময় ঝরনার দিকেই বেড়াতে যায়।'

'কিন্তু অন্ধকারে খুঁজবে কোথায়?'

'কোথায় খুঁজব, সেটা তো জানি না। কিন্তু খুঁজতে যেতে হবে,' বাইরে থেকে জোর গলায় দাবি জানাল আরেকজন।

দশ মিনিটের মধ্যে লোক জোগাড় হয়ে গেল। শেরিফের নির্দেশে বার্ট র্যাংসের নেতৃত্বে মশাল জ্বলে বেরিয়ে পড়ল সবাই।

রাত নয়টার দিকে ন্যাট চ্যাপলিনের সেলুনে গেল হাণ্টার। বারের পাশে দাঁড়ানো নতুন লোকটাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। লোকটার হাতে গ্লাস, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে। অলস চোখ মেলে দেখছে সবাইকে। ওদের কথা শুনছে।

আলোচনা চলছে মেরি ওয়েবসনের অন্তর্ধান নিয়ে।

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে দেখছে শেরিফ। সুঠাম শরীর। দৃঢ় চৌকো মুখ। চোখ দুটো আধবোজা। যেন আশপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে, ওসব নিয়ে তার কোনও আর্থহই নেই। কোমরে

হোলস্টার ।

এগিয়ে গেল শেরিফ লোকটার দিকে । ‘নতুন?’

‘কে?’

‘মানে?’

‘তুমি নাকি আমি? নাকি দু’জনই?’

‘আমি ওয়েস্ট উডের শেরিফ ।’

‘তারা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে ।’

‘কিন্তু যেটা বুঝছ না কিংবা বুঝতে চাইছ না, সেটা হলো আমি তোমার পরিচয় জানতে চাইছি ।’

‘গায়ে পড়ে আলাপ করার স্বভাব নাকি তোমার? আমি জিম টার্নার । এতেই চলবে নিশ্চয়?’

পিস্তলের কাছে হাত চলে গেল শেরিফের । ‘তোমার কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না আমার । তুমি আইনকে অশ্রদ্ধা করছ,’ অভিযোগের সুরে বলল ।

মেরিকে নিয়ে আলোচনা থেমে গেছে । আচমকা নীরবতা নেমে এসেছে লোকদের মধ্যে । নিশ্বাস রুদ্ধ করে শেরিফের সঙ্গে আগন্তকের তর্ক-বিতর্ক শুনছে সবাই ।

‘যেমন?’

লোকটাকে বুঝে উঠতে পারছে না ব্ল্যাক হাণ্টার । সে শেরিফ জেনেও একটুও সমীহের ভাব দেখাচ্ছে না । তাই বলে উদ্ধতও ভাবা যাচ্ছে না । মৃদু কণ্ঠে ওর কথার জবাব দিচ্ছে । গলা একটুও না উঁচিয়ে । আগন্তকের এই ঠাণ্ডা ভাবটাই পছন্দ হচ্ছে না ওর । নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এরা অন্য ধাতের লোক ।

‘তুমি পিস্তল ঝুলিয়েছ ।’

‘তো?’ হেসে উঠল আগন্তক । ‘তোমার কোমরেও তো দেখছি ঝুলছে একটা । তোমার একটা হাত ওটার কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করছে ।’

রাগে লাল হয়ে উঠল শেরিফের মুখ। ওর এখন আগন্তুককে হোলস্টার খুলে ওর কাছে জমা দিতে বলা উচিত। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না।

‘বেশ বেশ, ঠিক আছে। তবে পিস্তল সামলে রেখো। ওয়েস্ট উডে কোনও পিস্তলবাজ নেই। কিছু ঘটলে তোমাকেই দায়ী করা হবে। কাজ খুঁজছ?’

‘খিদে পেলে খুঁজি। দেবে নাকি? আছে তোমার কাছে?’

‘পিস্তলবাজি ছাড়া আর কী জানো?’

‘পিস্তলবাজি যে জানি সেটা কে বলল তোমাকে?’

লোকটাকে উপেক্ষা করল শেরিফ। ‘ন্যাট?’

বোতল আর গ্লাস এনে শেরিফের সামনে রাখল বারটেণ্ডার। একটা চেয়ার টেনে বসল শেরিফ। তাকাল লোকটার দিকে। ‘মুখের মত হাতদুটোও যদি চালু থাকে, তা হলে কাল সকাল নাগাদ পেয়ে যেতে পার একটা। এখানে র‍্যাঞ্চাররা চাকরি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।’

‘অ।’ বোতল থেকে ঢেলে গ্লাসে চুমুক দিল আগন্তুক। ‘শেরিফ হিসেবে মেয়েটাকে খুঁজতে যাওয়া তোমার নিজেরই উচিত ছিল, মিস্টার।’

মাত্র প্রথম চুমুকটা গালে নিয়েছিল হান্টার, ঢোক গিলতে গিয়ে বিষম খেল। ‘মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?’

‘এরা সবাই বলছিল, আজ বিকেলে একটা মেয়ে বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে গেছে। ওর ঘোড়াটা একা ফিরে এসেছে। আমি শেরিফ হলে সব কিছু বাদ দিয়ে আগে ওর খোঁজে ছুটতাম।’

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল হান্টার। লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। একই সঙ্গে হোলস্টারের দিকে হাত চলে গেল ওর। পিস্তলটা মাত্র বের করেছে, আগন্তুককে টার্গেট করার আগে দেখল, ওর পিস্তলটা তাকিয়ে আছে ওর বুকের দিকে। নিমেষে

জমে গেল শেরিফ হাণ্টার ।

‘হাহ!’ হেসে উঠল লোকটা । ‘তুমি কী? শেরিফ নাকি পিস্তলবাজ? বিনা নোটিসে পিস্তল বের করতে গেলে? একবারও ভাবলে না আমি তোমার চেয়েও চালু হতে পারি?’

নিজের পিস্তলটা ঠেলে খাপে ঢোকাল আগন্তুক জিম টার্নার ।

‘তুমি কিন্তু হ্যামকে এই সুযোগটা দাওনি, হাণ্টার,’ মৃদু স্বরে মন্তব্য করল চ্যাপলিন ।

তীব্র চোখে চাইল হাণ্টার বারটেঞ্জারের দিকে । পাত্তা দিল না চ্যাপলিন । ‘তোমার ভাগ্য ভাল, এই লোকের শেরিফ হবার মতলব ছিল না ।’

হেসে উঠল একজন । তার সঙ্গে গলা মেলাল পুরো বারের সবাই ।

কথা খুঁজে পাচ্ছে না শেরিফ । বুঝতে পারছে, চরম বেইজ্জতি হচ্ছে তার । এরা বুঝে গেছে তার দৌড় কতটুকু । এরপর থেকে আর ভয় পাবে না । তার ওপর বারটেঞ্জারের টিটকারিতে গা জ্বলে যাচ্ছে । কিন্তু কিছুই করতে পারছে না সে ।

শেরিফকে বাঁচাল বাইরের হৈ চৈ । মেরিকে খুঁজতে যাওয়া লোকেরা ফিরে এসেছে । বার্ট র্যাংস সহ দু’তিনজন ঢুকে পড়ল ভেতরে । ‘ব্ল্যাক, গরুখোঁজা করে এসেছি । কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না মেয়েটার । জীবিত কিংবা মরা । বেমালুম গায়েব ।’

বাইরে চেষ্টামেচি বাড়ছে । কান পাতল হাণ্টার । দু’একজন শেরিফের নাম ধরে গালাগাল করছে, ‘ওয়েস্ট উডে এমনটা আর কখনও ঘটেনি । নতুন শেরিফ আসা মাত্র এসব অশুভ কাণ্ডকীর্তি শুরু হয়ে গেল ।’

ওদিকে কান দিচ্ছে না শেরিফ । বার্টকে বলল, ‘কাল সকালে উঠে বিশজন লোক চাই আমার । আমি নিজে যাব । মিস মেরির খোঁজ আনবই । আপাতত ব্যাপারটাকে অপহরণ বলেই ধরে নিচ্ছি

আমি। চিন্তা করে দেখতে হবে, মিস মেরি কার জন্যে কী সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছিল যে, তাকে সরিয়ে ফেলতে হলো। এখন তোমরা যার-যার জায়গায় চলে যাও। এখানে চেষ্টামেচি করে যে কোনও লাভ হবে না, তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।’

বাইরে হৈ চৈ কমছে না। তারা আজ রাতের মধ্যেই মেরির খোঁজ চায়।

হাণ্টার জানে, লোকগুলোকে এক্ষুণি গিয়ে ধমক লাগালে যে যার বাসায় চলে যাবে। তবে সেটা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। যারা এখানে এসে হৈ চৈ করছে, মেরি ওয়েবসন স্কুলে তাদের বাচ্চাকে পড়ায়। মেয়েটাকে ভালবাসে তারা। তাদের বিরাগভাজন হতে চায় না সে। বাইরে বেরোল শেরিফ।

‘ভাইসব,’ বক্তৃতার ঢঙে শুরু করল। ‘তোমাদের কথা আমি বুঝি। মিস মেরির হারিয়ে যাওয়ার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু রাতের বেলা কাউকে খুঁজে পাওয়াটাই মুশকিল। কাল সকাল বেলা উঠে আমরা বেরিয়ে পড়ব সবাই। মিস মেরিকে খুঁজে বের করবই। এখন সবাই বাসায় চলে যাও। এখানে চেষ্টামেচি করে কোনও ফায়দা নেই।’

এগারো

সূর্য ওঠার আগেই ওয়েস্ট উড থেকে বেরিয়ে গেল জিম টার্নার। ঘণ্টাখানেক ঘোড়া চালিয়ে ঝরনার পাড়ে গিয়ে থামল। বিকেল

বেলায় মেরির সঙ্গে যেখানে কথা বলেছিল, সে জায়গাটা খুঁজে বের করে ঘোড়া থেকে নেমে সিগারেট বানাতে শুরু করল।

চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে জিম। অনেকগুলো পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছে। ধস্তাধস্তির চিহ্ন। তিন-তিনটা ঘোড়ার খুরের ছাপ।

অপহরণ করা হয়েছে মেয়েটাকে। তবে সহজে কজা করা যায়নি। অপহরণকারীদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে বুনো সিংহীর মত লড়েছে।

তিনটা ঘোড়া মানে তিনজন অপহরণকারী। কাজ শেষ করে দ্রুত ঝরনার উজানে এগিয়েছে। একটা ঘোড়ার পিঠে দু'জন। বাকি দুটোর চেয়ে একটু বেশি গভীর হয়ে বসেছে ওটার খুরের ছাপ।

মাইলখানেক অনায়াসে ট্রেইল করা গেল তিনটা ঘোড়াকে। এক জায়গায় এসে থেমে পড়ল জিমের ঘোড়া। সামনে আর কোনও ছাপ নেই। ঝরনার পাড় থেকে পানিতে নেমে গেছে অপহরণকারীদের ঘোড়াগুলো।

এখানটায় অগভীর পানি। স্রোত রয়েছে। তলায় বালি আর পাথরের কুচি। পানি ঘোলা নয়। অপর পাড়ের ধার ঘেঁষে পানির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে জিমের ঘোড়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাচ্ছে জিম। ওপরে ওঠার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

এগিয়ে চলল ও। শিক্ষিত ঘোড়াটা মালিকের ইঙ্গিতে পেট সমান পানি ভাঙছে। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছে ভৌঁস ভৌঁস করে। পানির শব্দে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না সে, তবে নাকের ফুলে ওঠা থেকে বুঝতে পারছে। কষ্ট হচ্ছে ঘোড়াটার, পাথুরে ট্রেইলে ছোট্ট অভ্যাস আছে, পানিতে হাঁটার অভিজ্ঞতা নেই।

আরেকটু সামনে এগোতে ঝরনার পানি গভীর হয়ে গেল।

দু'পাশ থেকে ঝুঁকে পড়া গাছগাছালি আর লতাপাতায় অন্ধকার। ঘোড়া থামাল জিম। ঝরনার বাম পাড় দেখে এসেছে এতক্ষণ। ওদিকে অপহরণকারীদের ঘোড়াগুলোর উঠে যাওয়ার কোনও চিহ্ন দেখতে পায়নি। এবার যেদিক থেকে এসেছে, ফের সেদিকে এগোল। আবার বাম পাড়ের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে চলল যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।

চালাক লোকগুলো, ভাবছে জিম, জানে কীভাবে নিজেদের চিহ্ন লুকিয়ে চলতে হয়।

মেরিকে তিনজন লোক মিলে ধরে নিয়েছে, এটা পরিষ্কার। কিন্তু কেন ধরে নিল, সেটা ওর পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। ও এখানে আগন্তুক মাত্র। মেরিকে ধরে নেয়ার কারণ বুঝতে হলে এখানকার চলমান পরিস্থিতি বুঝতে হবে।

তবে পরিস্থিতি যা-ই হোক, তার সঙ্গে ওর নিজের কোনোই সম্পর্ক নেই। ও মাত্র গতকাল এখানে এসেছে। যে-কোনও সময় চলে যাবে। এখানে ওর কোনও দায় নেই। ট্র্যাক খুঁজতে খুঁজতে জিম অবাক হয়ে ভাবছে, সে কেন মেয়েটিকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ওকে খোঁজার কাজ এখানকার শেরিফের। শেরিফ কাল রাতে লোক পাঠিয়েছে খোঁজার জন্যে। আজ সকালে ফের বেরোনোর কথা দলবল নিয়ে।

গতকাল এখানেই মেয়েটির সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। জিম অস্বীকার করবে না, প্রথম দেখাতেই মেয়েটিকে ভাল লেগেছে ওর। তা হলে সে জন্যেই কি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মেয়েটিকে খুঁজতে বেরিয়েছে? ব্যাখ্যাটা সন্তুষ্ট করতে পারছে না ওকে। কিন্তু মনের ভেতর থেকে এটাকে উড়িয়ে দেয়ার তো জোরও যেন পাচ্ছে না।

পাড়ের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি, প্রতিটি ঝোপঝাড়ের ওপর চোখ বুলাচ্ছে জিম। কিন্তু ঘোড়াগুলোর উঠে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে

না। অবাক হচ্ছে জিম। ঘোড়াগুলো ঝরনা থেকেই পাখা মেলে উড়ে গেছে নাকি?

ঘোড়াগুলো যে জায়গায় ঝরনায় নেমেছে, সে জায়গা পেরিয়ে আরেকটু সামনে গেল জিম। আর তখনই ডান পাড়ে একটা গাছের ভাঙা ডাল চোখে পড়ল। আরেকটু নজর বুলাতে দেখা গেল ঘোড়াগুলোর পায়ের ছাপ। বোকামিটা বুঝতে পারল জিম। অপহরণকারীরা ঘটনাস্থল থেকে ঝরনার উজানে আসায় ওর মনে হয়েছিল পানিতে নেমেও ঝরনার উজানে গিয়ে উঠবে ওরা। তাই আগুপিছু না ভেবে সে-ও উজানে গিয়েছে। কিন্তু অপহরণকারীরা ছোট্ট একটা কৌশল অবলম্বন করে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের। ধরতে গেলে কাজেও লেগেছে তাদের কৌশল। জিমের মত ঝানু ট্র্যাকারকেও সামান্য সময়ের জন্যে ঘুরপাক খাওয়াতে পেরেছে। অপর পাড়ে উঠে অনায়াসে এগোল সে। অপহরণকারীরা এখানে ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করেনি। গতকালের প্রায় তরতাজা তিনটা ঘোড়ার খুরের ছাপ ধরে এগোতে লাগল সে ধীরে-সুস্থে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর থামল। সামনে একটা পাথুরে প্রান্তরের মত। ট্র্যাক হারিয়ে গেছে ওতে। শক্ত পাথুরে ভূমিতে কোনও ছাপই দেখা যাচ্ছে না ঘোড়ার খুরের।

ঝড়ের গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে জ্যাক ফিলমেটের র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে এসে থামল বেরি ক্লেমন্ট। মেঘমন্দ্র স্বরে ডাকল, ‘জ্যাক, বেরিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি।’ ক্রোধে কাঁপছে বুড়ো র‍্যাঞ্চার। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

নিজের অফিস ঘরে বসেছিল ফিলমেট। হাঁকডাক শুনে বেরিয়ে এল। অভ্যর্থনা জানাল অতিথিকে। ‘আরে! তুমি? এসো এসো, ভেতরে এসো।’

‘বসতে আসিনি!’ ঝাঁজিয়ে উঠল র্যাঞ্চার। ‘আগে বলো, মেয়েটিকে কোথায় রেখেছ? তার আগে বলো, এ কাজটা তুমি কীভাবে করলে? একবারও ভাবলে না...’

‘মেয়েটিকে কোথায় রেখেছি মানে?’ নিখাদ বিস্ময় ফুটল ফিলমেটের গলায়। ‘কোন মেয়ের কথা বলছ? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না, বেরি। তুমি ভেতরে আসবে? বাইরে দাঁড়িয়ে এভাবে রাগারাগি করলে তো কিছুই বোঝা যাবে না।’

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ক্রেমন্ট। ওটাকে বেঁধে ফিলমেটের পেছন পেছন ওর অফিসে ঢুকল। একটা চেয়ার দেখিয়ে নিজের চেয়ারে বসল ফিলমেট। ‘এবার ঠাণ্ডা মাথায় বলো কী হয়েছে? কোন মেয়ের কথা যেন বললে?’ আচমকা সচকিত হলো ও। ‘মেয়ে মানে? আচ্ছা, মেরির কথা বলছ না তো? কী হয়েছে ওর? কে ওকে কোথায় নিয়ে রেখেছে? খুলে বলো তো।’

ব্যাপারটা ক্রেমন্ট নিজেও বোঝার চেষ্টা করছে। সকালে তার এক কাউবয় খবরটা নিয়ে এসেছে। শোনার পরেই মাথায় আগুন ধরে যায় ওর। নিজের মেয়ের মত ভালবাসে সে মেরিকে। ওকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে কেউ, ভাবতেই পারছে না। ওয়েস্ট উডে এই মেয়ের কোনও শত্রু নেই। ফিলমেটের কথাটা হঠাৎই মাথায় আসে। কাজটা তার হলেও হতে পারে। একমাত্র সে-ই তো অগ্রহী মেরির ব্যাপারে। মেরি তাকে পাত্তা না দেয়ায় মাথা গরম র্যাঞ্চার হয়তো...

সিগার জ্বালাল ফিলমেট। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ‘কী হলো?’

খুলে বলল ক্রেমন্ট। তারপর অভিযোগের সুরে বলল, ‘কাজটা তুমিই করেছ, জ্যাক। আমি তোমাকেই সন্দেহ করছি।’

‘আমাকে সন্দেহ করার কারণ জানতে পারি?’

‘কারণ তুমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছ। কিন্তু ও রাজি না হওয়ায়...’

‘আমি ওকে চুরি করে নিয়ে গেছি, এই তো বলতে চাও?’

ওর চোখে তাকিয়ে রইল ক্লেমন্ট। বোঝা যাচ্ছে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় বুড়ো র‍্যাঞ্চার।

‘নাহ। তোমাকে দোষ দেয়া যাচ্ছে না। মেরিকে তুমি ভালবাস নিজের মেয়ের মত। তাই ওর বিপদের কথা ভেবে মাথা ঠিক রাখতে পারছ না। কিন্তু এটা কেন ভাবছ না যে, কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমারই মত একজন সম্পন্ন লোক। ওয়েস্ট উডে আমাদের দু’জনেরই আলাদা একটা মর্যাদা রয়েছে। এ কাজটা আমাকে দিয়ে সম্ভব হতে পারে কি না নিজের অবস্থান থেকেই ভেবে দেখো।’

‘কিন্তু কাজটা কেউ না কেউ করেছে।’

‘কে করেছে?’

‘সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। তুমি ছাড়া আর কারও কথা মাথায় আসছে না। কাজটা তোমারই করার সম্ভাবনা বেশি, ফিলমেট।’

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল টি-বারের মালিক। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে ক্লেমন্টকে। তারপর হেসে উঠল। ‘চলো।’

‘কোথায়?’ বিভ্রান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল বিসি র‍্যাঞ্চার মালিক।

‘ওয়েস্ট উডে। এখানে বসে বসে কী করব, বলো তো?’

বারো

সিগারেট জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে টানছে জিম টার্নার। পাথুরে ভূমিতে অপহরণকারীদের ট্রাক হারিয়ে গেছে। এগোতে পারছে না আর। আরেকটা সমস্যা হলো, এ অঞ্চলটা ওর অপরিচিত। এ অবস্থায় প্রায় অচেনা একটা মেয়েকে উদ্ধারের জন্যে অন্ধের মত বেরিয়ে পড়াটা কতটা ঠিক হয়েছে, বুঝতে পারছে না। তবে সময় যতই যাচ্ছে, ততই অচেনা মেয়েটার জন্যে এক ধরনের সহানুভূতি বোধ করছে সে। গতকাল সামান্য আলাপে যতটা বুঝেছে, মেয়েটা সম্ভবত শিক্ষিত এবং দৃঢ়চেতা।

আরেকটা ব্যাপার তার ভাল লাগেনি। সেটা হলো মেয়েটার খোঁজে শেরিফের উদাসীনতা। নিরীহ কয়েকজন শহরবাসীর একটা দল পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে শেরিফ। অথচ এ ক্ষেত্রে ওর নিজেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না জিম। শেরিফকে মোটেই দায়িত্ববান মনে হয়নি। তা ছাড়া ওর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েও শেরিফোচিত মনের জোরটুকু দেখাতে পারেনি লোকটা।

সিগারেট শেষ করে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল পাথুরে ভূমির ওপর দিয়ে। যেখানে এসে ঘোড়ার খুরের ছাপ শেষ হয়েছে, সেখান থেকে অর্ধবৃত্তাকার একটা জায়গা ধরে প্রতি ইঞ্চি খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। আশা করছে, যত শক্ত ভূমিই হোক,

খুঁজে পাওয়ার জন্যে সামান্যতম কোনও চিহ্ন হলেও রেখে যাবে ওরা।

ঝরনা থেকে উঠে আসার সময় পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে ঘোড়াগুলোর। খুরের সঙ্গে মাটি লেগে থাকেনি। ফলে শক্ত ভূমিতে খুর থেকে আলাগা কোনও মাটিও ঝরে পড়েনি। তবু খুঁজছে জিম। কী পাবে জানে না। তবু মনে হচ্ছে, লেগে থাকলে কিছু না কিছু একটা চোখে পড়তেই পারে। ওর ধারণা, অতীতের অভিজ্ঞতা তাকে বঞ্চিত করবে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অর্ধবৃত্তাকার জায়গাটার প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজল জিম। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেবে কি না ভাবছে, এমন সময় জিনিসটা দেখতে পেল।

লম্বা সোনালি রঙের একটা চুলের মত চিকন জিনিস পড়ে থাকতে দেখল ও। তুলে নিল ওটা। হাতের তালুতে রাখল। হ্যাঁ, চুলই বটে। মেয়েদের চুল।

মেরির চুল সোনালি, মনে করতে পারল জিম। শিস দিল। ঘোড়াটা ছুটে এল ওর কাছে। অর্ধবৃত্তের যেখানে চুল পাওয়া গেছে, সেখান থেকে সামনে এগোল ও। কামনা করছে, অপহরণকারীরা যেন দিক না পাল্টে সোজা সামনে এগিয়ে যায়।

আধঘণ্টা এগোনোর পর শেষ হয়ে গেল শুকনো পাথুরে ভূমি। সামনে ছোটখাট পাহাড় আর টিলা-টক্করের সন্নিবেশ।

মাটির দিকে তাকাল জিম। খুরের ছাপ খুঁজছে। পাথুরে ভূমি প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে একটা উপত্যকায়। দাঁড়িয়ে পড়ল জিম। পুরো জায়গাটার ওপর চোখ বুলাল। অপহরণকারীদের ঘোড়াগুলো যদি সোজা এসে থাকে, তা হলে এখানে কোনও জায়গা দিয়ে উপত্যকায় নেমে গেছে। একটু ভাবল সে। তারপর সামনে এগোনোর নির্দেশ দিল ঘোড়াকে। প্রায় পিছলে উপত্যকায় নেমে এল ওটা। তুলনামূলক নরম উপত্যকার মাটি। ঘোড়ার

খুরের ছাপ লুকানো যাবে না। অপহরণকারীরা যদি এখান দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কোথাও না কোথাও ওদের ঘোড়ার খুরের ছাপ পাওয়া যাবেই। জিম আশা করছে, ট্রাক লুকানোর চেষ্টা করবে না ওরা। তবে করলেও অসুবিধে নেই। যত সময়ই লাগুক, জিম একটা সূত্র খুঁজে পাবেই।

পাথুরে ভূমি থেকে কোন্ জায়গা দিয়ে উপত্যকায় নেমেছে ঘোড়াগুলো, সেটা আগে খুঁজে বের করা দরকার। জিম যে পথে এসেছে, তারাও যদি সে একই পথ ধরে আসে, তা হলে কাছে-পিঠে কোথাও হবে জায়গাটা। কিন্তু পাথুরে ভূমিটা যদি তারা ঐকে বেঁকে পেরোয়, তা হলে বের করতে সময় লাগবে।

লাগুক। অসুবিধে নেই। তাড়াহুড়ো করবে না সে। তাতে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। আর সেরকম হলে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ সময়ও লাগতে পারে।

ঘোড়াকে চরার সুযোগ দিয়ে কাজ শুরু করল জিম। হাতের বাম দিকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল। বাম দিকে ভূমি অপেক্ষাকৃত শক্ত। স্বভাবতই শক্ত মাটি বেছে নেবে ওরা।

কিছুদূর যেতেই পাওয়া গেল খুরের ছাপ। ছাপ লুকানোর চেষ্টা করেনি অপহরণকারীরা। তার মানে কেউ তাদের পিছু নিতে পারে, এমন আশা করছে না তারা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল জিম। শিস দিল। কচি ঘাস চিবোতে চিবোতে কান ঝাড়া করল ঘোড়াটা। লেজ নাড়ল বারদুয়েক। যেন বোঝাতে চাইল, ‘খাচ্ছি, এখন না ডাকলেই কি নয়?’

শিসের শব্দ আরেকটু জোরালো হতেই কান ঝাড়া দিল। তারপর ছুটল মালিকের দিকে।

ঘোড়ায় চড়ে ট্রাক ধরে এগিয়ে চলল জিম। তাড়াহুড়ো করছে না। এ জায়গাটা তার অপরিচিত। জানে না, সামনে কোথায় কী আছে। ক্যানিয়নের ওপাশে অসংখ্য ভাঙাচোরা

পাহাড়ের সন্নিবেশ। এসব পাহাড়ের মধ্যে কোথায় নিয়ে মেয়েটিকে রেখেছে ওরা কে জানে?

আরেকটা প্রশ্ন খোঁচাচ্ছে জিমকে। অপহরণকারীরা নিজেদের ট্রাক লুকানোর ব্যাপারে প্রথমে একটু চেষ্টা করলেও এখন আর তা করছে না। তার মানে পিছু ধাওয়ার আশঙ্কা করছে না ওরা। কেন? পিছু ধাওয়ার আশঙ্কাই যদি না থাকে, তা হলে অপহরণ করারই বা কী দরকার? এই কাজটা নিশ্চয় বিনা উদ্দেশ্যে হয়নি। জিমের সেটা জানা দরকার। সেটা জানতে পারলেই বোঝা যাবে, মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কী করতে পারে বা কতদূর যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, সেসব জানতে হলে ওকে এখানকার স্থানীয় ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে। কিন্তু তার সময় বা উপায় আপাতত কোনোটাই তার জন্যে নেই। তা ছাড়া সামান্য সময়ের দেখায় মেয়েটিকে কিছুটা ভাললাগা ছাড়া আর কোনও অনুভূতিও নেই ওর মনে। তা হলে সে কেন তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে, কিংবা অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে নেমেছে, তার কোনও সদুত্তর নিজের মনে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও পাচ্ছে না সে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বৈকি!

তবে যা-ই হোক, সিদ্ধান্ত যেহেতু নেয়া হয়ে গেছে, এবং সেটা সে নিজেই নিয়েছে, সুতরাং এখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ দেখছে না জিম।

ধীরে কিন্তু সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে জিমের ঘোড়া। ট্রাক খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে না। নরম মাটি, আলাগা পাথর, গাছের ঝরা পাতায় খুরের ছাপ রেখে গেছে ঘোড়াগুলো। উপত্যকা পেরিয়ে গেল এক সময়। পাহাড়ের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

অপহরণকারীরা মেরিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে? এ প্রশ্নটার জবাব চাই জিমের। আর এ প্রশ্নের জবাব অনুমান করতে হলে তাকে জানতে হবে ওয়েস্ট উডের পুরো পরিস্থিতি। কিন্তু

সেটা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে এগোতে হবে পুরোপুরি চলমান ঘটনার ওপর নির্ভর করে। এ মুহূর্তে সে যাচ্ছে অপহরণকারীদের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন ধরে। এভাবেই যেতে হবে।

পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে জিম। কিন্তু এক নাগাড়ে যেতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাথুরে মাটি পেয়েছে, ঘোড়াগুলোকে ওখান দিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। ফলে খুরের চিহ্ন হারিয়ে গেছে। ফলে মাঝে মাঝে থেমে ঘোড়া থেকে নেমে ট্র্যাক খুঁজে নিতে হচ্ছে ওকে। এতে সময় লাগছে প্রচুর। এক সময় ছোট একটা ঝরনার পাড়ে এসে দাঁড়াল ওর ঘোড়া। অপহরণকারীরা ঝরনার ভেতর দিয়ে গেছে, বুঝতে পারছে জিম। কিন্তু কোন্ দিকে? উজানে নাকি ভাটিতে? সেটা বুঝতে হলে ওকেও নামতে হবে।

নামল জিম। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ঝরনার বালি আর ছোট ছোট পাথরে ভরা তলায়। ঘোড়ার খুরের ছাপ বুজে গেছে স্রোতের টানে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জিম। বুঝতে পারছে না কোন্ দিকে যাবে।

পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে মেরি ওয়েবসন। বসে আছে একটা গুহায়। গতকাল রাতের বেলায় লোকগুলো তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। লোকগুলোকে চেনে না সে। কখনও দেখেছে বলেও মনে করতে পারছে না। বুঝতে পারছে না, ওরা কেন ওকে ধরে এনেছে। তবে অবাক হওয়ার ব্যাপার হলো, লোকগুলো দেখতে দুর্বৃত্ত টাইপের হলেও এখন পর্যন্ত ওর সঙ্গে কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করেনি।

লোকগুলো ওকে অস্ত্র দেখিয়ে জোর করে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়। ওর চোখ বেঁধে দেয় শক্ত করে। হুমকি দিয়েছিল, চোখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করলে স্রেফ গুলি করে

দেবে। এরপর ঝরনা পার হয়ে চলতে শুরু করে দক্ষিণ দিকে।

চোখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করেনি মেরি। কারণ একটু পরেই অন্ধকার নেমে এসেছে। চোখ খোলা থাকলেও চিনতে পারত না সে কিছুই। কারণ একজন নারী এবং শহরের বাচ্চাদের শিক্ষক হিসেবে তার জগৎ বলতে ওয়েস্ট উড শহরটাই। এর বাইরে যাওয়ার দরকার পড়েনি কখনও।

এক নাগাড়ে ঘণ্টা তিনেক চলার পর এ জায়গায় এসে থামে অপহরণকারীরা। একটা জিনিস সে বুঝতে পেরেছে, যারা তাকে ধরে নিয়ে এসেছে, এরা সম্ভবত এখানকার কেউ নয়। এ এলাকা ওদের কাছে প্রায় অপরিচিত। ওরা সম্ভবত আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, এখানে আসবে। কিন্তু এখানে আসার পথ তাদের ভাল জানা ছিল না। তাই আসার সময় বারকয়েক দাঁড়িয়ে পড়েছে, নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কথা বলে পথ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফের চলতে শুরু করেছে।

গুহার কাছে এসে তার চোখের বাঁধন খুলে দিয়েছে ওরা। তারপর ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। সামান্য আলো জ্বলে রাতের খাবার খেয়েছে ওরা। মেরিকেও খাইয়েছে।

লোক তিনজন দেখতে ষণ্ঠা টাইপের। ভয়ে ভয়ে দুরন্দুর করছিল ওর বুক। নিজের চরম অবমাননার ভয় করছিল। তবে কেন যেন সামান্য ভরসাও পাচ্ছিল। মনে হচ্ছে, ওকে এভাবে ধরে নিয়ে আসার পেছনে এদের নিজেদের কোনও কুমতলব নেই। এরা এমন একজনের হুকুমে এটা করেছে, যে তাকে নিয়ে নিজের কোনও মতলব হাসিল করতে চায়। কিন্তু কার হাত রয়েছে? কে লোকটা?

তেরো

সকাল দশটা। বাকবোর্ডে নয়, ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজের লোকজন ছাড়াই আজ শহরে এসেছে বেরি ক্রেমন্ট। সঙ্গী জ্যাক ফিলমেট। কমফোর্ট সেলুনের সামনের হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল দুই র‍্যাঞ্চার। ক্রেমন্টের চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। ন্যাট চ্যাপলিনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, ‘কোথায় শেরিফ? শেরিফ কোথায়? ডাকো ওকে। ও থাকতে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে কীভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, আমি জানতে চাই।’

ন্যাট বোতল আর গ্লাস এনে দিতে নিজের গ্লাসে মদ ঢেলে নিল ফিলমেট। চুমুক দিতে দিতে বলল, ‘আমার প্রথম থেকেই লোকটার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল। তোমরা সবাই মিলে...’

ফিলমেটকে পাত্তা দিল না বুড়ো। ‘আমার সন্দেহ ছিল না, জ্যাক। এখনও নেই। আমার মনে হচ্ছে লোকটা নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেনি। কেন করেনি, সেটাই জানতে চাইব।’

কটমট করে চাইল বারকিপারের দিকে, যেন ও-ই শেরিফ ব্ল্যাক হান্টার। ‘কোথায়?’

‘শেরিফ! সকাল বেলায় লোকজন নিয়ে বেরিয়েছে মিস মেরির খোঁজে। অন্য কোনও দিকে না গেলে এতক্ষণে ফিরে আসছে নিশ্চয়,’ জানাল ন্যাট চ্যাপলিন।

চুপচাপ নিজের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে জ্যাক ফিলমেট। ভাবছে। লোকটা অযোগ্য নাকি দায়িত্বহীন, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সে। সে ভাবছে ব্ল্যাক হান্টার কতটা ধুরন্ধর? আর তার পাঠানো লোকগুলো শেষ পর্যন্ত কার হয়ে কাজ করবে?

দলবল নিয়ে ফিরে এসেছে ব্ল্যাক হান্টার। মেরি ওয়েবসনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে মেয়েটা। সামান্যতম চিহ্নও রেখে যায়নি।

এসেই বেরি ক্রেমন্টের তোপের মুখে পড়ল। ‘কী ভেবেছিলে তুমি? মেয়েটা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পথে মরে রয়েছে? তাই তার লাশ আনতে গিয়েছিলে? একবারও কি মাথায় ঢোকেনি, ওকে কেউ ধরেও নিয়ে যেতে পারে?’

‘ওয়েস্ট উডে কেউ মিস মেরিকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, এটা তুমি কী করে ভাবছ, মি. ক্রেমন্ট?’

‘বেশ। তা হলে তুমি কী ভাবছ?’

‘ভাবছি না। বোঝার চেষ্টা করছি।’

‘বোঝার চেষ্টা না করে খোঁজার চেষ্টা করো। আমি শেরিফ হলে এতক্ষণে খুঁজতে বেরিয়ে পড়তাম। হ্যাম হলেও তাই করত।’

রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল হান্টারের। ‘কোথায় গিয়ে খুঁজব বলো? কেউ যদি নিজে ইচ্ছে করে চলে যায়...’

ক্রেমন্ট কিছু বলার আগেই রুখে উঠল ন্যাট চ্যাপলিন। ‘তোমার এ কথাটার ব্যাখ্যা চাই, হান্টার। কেন তোমার মনে হচ্ছে মেরি নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে?’

চুপ করে রইল শেরিফ। ভাবছে। ফিলমেটের দিকে চাইল একবার। একটা কথাও বলছে না ফিলমেট। কী ভাবছে লোকটা?

চোদ্দ .

মেয়েটাকে ধরে নিয়ে এসে ঝরনার পাড়ের গুহাটায় বসে আছে তারা তিনজন। ফিক ক্যাবেট, সিম লেইরি আর জব জ্যাকসন। পরবর্তী হুকুম এখনও আসেনি। তবে সেজন্যে যে তারা খুব সমস্যায় পড়ে গেছে, তা নয়। আসুক না হুকুম, যখন ইচ্ছে। আপাতত তারা ভালই আছে। খাবার-দাবার, মদ, ধূমপান...নিজেদের মধ্যে কয়েক দান জুয়া খেলা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদের বন্দি একজন মেয়ে এবং মেয়েটা সুন্দর। এক নাগাড়ে তাকিয়ে দেখলে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। সমস্যা আসলে ওটাই। মেয়ে না হলে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলেই ঝামেলা খতম।

সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে ফিক ক্যাবেটকেই। প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করছে ও। সে একা হলে এতক্ষণে কী করত, কল্পনায় বারবার সে দৃশ্যটা দেখছে। সে একজন পুরুষ। কাল্পনিক দৃশ্যটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপভোগও করছে। কিন্তু সমস্যা তাতে কমছে না। বাড়ছে আরও।

তারা তিনজনে মিলে ধরে এনেছে মেয়েটাকে। এখন পাহারা দিচ্ছে। একলা একজন মেয়েকে পাহারা দিতে তিনজন লাগে না। ফিক নিশ্চিত, ও যদি একা থাকত পাহারায়, তা হলে এতক্ষণ বাইরে বসে মেয়েটার ওপর কড়া নজর রাখতে হত না। অনেক

আগেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলত। এতক্ষণে, কে বলতে পারে, দু'জনে একত্রে বসে বসে গল্প করত হয়তো।

কিন্তু সমস্যা হলো, ওর সঙ্গী দু'জন ওর সঙ্গে একমত হবে না। সিমকে পাত্তা না দিলেও জবকে সমঝে চলতে হয়। ব্যাটা রেগে গেলে স্রেফ পাগল হয়ে যায়।

তবে যা-ই হোক, আরামে আছে ওরা। নিজেদের কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রাম নয়তো কী? মেয়েটিকে পাহারা দেয়ার নামে অলস সময় কাটাচ্ছে। মেয়েটাকে খোঁজার জন্যে কেউ আসবে না, এমনটাই বলে দেয়া হয়েছে ওদের। সুতরাং গুলিগোলায় জড়িয়ে পড়ার তেমন আশঙ্কা নেই। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলে দেয়া হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই মেয়েটির কোনও ক্ষতি করা যাবে না।

কাল রাতে এখানে এই গুহায় আশ্রয় নেয় ওরা। ওরা এখানে নতুন। সব জায়গা ঠিকমত চেনে না। তবে দিন তিনেক আগে জব জ্যাকসনকে এদিকটা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মেয়েটিকে অপহরণ করার পর এদিকে পথ দেখিয়ে এনেছে সেই। রাতের বেলা তারা পালা করে পাহারা দিয়েছে। এখন আবার এই দুপুরের দিকে তার পাহারা দেয়ার পালা।

ঝরনার ভেতর নামল জিম। বুঝতে পারছে না কী করবে। উজানে যাবে নাকি ভাটিতে যাবে? কিছুক্ষণ দোনোমনো করে শেষে উজানের দিকে এগোল। খুব মনোযোগের সঙ্গে ঝরনার তলায় নজর বুলাচ্ছে। কিছুদূর যেতেই আলগা একটা পাথরের গায়ে আঁচড়টা চোখে পড়ল। স্রোত থাকায় পাথরে শ্যাওলা পড়ার কথা নয়। তবু যেভাবে হোক, এই পাথরটার গায়ে শ্যাওলা জমেছে। সম্ভবত পানি এখানে একটু গভীর বলেই।

ঘোড়া থেকে নামল জিম। আরও দু'একটা সূত্র খুঁজছে।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। বারনা থেকে পাড়ে ওঠার চিহ্ন পেয়ে গেল। বাম পাড়ে উঠে গেছে অপহরণকারীরা। ধীরে-সুস্থে পাড়ের ওপর উঠে এল জিম।

লোকগুলো নিশ্চয় সারারাত চলেনি। ঘুমানোর জন্যে থেমেছে। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছে ও। মেয়েটিকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নেই অপহরণকারীদের। সেটা হলে টানা লম্বা কোনও ট্রেন ধরত। অর্থাৎ তাকে এখানে কোথাও রাখা হবে। তারপর নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে দর কষাকষি শুরু করবে। আপাতত এটাই জিমের অনুমান। অনুমান ভুলও হতে পারে।

পাড়ে উঠে থামল ও। সিগারেট রোল করল। মুখে ঝোলাতে যাবে, ঠিক সে মুহূর্তে কথা বলে উঠল কেউ একজন, ‘কে তুমি? এখানে কী করছ?’

জায়গায় জমে গেল জিম। একটুও বেচাল না দেখিয়ে মৃদু স্বরে জানতে চাইল, ‘কে কথা বলছ? সামনে এসো।’

‘সামনে এলেও তোমার বিশেষ কোনও সুবিধে হবে বলে মনে করো না। আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি এখনও। ভাল কথা, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছ দেখছি।’

‘না দেখার তো কারণ নেই। পিস্তলটা তো তোমার মত ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নেই।’ মৃদু হাসল জিম।

‘বেশ, বুঝলাম তুমি ভালই কথা কাটাকাটি করতে পার। এখন ওটা খুলে ফেলো।’

‘খুলে ফেলব মানে?’

‘দেখো, আমার সঙ্গে চালাকি করতে যেয়ো না!’ খঁকিয়ে উঠল লোকটা। ‘তোমার চেয়ে অনেক বড় সেয়ানাকে সোজা করে ছেড়েছি আমি। হোলস্টার খুলে ফেলো বলছি।’

লোকটা কথা বলছে জিমের ডান পাশ থেকে। শব্দ থেকে

দু'জনের মাঝের দূরত্বটা হিসেব করে নিল জিম। লোকটা যেই হোক, ধৈর্য বলতে কিছু নেই ওর মধ্যে। এ ধরনের লোক হিসাব-কিতাবের চেয়ে ঝাঁকের বশেই চলে বেশি।

ওর ডানপাশে হালকা ঝোপঝাড়। লোকটা তার আড়ালেই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

‘কই, বললাম না পি...’

আচমকা ঝাঁপ দিল জিম লোকটার কথার শব্দ লক্ষ্য করে। ছড়মুড় করে পড়ল ঝোপঝাড়ের ওপর। একই সঙ্গে হোলস্টার থেকে পিস্তল চলে এসেছে হাতে। ট্রিগার টিপে দিল।

‘খাউ’ করে চেষ্টায়ে উঠল আড়ালবাসী। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল জিম। বুঝতে পেরেছে গুলিটা মিস হয়নি। ভাগ্যগুণে লেগে গেছে শরীরের কোথাও। আরও দু’পা এগোতে দেখতে পেল ওকে। ডান হাতটা চেপে ধরে বসে পড়েছে। হাতে পিস্তল নেই। ছিটকে পড়েছে একদিকে।

‘ওঠো,’ হুকুম দিল জিম। ‘সোজা হও।’

‘হাতে গুলি লেগেছে।’ ককিয়ে উঠল সাবেক পিস্তলধারী।

‘স্বাভাবিক। অ্যামবুশ করতে গেলে কথা বলতে হয়, এটা শিখেছ কার কাছে?’

‘অ্যামবুশ করিনি আমি,’ বেজার মুখে বলল লোকটা। ‘আমি...’

‘হ্যাঁ, তুমি। পিস্তল ঝুলিয়েছ, কিন্তু পিস্তলবাজির কিছুই জানো না।’

‘তুমি খুব জানো মনে হয়?’

‘দেখতেই তো পাচ্ছ। তোমার হাতে গুলির আঘাত আর আমার হাতে পিস্তল। মেয়েটা কোথায়?’

‘ম্-মেয়েটা? মানে?’

‘বলবে না, এ-ই তো?’

‘তুমি ধরা পড়ে যাবে।’ ভেঙুচি কাটল লোকটা। ‘ওরা আরও দু’জন...’

লোকটার গলায় পিস্তলের নল ঠেসে ধরল জিম। ফিসফিস করে বলল, ‘ওদের নিষেধ করে দাও গুলি ছুঁড়তে। আমার গায়ে দশটা গুলি লাগলেও মরার আগে তোমার গলায় একটা গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারব। বলো। দেরি করলে কিন্তু মরবে তুমিও। বলো।’

পিস্তলের নলের ঠাণ্ডা ছোঁয়া পাচ্ছে লোকটা। পরিস্থিতি বুঝতে পারছে। প্রতিপক্ষ যে কতটা ভয়াবহ, এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে তার। ওকে এ অবস্থায় দেখে ওর সঙ্গীরা যদি গুলি করে বসে, তা হলে এ-ও অন্তত একটা হলেও গুলি ছুঁড়তে পারবে। আর সেটা সোজা ঢুকে যাবে ওর কণ্ঠনালীর ভেতরে। বাঁচার কোনও সুযোগই থাকবে না।

ওর বন্ধুরা নিশ্চয় গুলির শব্দ শুনেছে। ঘটনা কী, দেখতে আসছে নিশ্চয়। হয়তো এসেও পড়েছে। গুলি করলে করে ফেলতে পারত। কিন্তু ওকে এ অবস্থায় দেখে নিশ্চয় সেটা করতে পারছে না। কারণ গুলি ছুঁড়লে ওর নিজের গায়েও লাগতে পারে।

পিস্তলের নলের চাপ আরও বাড়ল। যন্ত্রণা করছে গলার চামড়ায়। ‘বলো।’

‘ওরা গুলি করবে না।’

‘সেটা তুমি যখন বুঝছ, তা হলে আমারও না বোঝার কোনও কারণ নেই। তবু তোমাকে বলতে বলছি যখন, বলো।’

‘অ্যাঁই!’ বাজখাঁই গলায় চেষ্টাল বিপন্ন লোকটা। ‘ত-তোমরা কেউ গুলি কোরো না। তা হলে আমাকেও শেষ করে দেবে হারামিটা।’

‘বেরিয়ে আসতে বলো, ওদের। কোনও চালাকি চাই না। কই...বলো?’ আরও বাড়ল চাপ।

‘গলার চামড়া ফুঁড়ে ঢুকে যাবে তো নল। চাপটা কমাও না।
নইলে কথা বলব কী করে?’

‘ওদের বলো, আমি বন্ধু। হাণ্টারের কাছ থেকে এসেছি।’

‘কী?’ চোখ বিস্ফারিত হলো লোকটার। ঠেলে পিস্তলটা সরিয়ে
দিতে চাইল। ‘আগে বলোনি কেন?’

‘তুমি তো শুনতে চাওনি। তুমি মস্তানি করতে গেলে বলেই
তো এখন ঠেলা সামলাচ্ছ।’ মৃদু হাসল জিম।

এবার জোর করে ওর পিস্তলধরা হাতটা সরিয়ে দিল আহত
পিস্তলবাজ। উঠে দাঁড়াল। চেষ্টা করে বলল, ‘বেরিয়ে আসো
তোমরা। ...একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। এ লোক বসের
কাছ থেকে এসেছে।’ গলায় বাম হাত বুলাচ্ছে সে। ‘উহ! তুমি
না...’ ডান হাতের দিকে তাকাল।

‘বোকামির শাস্তি,’ নিষ্পৃহ মন্তব্য জিমের।

বেরিয়ে এল বাকি দু’জন। কাছে আসতে জিম জানতে চাইল,
‘মেয়েটা কোথায়?’

এক মুহূর্ত চুপ রইল জব জ্যাকসন। ‘তোমাকে কেন
পাঠিয়েছে?’

‘তোমাদের কাজের খবর নেয়ার জন্যে। যা করছ, তা তো
দেখতেই পাচ্ছি। পেছনে ছাপার অঙ্করের মত পরিষ্কার ট্র্যাক
রেখে এসেছ। এখানে পিস্তল উঁচিয়ে বাহাদুরি করতে গিয়ে
আনাড়ির মত ধরা পড়েছ। মেয়েটাকে কোথায় রেখেছ? ওর কিছু
হলে তোমাদের চিবিয়ে খাবে বলেছে হাণ্টার।’

দ্বন্দ্ব পড়ে গেছে তিনজন। বিশ্বাস করবে কি না বুঝতে
পারছে না।

গুহার মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ওদের দেখে ভেতর
থেকে বেরিয়ে এল মেরি। প্রথমে আহত ফিক ক্যাবেটকে দেখল।
এরপর জিমের দিকে চোখ পড়তে বিস্ময়ে অভিভূত হলো। মুখ

খুলতে গেল, ‘তুমি...’

চরকির মত ঘুরল জিম। পিস্তল বের করেই কাভার করল তিনজনকে। ‘খবরদার! কেউ পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে না। মারা যাবে কিন্তু।’

পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করল না তিন অপহরণকারী। বিরাট ধোঁকা খেয়েছে ওরা। তাদের পিস্তল হোলস্টারে। বের করতে গেলেই গুলি করতে দ্বিধা করবে না এই লোক। ‘কিন্তু তুমি না বললে তোমাকে হাণ্টার পাঠিয়েছে?’ জ্যাকসন জানতে চাইল।

‘আন্দাজে বলেছি। কিন্তু দেখি কাজে লেগে গেছে। তোমরা গাধার মত তা বিশ্বাস করেছ। অবাক হচ্ছি, তোমাদের মত আনাড়িদের ওপর এমন একটা কাজের দায়িত্ব কীভাবে দিল ও?’

‘ও একা দেয়নি,’ বলতে গেল ফিক ক্যাবেট। ‘মিস্টার...’ পরমুহূর্তে থেমে গেল একত্রে দুই সঙ্গীর ডাকুটি খেয়ে।

‘মিস্টার?’

‘না, কিছু না। কেউই না।’ মুখে কুলুপ আঁটল ক্যাবেট।

‘কোমর থেকে হোলস্টার খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আরেক মিস্টারটা কে, আমার জানার কোনও আগ্রহ নেই। সময়মত ঠিকই জেনে যাব। কই, কী বললাম কানে যায়নি?’

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তিন অপহরণকারী।

‘শোনো,’ বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল জিম। ‘এখানে আর কেউ নেই। স্রেফ তিনটা গুলি খরচ করব তিনজনের জন্যে। তারপর লাশগুলো ফেলে যাব। কবর দেয়ারও ঝামেলায় যাব না। শকুন-শেয়ালগুলো খেয়ে বাঁচবে।’

‘যিশুর কিরে!’ চৈঁচিয়ে উঠল ক্যাবেট। ‘ও যা বলছে, তা-ই করবে।’ হাতে গুলি খাওয়ার পর ছিটকে পড়া পিস্তলটা অনেক কষ্টে ফের কোমরে ঝুলিয়েছিল। এবার বাম হাতে হোলস্টারটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ‘আমি আর কোনও ঝক্কি-ঝামেলায়

নেই।’ আহত ডান হাতটা বাম হাতে চেপে ধরে ককিয়ে উঠল।

‘আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।’

‘যাবে।’ ওকে আশ্বস্ত করল জিম। ‘তোমাদের মতলব কী?’
পিস্তল নাড়াল। ‘নাকি যুদ্ধ করবে?’

চুপচাপ নিজের হোলস্টার খুলতে শুরু করল জব জ্যাকসন।
একটু ইতস্তত করে ওর পথ ধরল সিম লেউরিও।

‘বুদ্ধিমান বলে একেই। যেখানে জেতার সম্ভাবনা একভাগও
নেই, সেখানে লড়াইয়ের কোনও মানে নেই। ম্যাম,’ মেয়েটির
দিকে চাইল। ‘পিস্তলগুলো কুড়িয়ে নেবে, গ্লিজ? খারাপ জিনিস
চোখের সামনে রাখতে নেই।’

‘সানন্দে।’ হাসল মেরি। তিনটা পিস্তল কুড়িয়ে নিল সে।

‘বেশ। তো, ভাইয়েরা, তিনটা ঘোড়া আছে তোমাদের।
দেখি, কত তাড়াতাড়ি ছুটতে পার তোমরা? নাও, ওঠো। দেরি
করার দরকার নেই। ভাল কথা, ওয়েস্ট উডের দিকে যেয়ো না
যেন। তা হলে আস্ত থাকবে না আর। অপহরণের অভিযোগে
স্রেফ লটকে দেব। হাণ্টার তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।’

তিন অপহরণকারী তিনটা ঘোড়ায় চড়ল। তারপর ধীরে ধীরে
এগিয়ে চলল ঝরনার পাড় ধরে। একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল
দৃষ্টিপথ থেকে।

মেরি এগিয়ে এল। ‘তোমাকে এখানে আশা করিনি। তুমি
এখানে কেন? কীভাবে চিনলে জায়গাটা?’

‘কেন, তোমাকে বলিনি আমি অ্যাপাচিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি?
পথ চেনাটা কঠিন কাজ নয় আমার জন্যে?’

‘কিন্তু তুমি কেন?’

‘আর কেউ আসেনি বলে।’ হাসল জিম।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল মেরি। ‘আর কাউকে তো কখনও
আসতে বলিনি।’

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ওকে কাছে টানল জিম। ওর চোখে তাকাল। ‘আমাকে কি বলেছিলে?’

‘মনে হয় বলেছিলাম।’

‘কখন? কোথায়?’

‘সেদিন সন্ধ্যায়। ঝরনার পাড়ে।’ হাসল মেরি।

আরেকটু কাছে টানল মেয়েটাকে জিম। তারপর চুমু খেতে গেল।

পাগলের মত সাড়া দিল মেরি। এই প্রথম একটা পুরুষ তাকে কাছে টানতে পারছে। শারীরিক এবং মানসিক, দু’ভাবেই।

পনেরো

ওরা যখন ওয়েস্ট উডে পৌঁছল, সন্ধ্যায় আর বেশি বাকি নেই। সোজা কমফোর্ট সেলুনের সামনে গিয়ে ঘোড়া থামাল জিম নিজে নামল তারপর হাত বাড়িয়ে দিল মেরির উদ্দেশ্যে।

সেলুনে বসে এ দৃশ্য দেখল ন্যাট চ্যাপলিন, বেরি ক্লেমেন্ট আর জ্যাক ফিলমেট। ধক করে উঠল ফিলমেটের বুকের ভেতরটা। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

অফিস থেকে বেরোতে যাচ্ছিল ব্ল্যাক হাণ্ডার। দু’জনকে দেখে থমকে দাঁড়াল; আবার ঢুকে পড়ল ভেতরে।

মেরিকে দেখতে ছুটে এল শহরবাসী। মা-বাপ মরা এই সুন্দরী মেয়েটাকে ওরা সবাই ভালবাসে। তাদের বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে

টিচারের গল্প শোনাতে অস্থির করে তোলে। প্রতিদিনই টিচারকে নিয়ে তাদের বলার মত কোনও না কোনও গল্প থাকেই।

ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল জিম। বারের দিকে এগোল। ‘হাউডি,’ সম্ভাষণ জানাল বারকিপারকে। ‘মেয়েটাকে নিয়ে এলাম।’

‘নিয়ে এলে মানে!’ কথা বলে উঠল ফিলমেট। ‘ওকে তুমিই নিয়ে গিয়েছিলে? কোথায়?’

ধীরে ধীরে ওর দিকে ঘুরল জিম। তাকাল চোখে চোখে। ‘মি. ফিলমেট...তাই না? নইলে অমন মোটা বুদ্ধি আর কার হবে?’

‘মানে? কী বলতে চাও তুমি?’

‘মেরি ওয়েবসনকে বিয়ে করতে চাও। পাত্রা দেয় না মেয়েটা। তাই না? রাগ থাকতেই পারে।’

‘কী সব আজেবাজে কথা বলছ?’ গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চার। ‘কে তুমি? মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?’

‘আমি তো কোথাও নিয়ে যাইনি, ফিলমেট। আমি সেদিন এখানেই ছিলাম। ওয়েস্ট উডেই। তাই না, বারকিপ?’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

ফিলমেটের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল সারান্ধ্রণ বেরি ক্রেমন্ট। এবার তাকাল জিমের দিকে। ‘আমি...’ বলতে গেল।

‘হ্যাঁ, তুমি, বেরি ক্রেমন্ট। মেরি বলেনি তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও। তবে ভাল একজন পাত্র খুঁজছ ওর জন্যে। একজন ভাল পাত্র পাওয়া গেছে। শিগগিরই প্রস্তাব যাবে তোমার কাছে।’ হাসল জিম।

‘মানে, ইয়ে...’ কথা শেষ করতে পারল না ক্রেমন্ট, দরজা ঠেলে ঢুকল শেরিফ ব্ল্যাক হান্টার। হাতে উদ্যত পিস্তল। সরাসরি জিমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাজখাঁই গলায় চৈঁচাল, ‘হাতদুটো ওপরে তোলো।’

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চাইল জিম। ‘কেন? আমার হাতদুটো আবার তোমার কোন্ সমস্যা ঘটাল?’

‘তোমাকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি আমি।’

‘তাই? অপরাধটা কীসের?’

‘থামো, শেরিফ,’ হাণ্টার কথা বলার আগেই গর্জে উঠল ক্লেমন্ট। ‘তোমার পিস্তল খাপে ঢোকাও। বসো, তোমার সঙ্গেই আগে ফয়সালাটা হয়ে যাক। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, যে মেয়েটাকে তোমার বিশাল দুটি প্যাসিবাহিনী মিলেও খুঁজে আনতে পারেনি, সেটা এই লোক কী করে পারল?’

খতমত খেয়ে গেল হাণ্টার। ঘাণ্ড বুড়ো ক্লেমন্ট যে এমন প্রশ্ন করে বসবে, সেটা তার মাথায়ও আসেনি।

আসলে মেরিকে নিয়ে এই লোকটাকে শহরে ঢুকতে দেখেই পিলে চমকে গেছে ওর। বুঝতে পারছে ওখানে মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে।

এই লোক কতটা জেনেছে, কে জানে। সবচেয়ে বড় কথা, ও ওখানে কেন গেল? কীভাবে গেল? আর ওরা কি ওর কথা বলে দিয়েছে?

‘কী হলো? আমার কথার জবাব পাইনি এখনও?’

‘আমারও সে কৌতূহল হচ্ছে,’ কথা বলল শেরিফ। ‘এই লোকই নিশ্চয় অপহরণ করেছিল মিস মেরিকে। কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ওর মুখে শুনতে চাই। তোমরাও শুনবে।’

‘তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব চাই,’ বলল ন্যাট চ্যাপলিন। ‘মিস মেরিকে যেদিন অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতে, মানে গতকাল রাতে আমার হোটেলেই রাত কাটিয়েছিল এই লোক, মানে জিম টার্নার। তা হলে...’

‘তা হলে নিশ্চয় ওর লোকেরা কাজটা করেছিল। আর সে সকাল বেলা গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এসে এখন বাহাদুর সেজে

বসেছে।’

‘কেন?’

‘হ-হয়তো সে মেয়েটাকে...খ্যাৎ, সেটা আমি কী করে জানব, ন্যাট?’

‘ব্যাপারটা আমিই বরং ব্যাখ্যা করি,’ বলল জিম। ‘মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাওয়াটাই হলো আসল ব্যাপার। মেয়েটাকে তুমিই পেতে চেয়েছিলে, হাণ্টার। মিস মেরি আমাকে সব বলেছে। তুমি শুনতে চাইলে এদের সবার সামনেও বলবে। আর তোমার লোকগুলোও আমাকে বলেছে, তোমার হুকুমে ওরা মেয়েটাকে অপহরণ করে। একটু চালাকি করতে গাধার মত পেটের কথা উগড়ে দিয়েছে।’

‘ওরা আমার লোক নয়!’ খেঁকিয়ে উঠল হাণ্টার। ‘ওরা...’

‘ওরা কার লোক, সেটা আমার না জানলেও চলবে, শেরিফ।’ খেই ধরল ক্লেমেন্ট। ‘কিন্তু তুমি আমার কথার জবাব দাওনি। আমি জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কেন মেরিকে খুঁজে পাওনি। আসলে তুমি ওকে খুঁজতে যাওনি। ওটা ছিল তোমার আমাদের চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা মাত্র। কারণ, যাকে তুমি লুকিয়েছ, তাকে কেন খুঁজে বের করবে তুমি? কাজটা যে তুমিই করিয়েছ, সেটা অনুমান করা যায়, কিন্তু প্রমাণের উপায় নেই।’

‘যা-ই হোক। আমি তোমাকে কর্তব্যে অবহেলার দায়ে বরখাস্ত করলাম। এই মুহূর্ত থেকে তুমি আর ওয়েস্ট উডের শেরিফ নও। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে জিম টার্নারকে শেরিফের কাজটা দেয়া গেল। মেরিকে খুঁজে এনে দারুণ কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে সে। জিম...’

‘নিকুচি করি!’ বলে পিস্তলে হাত দিতে গেল হাণ্টার। ‘তোমাদের আমি....’

পরমুহূর্তে জিম টার্নারের দিকে তাকাল। সারাক্ষণই একটা

চোখ ছিল ওর নবাগতের ওপর। তবু ওর পিস্তলটা কখন হোলস্টার থেকে হাতে উঠে এসেছে, বুঝে উঠতে পারল না।

মিইয়ে গেল হাণ্টার। পিস্তলে নিজের দক্ষতার ব্যাপারে অনেক উঁচু ধারণা ছিল তার। কিন্তু নবাগত এ লোকটার কাছে নিজেকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ধীর মনে হলো ওর।

‘হুঁ, ওটা বের করো, হাণ্টার। তারপর তোমার বুকে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিই,’ অনুচ্চ স্বরে বলল জিম। ‘যা-ই হোক, এবার তারাটা খুলে ফেল। মি. ক্রেমন্ট কী বলেছে শুনেছ নিশ্চয়? তোমার চাকরি আর নেই। একজন বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করতে দারুণ ব্যর্থতা দেখানোর পর তা আর থাকাও উচিত নয়।’

‘কিন্তু ওর বিরুদ্ধে অন্যের দোকানে বিনা কারণে ভাঙচুর ও একজন আইনের মানুষকে মারাত্মকভাবে মারধর করার অভিযোগ আনছি আমি। শেরিফ, তোমার উচিত, ওকে গ্রেফতার করা,’ উপসংহার টানার মত করে বলল জ্যাক ফিলমেট। নিজের দিকটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। ওই লোকগুলো অপহরণের হুকুমদাতা হিসেবে ব্ল্যাক হাণ্টারের নাম বলে দিয়েছে, ওর নামও বলে দিয়েছে কি না কে জানে। ‘আর...’ তাকাল জিম টার্নারের দিকে।

‘আর তেমন কিছু নেই।’ মৃদু হাসল জিম। ‘আসলে থাকলেও সেটা দেখা যাচ্ছে, প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ভাল কথা, ওয়েস্ট উডে নিশ্চয় পাদ্রী আছে একজন। মেরি আর আমি বিয়ে করব কি না।’

একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল সেলুনে বসে এতক্ষণ দম ধরে বসে থাকা লোকগুলো। ফিলমেটের দিকে চাইল জিম। একটা রাগের ঝিলিক জেগেই মিইয়ে গেল ফের। চোখে চোখ পড়তেই মুচকি হাসল জিম। বেজার মুখ নামিয়ে নিল র‍্যাঞ্চমালিক।

নতুন ক্যানের মুখ খুলল ন্যাট চ্যাপলিন। গ্লাস পূর্ণ করে সবার

হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘মেরির বিয়ে উপলক্ষে আমার পক্ষ থেকে।’ সবগুলো দাঁত বের করে হাসছে লোকটা।

এগিয়ে গিয়ে হাণ্টারের ভেস্ট থেকে তারাটা খুলে নিল ও। ওর পিস্তলটাও হস্তগত করল। ‘চলো, হাণ্টার।’ পিস্তল উঁচিয়ে নির্দেশ দিল। ‘হাজতের পথটা তুমি চেনো নিশ্চয়। আমি তোমার পেছনে যাচ্ছি।’

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক’টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অঙ্করে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৪/১/১৫ নাডা দ্য লিলি (অনুবাদ) হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/ইসমাইল আরমান
বিষয়: পাঠক, চলুন আপনাদের নিয়ে যাই অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকার অভ্যন্তরে, পরিচয় করিয়ে দিই বৃদ্ধ এক জুলু ওঝার সঙ্গে। তার নাম যুয়িটি। অদ্ভুত এক গল্প শোনাবে সে আমাদের। পদ্মকুমারী নাডা আর কাঠঠোকরা আমস্লোপোগাসের গল্প। জুলু জাতির সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে আর দুর্ধর্ষ এক যোদ্ধার অসামান্য প্রেম-কাহিনি। কিন্তু এ-প্রেমের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে নৃশংসতা; রয়েছে রক্তের উৎসব আর মৃত্যুর মিছিল। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে আপনার বুকে, প্রেম আর প্রতিহিংসায় হবেন উদ্বেলিত। হাসি, কান্না, আনন্দ, উত্তেজনা... কী নেই সেই কাহিনিতে? তা হলে আর দেরি কেন, চলুন বসে পড়ি যুয়িটিকে ঘিরে। শুনি সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

আরও আসছে

২১/১/১৫ আর্তনাদ+মরণনেশা+বিষ (রহস্য উপন্যাস ভলিউম) কাজী আনোয়ার হোসেন
২৭/১/১৫ রহস্যপত্রিকা (৩১ বর্ষ ৪ সংখ্যা) ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
বইঘর.কম